প্রদীপ

সচিত্র মাসিক পত্র।

পঞ্চম ভাগ।

শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

(পৌষ, ১৩০৮ হইতে—অগ্রহায়ণ, ১৩০৯ পর্য্যন্ত)

কলিকাতা

৯২।৪ নং জানবাজার ষ্ট্রীট, ক্লাসিক প্রেস,
শ্রীশম্ভুনাথ মিত্র দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা।

সূচী।



"হেরিনু ফুলের বনে একটি বালিকা।"

KUNTALINE PRESS



পঞ্চম ভাগ। } পৌষ, ১৩০৮। { ১ম সংখ্যা

একটি কথা।

তথন ফিবিতেছিনু সোনার সন্ধ্যায়
শান্ত-নদী-তীর-পথে, · অস্ত জ্যোৎস্না-ছায়
লঘু শুভ্র মেঘগুলি—অনুরাগে যেন—
ধরিছে বিচিত্র শোভা; স্নেহমূর্ত্তি হেন
পল্লীবধূ ভরি'ঘট ফিরিছে আলয়ে ;
একটি নিঃসঙ্গ পাখী উৎকণ্ঠ হৃদয়ে
শ্যামল কুলায় খানি মবিছে খুঁজিয়া,
শঙ্কায় কাতব কণ্ঠে ডাকিয়া ডাকিয়া!

বহু—বহুদুর তীবে, মহানভ পাবে ·
তারকা-প্রদীপ হস্তে ত্রিদিব-দুয়ারে
দাঁড়া'ল সন্ধ্যাব লক্ষ্মী ; গ্রামের সুন্দরী
শঙ্খ বাজাইয়া তারে গৃহে নিল বরি'।
মন্ত্র-মোহে মুগ্ধ প্রায়, নদী-তট ধরি'
তথনও চলিতেছিনু ; শূন্য চিত্ত ভরি'
জন্ম জন্মান্তের ব্যথা, দুঃস্বপ্নের মত,
চাপিয়া ধরিতেছিল বক্ষ অবিরত।

সহসা ফিরায়ে দিল সম্মুখের গতি
নির্ব্বাক প্রহরী সম মহা বনস্পতি।
চকিতে চেতনা লভি' দেখিনু চাহিয়া,
অজ্ঞাত প্রান্তর মাঝে একা দাঁড়াইয়া
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়!

পার্শ্বে "মর-মর" ধ্বনি ·
শুনিয়া ফিরানু চক্ষু বামেতে যেমনি,
হেরিনু ফুলের বনে একটি বালিকা ;
সুকুমাব করে শিশু কুসুম কলিকা
চযনে নিরত ছিল। বিদেশী এ পান্থে
সহসা সম্মুখে হেবি', একান্ত বিস্ময়ে
থমকি' দাঁডাল শুধু, পবক্ষণে ভয়ে
অবচিত পুষ্পগুলি ফেলি' পদ-প্রান্তে
যেমনি পলাতে যাবে, ক্রোড়ে তারে তুলি'
অভয়-আশ্বাস দিযা ক্ষুদ্র ফুলগুলি
আপনি কুড়ায়ে দিনু।

নামটি তাহার
সুধাইতেছিনু যবে স্নেহে বার বাব,
করুণা-কম্পিত কণ্ঠে কে কহিল, "হাসি"!

সে বাণী বিদ্যুৎসম মর্ম্মস্থলে আসি'
মুহূর্ত্তে চেতনা সুখ সব দিল নাশি'—
সে-ই সুর!—হায় প্রেম!—সে-হ "ভালবাসি"

নয়নের জল—বক্ষ-শোণিতের রেখা
লিখিল কি আজিও হা অদৃষ্টের লেখা
সুশুভ্র কপোলে তার?—

মোহ-অন্তে চাহি'

জগৎ হেরিনু শূন্য!—আর তারা নাহি!
শুধু দূরে গেল দেখা,—যায় চলি' ধীরে
চির জীবনের আশা। আজ তার শিরে,
পর-হস্তে আঁকা দীপ্ত সিঁদুরের টিপ!
করে, অন্য গৃহস্থের সন্ধ্যার প্রদীপ!

শ্রীমন্মথ

জাতীয় বর্ণ।

জাতীয় বর্ণ-বৈচিত্র্যের কারণ নিরূপণ আধুনিক মানব-তত্ত্ববিদ্‌গণের (anthropologists) নিকট একটা বিষম সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। মানবজাতির অন্তর ও বাহ্য প্রকৃতির খুঁটিনাটি বিষয়ক্রমে আবিষ্কৃত করিয়া, আধুনিক পণ্ডিতগণ অল্পদিন মধ্যে মানব-তত্ত্বকে একটা পরিণত শাস্ত্র তুলিয়াছেন সত্য,—কিন্তু বর্ণ বৈচিত্র্যের ন্যায় একটা ব্যাপারের প্রকৃত কারণ যে কি, তাহা অদ্যাপি কেহ করিতে পারেন না। আজকাল মতবাদের অভাব নাই, বিষয় দৃষ্ট হইলেই, সহস্র পণ্ডিতের সহস্র চিতভাবে অনুসন্ধিৎসুর দ্বারস্থ হইয়া, বেচারার ঘুরাইয়া দেয়। জাতীয় বর্ণ-বৈচিত্র্য-প্রসঙ্গেও তদ্রূপ ক সিদ্ধান্ত এপর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু কোন্‌টী যে সমীচীন, প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাবে তাহা নিশ্চিত হয় নাই। এতৎসম্বন্ধে নানা মতবাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ন্যায়সিদ্ধ বলিয়া অধিকাংশ স্থলে গৃহীত ছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা

তীয় বর্ণ-বৈচিত্র্যের কথা উঠিলেই, প্রাথমিক মানব-র বর্ণ কি ছিল, স্বতঃই এই প্রশ্ন আমাদের মনে উপস্থিত কিন্তু প্রাচীন মানবজাতির ইতিহাস এতই অসম্পূর্ণ তত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে কেহই এই প্রশ্নের নিঃসন্দিগ্ধ করিতে পারেন নাই। ভূপঞ্জরে প্রোথিত প্রাথমিক র কঙ্কাল উদ্ধার করিয়া, তাহা হইতে বর্ণসম্বন্ধে তথ্য বিষ্কার এক প্রকার অসম্ভব। কাজেই ভূতত্ত্ববিদ্‌ ও তত্ত্ববিদ্‌গণের নিকটেও আমরা এ সমস্যার একটা মীমাংসা আশা করিতে পারি না। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত র ওয়ালেস্‌ বহু অনুসন্ধান ও যুক্তি প্রয়োগ করিয়া ছিলেন, সম্ভবতঃ আদিম মনুষ্য আধুনিক মোগল র ন্যায় নাতিকৃষ্ণ ও নাতিশ্বেত এতদুভয়ের মাঝামাঝি বর্ণের ছিল, তা'র পর বংশবৃদ্ধির সহিত তাহারাই প্রধান ও উষ্ণপ্রধান দেশে বাস করিতে আরম্ভ করিলে, য় বর্ণ যথাক্রমে শ্বেত ও কৃষ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। র ওয়ালেসের এই সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ করিয়া, কয়েক-ক পণ্ডিত বলিতেছেন, য়ুরোপবাসীর তুষারধবল বর্ণই আদিম মনুষ্যের জাতীয় বর্ণ। কিন্তু এই শেষোক্ত পণ্ডিতগণ তাঁহাদের উক্তির পোষক বিশেষ কোন যুক্তি দেখাইতে পারেন না। কাজেই উভয় মতবাদের মধ্যে ডাক্তার ওয়ালেসের অনুমানই আজকাল সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইতেছে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, আদিম মনুষ্যের বর্ণ মসীমলিন কি তুষার-ধবল ছিল, তাহা যখন আমাদের অজ্ঞাত তখন তাহাদিগকে ডাক্তার ওয়ালেসের মতানুযায়ী মাঝামাঝি বর্ণের বলিয়া স্থির করা, স্থূলদৃষ্টিতে আমাদিগের নিকটেও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

মানব শরীরস্থ যে মৌলিক বর্ণ দ্বারা জাতীয় বর্ণ-বৈচিত্র্যের উৎপত্তি হয়, মৃতশরীর ব্যবচ্ছেদ দ্বারা পণ্ডিতগণ তাহা বহুকাল হইল আবিষ্কার করিয়াছেন। ব্যবচ্ছেদ-লব্ধ বর্ণই যে জাতীয় বর্ণ-বৈচিত্র্যের কারণ, তাহাতে আর এখন কোন মত-দ্বৈধ নাই;—কিন্তু উক্তবর্ণ জীবশরীরে কিপ্রকারে উৎপন্ন হয় এবং জাতিভেদে তাহার পরিমাণই বা কিপ্রকারে অল্পাধিক হইয়া মানবশরীরে বিভিন্ন বর্ণের বিকাশ করে, তৎসম্বন্ধে নানা বিরোধী মতবাদের কথা শুনা যায়।

এই সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদগুলির কথা বুঝিবার পূর্ব্বে উল্লিখিত মৌলিক-বর্ণের উৎপত্তিস্থান চর্ম্মের অবস্থান ও গঠনাদির বিষয়টা মোটামুটি জানা আবশ্যক। শরীরবিদ্‌গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,—মানবচর্ম্ম বাহির হইতে যেমন এক অভিন্ন স্তর-নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়, উহার গঠন বাস্তবিক তদ্রূপ নয়,—ইহাতে স্পষ্ট দুইটী পৃথক্‌ স্তর দেখা গিয়া থাকে। শারীরশাস্ত্রে ইহাদিগকে বহিশ্চর্ম্ম ও অন্তশ্চর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। বহিশ্চর্ম্ম রক্তপ্রবাহ রহিত নীরসকোষময় স্বচ্ছসামগ্রী দ্বারা নির্ম্মিত। জীবশরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গভেদে ইহার স্থূলতার ন্যূনাধিক্য দেখা যায়। কিন্তু অন্তশ্চর্ম্মের প্রকৃতি তদ্রূপ নয়, ইহাতে শরীরের অপরাংশের ন্যায় স্নায়বিক বিন্যাস ও রক্তকোষ সুস্পষ্ট পরিদৃষ্ট হয়।

অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে পূর্ব্বোক্ত বহিশ্চর্ম্মের প্রান্তে এবং অন্তশ্চর্ম্মের ঠিক্‌ উপরে কতকগুলি কোষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে যেগুলি বহিশ্চর্ম্মের নিম্নপ্রান্ত অতিক্রম করিয়া, উপরের দিকে থাকে, তাহাদিগকে চর্ম্মের গঠনোপাদানের ন্যায় সর্ব্বদাই নীরস অবস্থায় দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বনিম্ন কোষ সকল পরীক্ষা করিলে সর্ব্বদাই যেগুলিকে এক প্রকার বর্ণ-রসপূর্ণ দেখা যায়।

শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন,—কোষ-মধ্যস্থিত উক্ত রসই জাতীয় বর্ণোৎপাদনের মূল সামগ্রী।

আফ্রিকাবাসীদের মসীকৃষ্ণ চর্ম্মের পরীক্ষা করিলে পূর্ব্বোক্ত বিষয়টা বেশ বুঝা যায়,—ইহাদের বহিশ্চর্ম্মের নিম্নপ্রান্তে ও অন্তশ্চর্ম্মের উপরে বর্ণরসপূর্ণ বহু কোষ উপর্য্যুপরি স্পষ্ট সজ্জিত দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু কোষগুলির অবস্থান যতই বহিশ্চর্ম্মের উপরের দিকে উঠিতে থাকে, তাহাদের রসের পরিমাণ ততই হ্রাস হইতে আরম্ভ করে, কাযেই বহিশ্চর্ম্মের উপরিভাগটাকে সম্পূর্ণ নীরস ও স্বচ্ছ কোষময় উপাদানে গঠিত দেখা যায়।

পূর্ব্বোক্ত কোষরস কি কি উপাদানে গঠিত তাহা বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বহুদিন হইল স্থির করিয়াছেন। পদার্থটার রাসায়নিক গঠন কিঞ্চিৎ জটিল বলিয়া, ইহার বিশ্লেষ করিতে প্রথমে পণ্ডিতগণ বড়ই গোলযোগে পড়িয়াছিলেন, এজন্য তৎকালে নানা বিশ্লেষণ-লব্ধ ফলের মধ্যে প্রায়ই একতা দেখা যাইত না। এই কারণে উহার রসায়নিক গঠন সম্বন্ধেও নানা মতবাদের উৎপত্তি হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে অল্পদিন হইল, অধ্যাপক সর্বি (sorby) নামক জনৈক পণ্ডিত পূর্ব্বোক্ত বর্ণরসকে অভ্রান্তরূপে বিশ্লিষ্ট করিয়া, বিবদমান রসায়নবিদ্‌গণের তর্কদ্বন্দ্বের অবসান করিয়াছেন।

অধ্যাপক সর্বি প্রথমেই চর্ম্মের বর্ণ লইয়া পরীক্ষা করেন নাই। কেশের বর্ণোৎপাদক পদার্থ এবং চর্ম্মের বর্ণবৈচিত্র্য-সাধক রস মূলতঃ একই পদার্থ ইহা দেখিয়া তিনি প্রথমে কেশমূলস্থ কোষের বর্ণ লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং পরীক্ষান্তে, তাহাতে পাটল, পীত ও কৃষ্ণ এই তিনটী মৌলিক বর্ণ আবিষ্কার করিয়া তাহাই যে চর্ম্মেরও বৈচিত্র-সাধক, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সকল দেখাইয়াছিলেন।

পণ্ডিতগণ বলেন, বর্ণকোষে উক্ত বর্ণত্রয়ের সমসংমিশ্রণ দেখা যায় না। এই জন্য আমরা জাতিবিশেষে কেশচর্ম্মের নানা বর্ণ দেখিতে পাই। য়ুরোপবাসিগণের বহিশ্চর্ম্মের সেই নিম্নস্থ কোষগুলিতে কৃষ্ণবর্ণ অপেক্ষা পাটল ও পীতের আধিক্য দেখা যায়, এজন্য তাহাদের কেশ ও চর্ম্ম প্রায়ই তাম্র ও কাঞ্চন বর্ণের হইয়া পড়ে। আবার আফ্রিকা ও আসিয়াবাসিগণের বর্ণ-কোষে সর্ব্বদাই প্রচুর কৃষ্ণবর্ণ সঞ্চিত থাকে বলিয়া তাহাদের বর্ণ অল্পাধিক পরিমাণে কৃষ্ণ হইয়া যায়।

এখন দেখা যাউক, উক্ত বর্ণরসগুলির উৎপত্তি কোথায়। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেখিয়াছি, কোন তথ্য অবলম্বন করিয়া একাধিক পণ্ডিত গবেষণায় নিযুক্ত হইলে গবেষণালব্ধ ফলের মধ্যে প্রায়ই একতা দেখা যায় না, তারপর কোন এক নিরপেক্ষ পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়া, পরস্পরবিরোধী পণ্ডিতগণের যুক্তিতর্কের জঞ্জাল হইতে সত্যের উদ্ধার না করিলে প্রায়ই সেই বিরোধের আর অবসান হয় না। বর্ণরসের উৎপত্তির আবিষ্কার প্রসঙ্গেও গবেষণাপরায়ণ পণ্ডিতগণের মধ্যে পূর্ব্বোক্তপ্রকারের মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এপর্য্যন্ত সেই বিরোধের মীমাংসা হয় নাই।

বর্ণরসোৎপত্তি সম্বন্ধে একদল পণ্ডিত বলেন,—বহিশ্চর্ম্মস্থ সেই সর্ব্বনিম্ন বর্ণকোষগুলিই রসোৎপত্তির যন্ত্র। কোন এক অপরিজ্ঞাত পদ্ধতিক্রমে, সেই কোষগুলিতেই বর্ণরস সঞ্চিত হইয়া, তাহাই অপেক্ষাকৃত উপরিস্থ বর্ণকোষে সঞ্চারিত হইতে থাকে। আর এক পণ্ডিত-সম্প্রদায় বলেন,—পূর্ব্বোক্ত অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; বর্ণরসটা জীবশরীরের সর্ব্বাংশেই নিয়ত উৎপন্ন হইতেছে,—বর্ণ কোষগুলির কার্য্য সেই সর্ব্বদেহব্যাপ্ত রসকে একীভূত করা মাত্র। কিন্তু কি উপায়ে কোষে বা জীবদেহের সর্ব্বাংশে সেই বর্ণগুলির উৎপত্তি হয় জিজ্ঞাসা করিলে, প্রত্যেক পণ্ডিত সম্প্রদায়কেই একপ্রকার নীরব থাকিতে দেখা যায়।

স্বীয় স্বীয় মতবাদের অভ্রান্ততা প্রতিপাদন জন্য, উভয় পক্ষ এতাবৎ কাল যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিয়া, কোন্ মতবাদিগণ অভ্রান্ত তাহা নিঃসন্দেহে স্থির করা বড় দুরূহ। কিন্তু শেষোক্ত মতের প্রামাণ্য যুক্তিগুলির মধ্যে কতকগুলির যৌক্তিকতার কথা ভাবিলে, সেই মতবাদটাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন,—অস্ত্রবিদ্যার উন্নতির সহিত আধুনিক চিকিৎসকগণ দুষ্ট ক্ষত আরোগ্য করিবার একটী নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। এই চিকিৎসাপদ্ধতিতে সুস্থ ব্যক্তির গাত্রচর্ম্ম উঠাইয়া পীড়িতের ক্ষতস্থানে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং পরে ঔষধাদি প্রয়োগ করিলে সেই চর্ম্ম স্থায়িরূপে গাত্রস্থ হইয়া

পড়ে। উল্লিখিত চিকিৎসা পদ্ধতিতে কৃষ্ণকায় আফ্রিকাবাসীর চর্ম্ম শ্বেতকায় য়ুরোপবাসীর গাত্রে সংযুক্ত করিলে দেখা যায়,— উভয় চর্ম্ম যোড় লাগিলে, কালক্রমে সেই কৃষ্ণচর্ম্ম খণ্ড শ্বেত হইয়া পড়ে। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া শেষোক্ত মতবাদিগণ বলেন,—বিরোধী মতবাদিগণের কথা সত্য হইলে, শ্বেতকায় য়ুরোপবাসীর গাত্রসংলগ্ন কৃষ্ণচর্ম্ম কোনক্রমে শুভ্রতা প্রাপ্ত হইত না। কারণ তখন কৃষ্ণচর্ম্মস্থিত বর্ণকোষ হইতে কেবল কৃষ্ণবর্ণই উৎপন্ন হইয়া গাত্রের যুক্তস্থানটীকে চিরদিনের জন্য কৃষ্ণ করিয়া রাখিত, কিন্তু এই পরীক্ষায় তাহার বিপরীত ফলই দেখা গিয়া থাকে।—কাজেই স্বীকার করিতে হইবে, বর্ণরস শরীরের অপরাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া পরে কোষে সঞ্চিত হওয়াই সম্ভব, এবং সেই জন্যই শ্বেতকায় ব্যক্তির সর্ব্বশরীরে উৎপন্ন শুভ্রবর্ণোৎপাদক রসদ্বারা নব সংযুক্ত কৃষ্ণচর্ম্মস্থ কোষগুলি ক্রমে পূর্ণ হইয়া উঠে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই কৃষ্ণচর্ম্ম শ্বেতত্ব প্রাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের পোষক আর একটা সুন্দর প্রমাণ আছে,—কেশমূলস্থ বর্ণকোষ পরীক্ষা করিলে অনেক সময়েই কোষের চারিদিকে প্রচুর বর্ণরস সঞ্চিত দেখা যায় এবং সেই বর্ণরসই যে পরে কোষস্থ হইয়া পড়ে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়া থাকে। সুতরাং বর্ণরস যে শরীরের অপরাংশ হইতে সঞ্চিত হইয়া পরে কোষস্থ হয়, তাহা ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়।

সজীব প্রাণিদেহে শারীরিক ক্রিয়ার বিরাম নাই, পূর্ব্বোক্ত অনুমানদ্বয়ের মধ্যে যে'টাই সত্য হউক না কেন, উভয়েরই মতে যে বর্ণরস বহিশ্চর্ম্মের নিম্নস্থ কোষে সঞ্চিত হইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই ক্রমবর্দ্ধমান বর্ণরস কোথায় যায়? শারীর-তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে চর্ম্মস্থকোষ একস্থানে স্থির থাকে না; যে কোষ কিছুকাল পূর্ব্বে চর্ম্মের সর্ব্বনিম্নস্তরে সন্নিবেশিত ছিল, তাহাই ক্রমে চর্ম্মের উপরে আসিয়া, শেষে মৃতচর্ম্মরূপে শরীরচ্যুত হইয়া পড়ে—ইহা ত প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনা। তবে বর্ণরসপূর্ণ কোষগুলি চর্ম্মের উপরে আসিবার সময়. তাহাদের সেই রস কোথায় রাখিয়া আসে,—চর্ম্মের উপরিস্থ হইলেইত তাহাদিগকে নীরস ও স্বচ্ছ দেখায়। কোনপক্ষই এপর্য্যন্ত এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন নাই। কেহ কেহ আজকাল বলিতেছেন, যে সময় বর্ণকোষগুলি চর্ম্মের উর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে, সম্ভবতঃ তখন কোষস্থরস তাহার মৌলিক উপাদানে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু বর্ণরসের ন্যায় একটী স্থায়ী (Stable) এবং জটিল যৌগিক পদার্থ সহজে বিশ্লিষ্ট হওয়ার কথা, সহসা বিশ্বাস হয় না।

লজ্জা ও ভয়াদি প্রযুক্ত আকস্মিক মানসিক অবস্থা পরিবর্ত্তন দ্বারা গৌরাঙ্গ বা শ্বেতকায় ব্যক্তির যে বর্ণের রূপান্তর দেখা যায়, শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহারও কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—এই শ্রেণীর লোকের চর্ম্মকোষে কৃষ্ণবর্ণের অভাব থাকায় সমগ্র বহিশ্চর্ম্মটা এক্‌প্রকার স্বচ্ছ অবস্থাতেই থাকিয়া যায়; তা'পর পূর্ব্বোক্ত মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হেতু অন্তশ্চর্ম্মকোষে রক্ত সঞ্চিত হইলেই, স্বচ্ছ বহিশ্চর্ম্মের মধ্য দিয়া সেই রক্তের দীপ্তি প্রতিভাত হইয়া, বর্ণের রূপান্তর সাধন করে।

এখন পাঠক পাঠিকাগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, জাতিবিশেষে পূর্ব্বোক্ত মৌলিক বর্ণরসত্রয়ের অল্পাধিক্য দেখা যায় কেন? শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্যাপি এ প্রশ্নেরও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। জাতীয় বর্ণোৎপাদনে স্থানীয় শীতাতপ, দেশের ভৌগলিক অবস্থান, জাতীয় খাদ্য ইত্যাদির প্রভাব আমরা যেমন স্থূলবুদ্ধিতে অনুমান করিয়া থাকি, তাঁহারাও সেইরূপ মোটামুটি অনুমানের অধিক এক পদও অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলিতেছেন,—আমরা যে আদিম আফ্রিকাবাসিগণকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত দেখি, তাহা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলমাত্র। ইহাদের চর্ম্ম-স্থিত কৃষ্ণ রস-বহুল কোষগুলি ম্যালেরিয়া প্রভৃতি স্থানীয় রোগের প্রতিষেধক। তাই আসৃষ্টি ঐ সকল ব্যাধির সহিত যুঝিয়া তাহারা কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ডাক্তার টম্‌সন-প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন, শ্বেতকায় জাতির তুলনায় কৃষ্ণকায় জাতির যকৃতের আকার ও গুরুত্ব প্রায়ই অধিক দেখা যায়; সম্ভবতঃ যকৃতের এই গুরুত্বাধিক্যের সহিত জাতীয় বর্ণবৈচিত্র্যেরও কোন গূঢ় সম্বন্ধ আছে।

শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ বহুকাল হইতে বর্ণ বৈচিত্র্যের কারণানুসন্ধানে নিযুক্ত থাকিয়া পূর্ব্ব বর্ণিত কয়েকটী তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন,—আজও তথ্যের সংগ্রহ ও গবেষণা চলিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়; পণ্ডিতগণের এই ঐকান্তিক চেষ্টা যে

অচিরে সাফল্য লাভ করিবে, এ প্রকার লক্ষণ অদ্যাপি কিছুই দেখা যাইতেছে না।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

কুকিজাতির বিবরণ।

(৩)

কুকিজাতির মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা সজ্ঘটিত হইয়া গিয়াছে। এবার তদ্বিষয়ক কয়েকটি কথার আলোচনা করিবার চেষ্টা করা যাইবে।

সমগ্র কুকিজাতি এক সময়ে ত্রিপুর নৃপতিবৃন্দের শাসনাধীন ছিল। মুসলমান ও মগদিগের পুনঃ পুনঃ আহবে লিপ্ত হওয়ায় এবং ভারতের পতনের মূলসূত্র আত্মকলহের জন্য ত্রিপুর রাজ্যের বলবীর্য্য কিয়ৎ পরিমাণে হীনপ্রভ হয়। এই সুযোগে, (খ্রীষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে) কুকিগণ মস্তক উত্তোলন করিবার সুবিধা পাইয়াছিল এবং তদবধি সময় সময়ে ইহাদের দ্বারা নানাবিধ উৎপাত উপদ্রব সজ্ঘটিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে, ইহাদের মধ্যে অনেকে ত্রিপুরা ও মণিপুর রাজ্যের শাসনাধীন রহিয়াছে, কতকগুলি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের করতলগত হইয়াছে; আর কেহ কেহ আজ পর্য্যন্ত স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া আসিতেছে।

ত্রৈপুরী ১১৪৭ সালে (১৭৩৭খ্রীঃ) সুবারুদ্রমণি ঠাকুর* তদানীন্তন ত্রিপুরাধীশ্বর মহারাজ মুকুন্দ মাণিক্য বাহাদুর ও মুসলমান ফৌজদার হাজি মুলসমকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া, "জয় মাণিক্য" নাম গ্রহণে ত্রিপুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে দুর্দ্দম্য কুকিগণ জয়মাণিক্য বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিল, এই ঘটনাস্রোতে ত্রিপুর-রাজ্যে দীর্ঘকাল আত্মকলহ চলিয়াছিল এবং কুকিদিগকে বারংবার আহবে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। তদবধি কুকি সম্প্রদায় বিশেষ পরাক্রান্ত ও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে। ক্রমে ইহারা এমন দুর্দ্দম্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, তাহাদের বিপুল বিক্রমে এক সময় ত্রিপুর-সিংহাসনকেও কম্পিত করিয়াছিল!

মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্য বাহাদুর ত্রিপুর সিংহাসনের ১৩২ সংখ্যক ভূপতি। তিনি ১১৭০ হইতে ১১৯৩ ত্রিপুরাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে বঙ্গদেশ ভীষণ রাষ্ট্র বিপ্লবে নিমজ্জিত ছিল। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ পরলোক গমন করার পর তাহার অপরিণতবয়স্ক ও অপরিণামদর্শী দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনারূঢ় হইলেন। অল্পকাল পরেই আবার তাঁহাকে পদদলিত করিয়া, বিশ্বাসঘাতক মিরজাফর সিংহাসন অধিকার করেন! এবম্বিধ ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতে যখন বঙ্গের ভাগ্যলক্ষ্মী মুহুর্মুহু-কম্পিত হইতেছিলেন, সেই সময়ে ত্রিপুরার সমশের গাজি নামক জনৈক মুসলমান প্রবল-পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। এমন কি, সে স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া, মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য বাহাদুরকে, বারংবার সমরক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছিল।*

এই সময়ে কুকিগণ মহারাজ বাহাদুরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বহুবার সমশের গাজির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। এই সকল কারণে এবং বিদ্রোহী দলের প্ররোচনায় কুকিগণ উত্তরোত্তর এরূপ পরাক্রান্ত ও দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, অতঃপর ত্রিপুররাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেও তাহারা কিছুমাত্র ভীত বা কুণ্ঠিত হয় নাই।

১২১৪ ত্রিপুরাব্দে (১৮০৪ খ্রীঃ) মহারাজ রাজধর মাণিক্য বাহাদুর মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি মহারাজ লক্ষ্মণমাণিক্যের পুত্র (স্বীয় জ্ঞাতি ভ্রাতষ্পুত্র) কুমার দুর্গামণিকে যৌবরাজ্য এবং আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার রামগঙ্গাকে বড়ঠাকুরপদে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। মহারাজের মৃত্যুর পর সিংহাসনের অধিকারিত্ব লইয়া উভয়ের মধ্যে ভীষণ-আত্ম-কলহ উপস্থিত হইল। কর্ম্মচারিগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া, উভয়ের পক্ষ অবলম্বন করিল। অতঃপর কুমার রামগঙ্গা, "মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য" নাম গ্রহণপুর্ব্বক পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কুমার দুর্গামণি, কতিপয় কর্ম্মচারীর সাহায্যে দুর্দ্দান্ত কুকিদিগকে বাধ্য করিয়া, মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য বাহাদুরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন (১৮০৫ খ্রীঃ)। এই সময়ে কুকিদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত মহারাজ বাহাদুরের পক্ষে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হইয়াছিল।

---

* স্বাধীন ত্রিপুরার প্রাচীনকালে সেনাপতিকে "সুবা" উপাধি প্রদান করা হইত।

* হস্ত লিখিত বহু পুরাতন একখানা পুথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহা সমশের গাজির জীবনী। আমরা তদবলম্বনে সময়ান্তরে সমশের গাজির বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

কিছুদিন পরে কুমার দুর্গামণি কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া, মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্যকে কিয়ৎকাল শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করিতে হইয়াছিল (১২১৯ ত্রিপুরাব্দ)। এই সময় কুমার দুর্গামণি "দুর্গামাণিক্য" নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনারূঢ় হইলেন। তিনবৎসর কাল রাজ্যশাসন করিয়া মহারাজ দুর্গামাণিক্য কালকবলিত হইলে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য হৃতরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। এই ঘটনায় আবার দ্বিতীয় বিজয় মাণিক্য বাহাদুরের পৌত্র শম্ভুচন্দ্র ঠাকুর দাবী উপস্থিত করিলেন, মহারাজ দুর্গামাণিক্য কর্ত্তৃক তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন, সুতরাং সিংহাসন প্রাপ্তিপক্ষে তাঁহার অধিকার ছিল। তাঁহার এই দাবী কার্য্যকর না হওয়ায়, তিনি বাহুবলে সিংহাসন অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং কুকিদিগকে হস্তগত করিয়া, মহারাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। ১২৩৪ হইতে ১২৩৬ ত্রিপুরাব্দ (১৮২৪—২৬খ্রীঃ) পর্য্যন্ত তিনবৎসর কাল ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ করিয়া, শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরকে পরাজিত হইতে হইয়াছিল। এই সময় শম্ভুচন্দ্র দীর্ঘকাল পার্ব্বত্য জাতির সহিত একত্রে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮২৪খ্রীষ্টাব্দে তিনি চট্টগ্রামের এলাকাস্থ পার্ব্বত্য প্রজাদিগকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এজন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত পঞ্চ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করেন। কিন্তু পার্ব্বত্য জাতিসমূহ শম্ভুচন্দ্রের এরূপ বাধ্য ছিল যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ঘোষিত পুরস্কারের লালসায় তাহারা কেহই শম্ভুচন্দ্রকে ধৃত করিতে ইচ্ছুক হইল না।*

মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য বাহাদুরের পরলোক গমনের পর, তৎকর্ত্তৃক নিয়োজিত যুবরাজ (মহারাজ রামগঙ্গার কনিষ্ঠ সহোদর) কাশীচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর রাজদণ্ড ধারণ করিলেন (১২৩৭ ত্রিং—১৮২৬ খ্রীঃ) এই সময়ে আবার শম্ভুচন্দ্র ঠাকুর নানাবিধ উপদ্রব আরম্ভ করেন। মহারাজ বুঝিলেন, এবম্বিধ আত্মকলহের দরুণ রাজ্যের বিবিধ প্রকারের অনিষ্ট সাধিত হইবার আশঙ্কা আছে। এজন্য তিনি শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরকে বাধ্য করিয়া, তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ মাসিক ৫০০ পাঁচশত টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। অতঃপর শম্ভুচন্দ্র কর্ত্তৃক আর কোনরূপ উৎপাত উপদ্রব উপস্থাপিত হয় নাই।

মহারাজ কাশীচন্দ্র রাজ্যের উত্তর সীমান্ত প্রদেশ দৃঢ় করিবার পক্ষে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, কাছাড়ের অন্তর্গত হালিযা-কান্দি ও মণিপুরের অন্তঃপাতী থাঙ্গম্ নামক কুকিপল্লী ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া দাবি করিলেন, (১২৩৮ ত্রিপুরাব্দে)। এই সূত্রে মণিপুর রাজ্যের সহিত ত্রিপুরার সঙ্ঘর্ষণের আশঙ্কা হওয়ায়, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া, তদ্বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দেন। এতদুপলক্ষে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল, "থাঙ্গম্ খচাক" কুকিগণের পুরাতন বাসস্থান; ইহা ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা হইতে পূর্ব্বউত্তর কোণে, ১৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থান মণিপুরের অতি নিকটবর্ত্তী হইলেও পূর্ব্বে তাহা ত্রিপুরা-রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল, চারি পাঁচ বৎসর যাবৎ মণিপুরের পক্ষ হইতে তথায় একটি থানা সংস্থাপিত হইয়াছে। এজন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, মণিপুরের দখল বজায় রাখিয়া, ত্রিপুরাধিপতিকে তথায় সৈন্য প্রেরণের পক্ষে প্রতিনিবৃত্ত করেন।† হালিয়াকান্দি প্রভৃতি স্থান লইয়া, খ্রীষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও কাছাড়ের অধিপতির সহিত ত্রিপুররাজের বিবাদ চলিতেছিল।* হালিয়া কান্দির দক্ষিণ-দিকস্থ স্থান-গুলি ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে স্বীকার করা হইয়াছে।‡

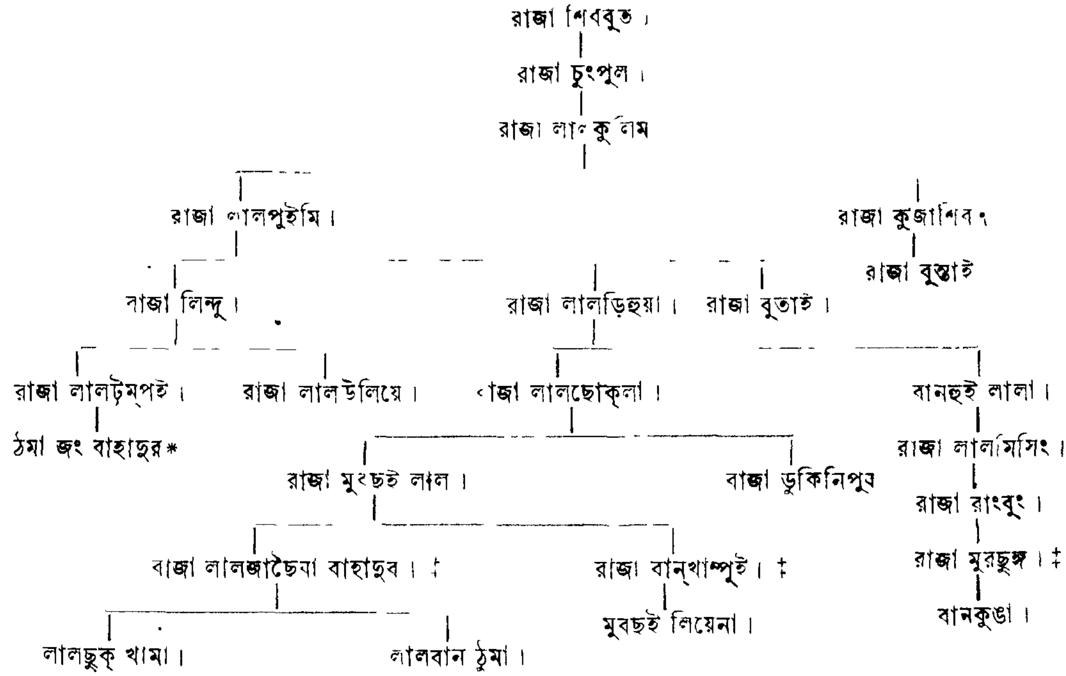
পাইতু সম্প্রদায়ের কুকিগণই অধিকতর দুর্ব্বৃত্ত ও হিংস্র স্বভাবাপন্ন। কুকিজাতি দ্বারা যে সকল লোমহর্ষণ ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছে, এই সম্প্রদায়ের কুকিগণই তাহার অধিকাংশ ঘটনার নায়ক। স্বাধীন ত্রিপুরার অন্তর্গত স্থানে ইহারা বসবাস করিয়া আসিতেছে। কৈলাস বাবু এই শ্রেণীর একটি শাখার বংশাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন কোন নামের গোলমাল ঘটিয়াছে। আমরা সেই শাখার যে বংশাবলী সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

* Mackenzie's North-East Frontier of Bengal. P. 276.

* Mackenzie's North East Frontier of Bengal P. 277.

† Wilson's Burmese war appendix P. XXVII.

‡ Pemberton's Report 1835.



এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত লালবুংঠমা বাহাদুর নামক একজন কুকি সরদার ত্রিপুর রাজ্যের অধীনে আছেন। এই ব্যক্তি ত্রিপুরার রাজদরবার হইতে "বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি রাজবংশসংসৃষ্ট নহেন বলিয়া তাঁহার বংশাবলী এস্থলে লিপিবদ্ধ করা হইল না।

উপরে যে বংশাবলী দেওয়া হইল, তাহার শীর্ষ স্থানীয় রাজা শিববুত স্বাধীন ত্রিপুরার সামন্ত নরপতি ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে—মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য বাহাদুরের শাসনকালে, রাজা শিববুত পঁচিশ হাজার কুকি সৈন্য লইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁহার পরবর্ত্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছে এবং কেহ কেহ ত্রিপুর সিংহাসনের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে।

অনুসন্ধানে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ পায়, ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে (১২৩৬ ত্রিপুরাব্দ হইতে) কুকিগণের উপদ্রব আরম্ভ হয়। এই সনে কুজাশিরের পুত্র রাজা বুস্তাই শ্রীহট্ট জিলার কতকগুলি কাঠুরিয়াকে অরণ্য মধ্যে বধ করিয়াছিলেন।

রামকানু ঠাকুর নামক ত্রিপুরার রাজবংশীয় এক ব্যক্তি রাজ পরিবার হইতে বাহির হইয়া গিয়া, কুকিদিগের সহিত মিলিত হন। এবং বিস্তর কুকি প্রজা লইয়া, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে, বৃটিশ রাজ্যান্তর্গত খণ্ডল পরগণার মেরকু চৌধুরী নামক এক ব্যক্তির বাড়ী আক্রমণ ও ভস্মীভূত করিয়া, এবং ১৫ জন লোকের প্রাণ বিনাশ করিয়া, পর্ব্বত মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ঘটনার নায়কদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ত্রিপুরার দরবারে লেখা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা উত্তর দিলেন যে,—"ইহারা ত্রিপুর রাজ্যের প্রজা নহে।"

১২৫৩ ত্রিপুরাব্দে (১৮৪৩ খ্রীঃ) রাজা লাল ডিহুয়া† পরলোক গমন করেন। তাঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে তদীয় পুত্র রাজা লাল ছোক্‌লা, নরমুণ্ড ও দাস দাসী উৎসর্গ করা সঙ্গত মনে করিলেন। এজন্য তিনি ১৮৪৪ খ্রীঃ ১৬ই এপ্রেল তারিখে শ্রীহট্ট জিলার অন্তঃপাতী প্রতাপগড় পরগণার মধ্যগত কচুবাড়ী গ্রাম আক্রমণ করিয়া, ২০টি নরমুণ্ড ও ৬টী দাসদাসী সংগ্রহ করিলেন। এই লোমহর্ষণ ঘটনার নায়কদিগকে

☞ ‡ চিহ্নিত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান সময়ে ত্রিপুর রাজ্যের সামন্ত নরপতি পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইহাদের অবস্থাদি পরে লিপিবদ্ধ করা হইবে। ইহার বিশেষ মূল্যবান ১ খণ্ড বাইনেলা প্রস্তর ত্রিপুরার রাজ সরকারে আমানত আছে। এই প্রস্তর ওয়ারিশীভুক্ত পাওয়ার নিমিত্ত বানথাম্পুই একবার দাবি করিয়া ছিলেন।

* Mackenzie's North-East Frontier. P. 280.

† কৈলাস বাবু ইহাকে 'রাজালাল' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ধৃত করিবার নিমিত্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হইতে ত্রিপুরার দরবারে চিঠি প্রেরিত হইল। কিন্তু এবম্বিধ বীর পুরুষকে ধৃত করিয়া দেওয়া বোধ হয় দরবারের অভিপ্রেত ছিল না। অথচ গবর্ণমেণ্টের চিঠির মর্য্যাদা রক্ষা করাও আবশ্যক ছিল। এজন্য এক জন দারোগাকে ১০ জন বরকন্দাজ সহ, লালছোক্‌লাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত পাঠান হইল। * বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট পুনঃ পুনঃ তাগিদ দেওয়ায়, প্রথমতঃ চারি জন কুকি অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া, লাল ছোক্‌লাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত একদল পদাতি সৈন্য সহ কাপ্তেন ব্লেক্ উড্‌কে ত্রিপুর রাজ্যে প্রেরণ করেন। এই সময় ত্রিপুর রাজ্যের কেলি ফেরিঙ্গি নামক জনৈক সেনাপতি লালছুক্‌লাকে ধৃত করিয়া কাপ্তেন ব্লেক্ উডের হস্তে অর্পণকরেন (১৮৪৩ খ্রীঃ ৪ঠা ডিসেম্বর)। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিচারে লাল ছোক্‌লা দ্বীপান্তরিত হইয়াছিলেন।

কিয়ৎকাল পূর্ব্বে, ত্রিপুরার রাজবংশীয় কোনও ব্যক্তির ক্ষোভের কারণ ঘটিলে, তিনি কুকিদিগকে হস্তগত করিয়া, নানাবিধ অশান্তিজনক কার্য্যানুষ্ঠানে লিপ্ত হইতেন। ভগবান চন্দ্র ঠাকুর নামক রাজবংশের এক ব্যক্তি ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কতকগুলি কুকি সংগ্রহ করিয়া, থগুলের অন্তর্গত একখানি গ্রাম লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করিয়াছিলেন।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কুকিগণ সমবেত হইয়া, ত্রিপুরা রাজ্য ও শ্রীহট্ট জিলার সীমান্ত দেশে প্রায় দেড় শত লোকের প্রাণ বিনাশ ও লুণ্ঠনাদি দ্বারা ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল। এই ঘটনার প্রতিবিধান জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু ত্রিপুর রাজ্যের পক্ষ হইতে গবর্ণমেণ্টকে জানান হইল যে, এই হত্যাকাণ্ড ত্রিপুর রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী স্থলে ঘটিয়াছে, সুতরাং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অধিকারী নহেন। এই কথা লইয়া কিছুকাল তর্ক বিতর্কের পর, লেপ্টেনেণ্ট ফিসারের কৃত মানচিত্র অবলম্বনে ঘটনাস্থান ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া সাব্যস্ত হইল এবং গবর্ণমেণ্ট স্বীয় সৈন্যদিগকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বহু সংখ্যক কুকি সমবেত হইয়া, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ও কাছাড় প্রভৃতি অঞ্চলস্থিত বৃটিশ রাজ্যে প্রবেশ করিয়া, অনেকগুলি লোকের জীবন বিনাশ ও কয়েকখানি গ্রাম ভস্মীভূত করিয়াছিল। এই সময়ে কতকগুলি লোককে কুকিগণ গ্রেপ্তার করিয়া আপনাদের আবাস স্থানে লইয়া যায়।

কুকিগণ উপর্য্যুপরি অত্যাচার করায় তাহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কর্ণেল লেষ্টার কাছাড় হইতে সসৈন্যে কুকিদিগের আবাস ভূমির দিকে যাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন। এই সময়ে পূর্ব্বদিকে বৃহৎ একদল কুকি চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে, এবং আর এক দল কুকি শ্রীহট্টের লাতু থানার অন্তর্গত স্থানে প্রবেশ করিয়া, নরহত্যা, গৃহ দাহ ও লুণ্ঠনাদি দ্বারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল। এই সকল অত্যাচারকারী ত্রিপুর রাজ্যের প্রজা বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল।

যথা সময়ে কর্ণেল লেষ্টার কুকিগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। এ যাত্রায় তিনি খ্যাতনামা কুকি সরদার মুর্কপই লালকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। অতঃপর প্রায় দশবৎসর কাল কুকিগণ কোন প্রকার অশান্তিজনক ঘটনার সংঘটন করে নাই। তথাপিও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ইহার পর সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার নিমিত্ত স্থানে স্থানে সেনানিবাস সংস্থাপন ও চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য জেলা (Chittagong Hill Tract) স্থাপন করিয়া, তথায় এক জন ইংরেজ সুপারিটেণ্ডেণ্টের নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা কুকিগণ কিয়ৎপরিমাণে দমিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

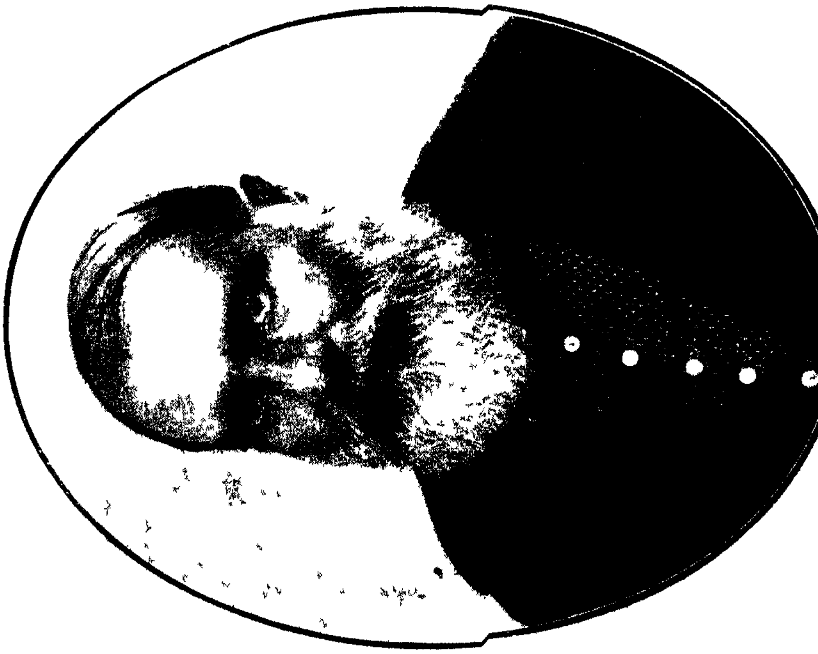
শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।



* কৈলাস বাবুর রাজমালা—৩য় ভাঃ,৬ষ্ঠ অঃ, ৩৫৭ পৃঃ।



শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।



শ্রীযুক্ত মৌলবী মীর মশরফ্ হোসেন।



সাধারণ কুকি সৈন্য।



বন্দুকধারী কুকি সৈন্য।



পঞ্চবটী পাহাড়।

কংগ্রেস।

অট্টালিকার ভূগর্ভস্থ 'বনিয়াদ'—দেশের বিপুলকায় 'কৃষিবল' এবং তদনুরূপ ও তদানুষঙ্গিক, অতি বৃহৎ বৃহৎ খণ্ড শক্তি-সঞ্জাত নিম্নতর ও নিম্নতম- সমাজ,—জীবের জীবন ধারণোপযোগী ও বাণিজ্যের বিনিময়োপযোগী দ্রব্য-জাতের জনয়িতা শারীরিক শ্রম, তাহার উপর, যে একমাত্র সর্ব্বাদ্য বনিয়াদের উপর, যন্ত্র-শক্তি ও শিল্পবল বিরহিত এই বিরাট ভারতভূমি, তাঁহার ত্রিশ কোটী অন্নক্লিষ্ট প্রাণী সহ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ও আনুষঙ্গিক ধারণাবলম্বনের অভাবে নিয়ত থর থর কাঁপিতেছেন;—সেই নিম্নতর নিম্নতম অথচ দেশের একমাত্র নির্ভর ভিত্তি—অসীম লোক পারাবার, চির অজ্ঞানান্ধকারের যথাবৎ গাঢ় তামসাভ্যন্তরে রাখিয়া, তাহার কোনও এক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর ভগ্নাংশ মধ্যেও এক বিন্দু আলোক-রশ্মি প্রবিষ্ট বা প্রবিষ্ট করিবার চেষ্টা মাত্র না করিয়া, স্বায়ত্ত শাসনাধিকার বা দাসত্ব-বিরহিত আত্মদর্শী মানবাধিকারের একটী অক্ষরও তাহাদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত বা নিক্ষিপ্ত করার উপায় উপলক্ষ চিন্তা না করিয়া, এক কথায় প্রকৃত দেশ—দেশের বিশাল দেহ, সাফ্ পশ্চাতে ফেলিয়া; পরন্তু, ঐ সকল স্তরের অব্যবহিত উর্দ্ধ, উর্দ্ধতন স্তরনিচয় ও তদুপরি অবস্থিত শিক্ষালোকস্থবিবর্জ্জিত বা কিয়ৎ পরিমাণে শিক্ষালোক-প্রাপ্ত মধ্য বা নিম্ন-মধ্য সমাজের অসংখ্য লোকপ্রবাহ অতিক্রম করিয়া, তাহাদের অস্তিত্বই উপেক্ষা করিয়া, ইংরেজী অনভিজ্ঞ অথচ দেশীয় বহু বিদ্যায় বিশারদ, ভারত সমাজের সনাতন ব্যবস্থাপক শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রেণী গণনার মধ্যে না আনিয়া, উচ্চাদপি উচ্চ ইংরেজী শিক্ষিত কতকগুলি লোক এবং বিত্তবৈভবশালী কতকগুলি লোকের সমষ্টিতে কংগ্রেস গঠিত হইলেন। এবং কখনও সমগ্র দেশের প্রতিনিধি এবং কখনও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলিয়া আত্ম পরিচয় দিলেন ও সেই পরিচয়ে, রাজদ্বারে স্বায়ত্ত শাসনাধিকার ও নানা বিভাগে শাসন-সংস্কার প্রার্থনা করিলেন! গত ষোল বৎসর কাল এই প্রার্থনা উক্ত পুনরুক্ত করিয়া আসিতেছেন; উপস্থিত সপ্তদশ অধিবেশনে তাহাই করিলেন। ইহার ফল যাহা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা বিদ্যমানই আছে; এবং তদ্দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে, ফল ভবিষ্যতে সম্ভবতঃ তাহাই হইবে।

কঙ্গ্রেস উহার উপস্থিত গঠনে, প্রকৃত পক্ষে দেশের প্রতিনিধিত্ব কি পরিমাণে বহন করে, আমরা ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে, কঙ্গ্রেসকে, যেরূপ ভাবে গ্রহণ করেন, বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রচলিত নিম্ন লিখিত প্রাচীন শ্লোকার্দ্ধটীতে প্রকাশিত হইবে;—

"গৌবাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো নচ খণ্ড ন অংশ চ"

গবর্ণমেণ্টের ধারণা, যেমন কংগ্রেসের প্রতি ব্যবহার করেন, তদ্রূপ কংগ্রেসের কথায় কর্ণপাত করেন। অতি শক্তিশালী যথেচ্ছাচারী রাজশাসনের পক্ষে, প্রজাশক্তির পূর্ণ প্রতিধ্বনিই যখন প্রায় "কিছুই নয়" তখন উহার ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি, একেবারেই কিছু নয়, অতএব অগ্রাহ্য ইহা আর আশ্চর্য্য কি! কামান সঙ্গীনের সটান শাসন-প্রথা সত্ত্বেও, যে নিম্নতর শ্রেণী-নিচয়ের চঞ্চলতা সংঘটন স্বভাবতঃ গবর্ণমেণ্টের তবুও কিঞ্চিৎ চিন্তার উদ্রেক করে, তাহা কঙ্গ্রেসের মধ্যে, নিম্নে, মূলে নাই, গবর্ণমেণ্টের এই বিশ্বাস। কঙ্গ্রেসের নিম্নতলে কিছুই নাই, কঙ্গ্রেস আকাশের উপর গঠিত, গবর্ণমেণ্টের ইহা দৃঢ় ধারণা। এ ধারণা অমূলকও নহে। প্রত্যুত, এসম্বন্ধে যাহা অমূলক গবর্ণমেণ্টের তাহাতেও কোন্ আস্থা না আছে? এখনকার সুদক্ষ ও সহৃদয় রাজপ্রতিনিধি স্বয়ং লর্ড কুর্জ্জন নাকি বলেন "Oh! the congress-men! they are not in a position to speak for the masses, they have no sympathy for them. They know them very little.

পরন্তু, ষ্টেট সেক্রেটারির নাকি ধারণা যে, কংগ্রেসওয়ালারা কুসীদজীবী এবং রায়ত সাধারণের শোণিতশোষক। এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের দিক দিয়া, সহজে স্বায়ত্ত শাসনাগম, —প্রতিনিধি প্রথার বা প্রজার প্রাপ্য স্বত্বাধিকারের প্রাপ্তি কত দূর সম্ভব, তাহার প্রত্যাশা করা কতদূর সঙ্গত, তাহা দেশের সর্ব্বোচ্চ চিন্তাশীল ও সুমহৎ মস্তিষ্কনিচয়ের সমষ্টি কংগ্রেস অবশ্যই বিচার করিয়া দেখিয়া থাকিবেন। তথাচ যে স্বায়ত্ত শাসনের ছায়া-শরীরের এক আধ কণা—ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ও নির্ব্বাচন প্রণালীর যৎসামান্য অংশ দেশীয়-দিগকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ বা নিগ্রহ যাহাই হউক, কংগ্রেসেরই সাধনাসঞ্জাত কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এক দিকে অবস্থা এই। গবর্ণমেণ্ট স্বভাবতই স্বায়ত্ত শাসনাধিকার দিতে অসম্মত; যৎসামান্য যেটুকু দিয়াছেন তাহাও অল্পাধিক খর্ব্ব করিয়াছেন ও দিন দিন সে দিকেই প্রবলতা দেখাইতেছেন। কিন্তু অপর দিকে, এ সম্বন্ধে দেশের অবস্থা কি? আপামর সাধারণ এই "স্বায়ত্ত শাসনরূপ" "দিল্লীকা লাড্ডু" আনলেই কি "চিজ্" একেবারেই চিনে না; চৌকিদারি পঞ্চায়েতের ব্যাপারে বাধিয়া বেচারীরা বিপদেই পড়িয়াছে। কংগ্রেস বা কন্‌ফারেন্স কোনও দিন, "ঐ চিজ্"টা তাহাদিগকে চিনাইয়া দিবার জন্য চেষ্টাও করেন নাই। পঞ্চায়েতি প্রপঞ্চেও কখনও তাহাদের পার্শ্বে দাঁড়ান নাই। কাযেই, অশিক্ষিত জন সাধারণ ও গ্রাম্য "পঞ্চ"গণ স্বায়ত্ত-শাসন শিশু-শিক্ষার সম্পূর্ণ বর্ণ বোধ-হীন। যে ব্যবহার দ্বারা মনুষ্য হৃদয়ে প্রবৃত্তির বিকাশ হয় ও বন্ধন হয় তাহা হইতে আপামর সাধারণ খুবই দূরে রহিয়াছে। কিন্তু, কংগ্রেস যে শিক্ষিত সাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ, যে সকল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য স্বায়ত্ত শাসনের কামনা করেন, তাঁহাদের অনেকেই যে বিষয়টী বুঝেননা বা বিপরীত বুঝেন; তাঁহাদের অনেকেই যে স্বায়ত্ত শাসন নির্ব্বাচনাধিকারের বিরোধী; কংগ্রেস তাহার কি বলিবেন? এমনও এক শ্রেণীর সুশিক্ষিত লোক আছেন, যাঁহাদের বিবেচনায় স্বায়ত্ত শাসন "অনাহারী" ব্যাপার, উহা কেবল ঘরের খাইয়া বেগার খাটা; বিনা বেতনে ফাঁকি দিয়া কাজ লইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট স্বায়ত্ত শাসনের ফন্দী করিয়াছেন। পরন্তু, স্বায়ত্ত শাসন ও নির্ব্বাচন-প্রথা জাতিনাশা কল, উঁচু নিচু, বামুন মুচি সব একাকার করিবার সৃষ্টি, এরূপ অভিমত নেহাত অশিক্ষিত সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত হয় নাই; উহাও শিক্ষিত শ্রেণী বিশেষের মত বটে। পুনশ্চ, ইহাও আমরা বহু শিক্ষিত জনের মুখেই শুনিয়া থাকি এবং ইহা দেশের বহুব্যাপ্ত সংবাদপত্রে, সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তস্বরূপ প্রকটিত হইয়া, সহস্র সহস্র শিক্ষিত অশিক্ষিত পঠনক্ষম লোকের মধ্যে প্রচারিত হইয়া থাকে যে, স্বায়ত্ত শাসন ও নির্ব্বাচন রাজনীতি দ্বারা, দেশে কেবল অনিষ্ট ও অমঙ্গলেরই সৃষ্টি হইয়াছে। বিসম্বাদ বাড়িয়াছে, আত্ম-কলহের সৃষ্টি হইয়াছে, চাতুরী প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচার, তোষামোদ, উৎকোচের আদান প্রদান ও আরও অনেক দুর্নীতি-স্রোত দেশ মধ্যে খর প্রবাহিত হইয়া ঐ প্রথার অনিষ্টকারিতার পরিচয় দিতেছে ইত্যাদি।

এখন দেখুন, যে দেশে স্বায়ত্ত শাসন সম্বন্ধে, শিক্ষিতেরও ঐরূপ ভ্রম এবং অসংখ্য অশিক্ষিত সম্প্রদায় উহা অপেক্ষাও অধিকতর ভ্রান্ত সংস্কার পোষণ করে; পরন্তু, শিক্ষিত বা অশিক্ষিতই হউক অব্যবহিত ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্বন্ধ বই "সাধারণ" বলিয়া একটা ব্যাপার, ও তাহা সম্পাদনার্থে স্ব স্ব কর্ত্তব্যাংশ প্রায়ই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না; হয়ত উহা হইতে একেবারেই দূরে থাকে, সহজে উহাতে লিপ্ত হইতে চাহে না, অথবা কেবল স্ব স্ব ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ সাধনোদ্দেশেই লিপ্ত হয়, এবং লিপ্ত হইয়া তাহারই অনুসরণে সাধারণের স্বার্থ সঙ্কোচ বা লোপ করিয়া, স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার উপর কলঙ্ক আরোপ করিবার নানা কারণ সংঘটন করে;—যে দেশে সাধারণতঃ অবস্থা এই, সে দেশ স্বায়ত্ত শাসনের উপযুক্ত হইয়াছে এবং ঐ মহা ইষ্টকর মনুষ্যোচিত অধিকার লাভের জন্য একান্ত আকাঙ্ক্ষী হইয়াছে, কিরূপে বলিব? যাহা ঘটনা, তাহা উপেক্ষা করা উচিত হয় না। ঘটনা ঘটনাস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, তাহার প্রতিকারের উপায় বিধান করাই কর্ত্তব্য। সাধারণ অভিমত যতই ভ্রান্ত, যতই অসার হউক না, তাহা দ্বারা যখন জন সাধারণের চিত্ত আন্দোলিত ও বিচলিত হইতে থাকে ও তাহাতে করিয়া দেশের প্রকৃত হিতকর অনুষ্ঠানে লোকের অনাস্থা ও অবিশ্বাস উৎপন্ন হয়, তখন তাহাতে কর্ণপাত না করা, তাহা আদৌ উপেক্ষা ও অশ্রদ্ধা করা, এবং অবস্থানুসারে অতি ধীর ভাবে তাহার কোনও না কোনও প্রতিকারের চেষ্টা না করা, সাধারণ স্বার্থের স্বনিয়োজিত তত্ত্বাবধায়ক, স্বদেশ-হিতৈষী মহাত্মাগণের উপযুক্ত হয় না। দেশেরই দুর্ভাগ্য যে, কংগ্রেস ও কন্‌ফারেন্স নিচয়, বিশেষতঃ শেষোক্ত স্থানীয় সমিতি সকল অনবধানতা, ঔদাসীন্য বা অন্য যে কোনও কারণ পরম্পরাতেই হউক, এই সকল এবং এবম্বিধ বিষয় নিচয়ে আদৌ লক্ষ্য করিতেছেন না। অনেক সময়ে আমরা ভ্রান্তি বশতঃই কনফারেন্সের করণীয় কার্য্যের ত্রুটির জন্য কংগ্রেসের উপর দোষরোপ করিয়া থাকি। সেটা কেবল অন্যায় নয়, বিলক্ষণ অনিষ্টকর। কনফারেন্স নিচয়েরই অনিবার্য্য কর্ত্তব্য স্ব স্ব অধিকার, অল্পে অল্পে, আত্মশাসনের উপযোগী করিয়া তুলা, উহার সারত্ব ফলোপদায়কতা, ইষ্টকারিতা, একান্ত আবশ্যকতা ও বিশুদ্ধি-প্রয়োজনিয়তাদির বিষয়, নানা ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে, জন সাধা-

রণকে শিক্ষা দেওয়া। তদ্বারা অজ্ঞতার ঘন অন্ধকার ক্রমে ক্রমে, কতকটা সাফ হইয়া, লোক সাধারণের চিত্তে, যথা সম্ভব সমষ্টিত "সাধারণ" স্বার্থের প্রকৃত অনুভূতি ও সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির সমবেত বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত চেষ্টায়, তাহার সাধনের একান্ত আবশ্যকতা সম্বন্ধে, অল্পাধিক একটা জ্ঞান ও সাধারণ কার্য্য উদ্ধারের একটা অকৃত্রিম উৎসাহ জন্মিয়া, দেশ যথা সম্ভব স্বায়ত্ত শাসনের উপযোগী না হইলে এবং স্বায়ত্ত শাসনাধিকার কেবল অতীব ইষ্টকর নয়, সবিশেষ সম্ভ্রমকর, সাধারণ্যে এই ধারণা না জন্মিলে, বলা বাহুল্য যে, কংগ্রেস ও কনফারেন্সের প্রায় কোন উদ্যমই সম্পদ ও দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবার খুব কমই আশা করা যাইতে পারে। কাজটা যতই জটিল, কঠিন ও সুসাধন অসম্ভাব্য বলিয়াই প্রথমতঃ অনুভূত হউক, প্রকৃত পক্ষে, ততটা অসাধ্য হইবে না। কার্য্যক্ষেত্রে "হাতে হেতেরে" উপস্থিত হইলেই তাহা বেশ বুঝা যাইবে। এই ষোল বৎসর কাল এ বিষয়ে কিছু কিছু কার্য্য হইয়া থাকিলেও, মনে করুন, ঐ কার্য্য আজ কত দূর অগ্রসর হইত। একমাত্র ইংরাজী ভাষা ভিন্ন দেশীয় ভাষা সকলের সহিত কংগ্রেস কনফারেন্সের একেবারেই সংস্রব নাই বলিলেই চলে, ইহা অপেক্ষা অভাগ্য ও অকার্য্য নীতি আর কিছুই হইতে পারে না। দেশীয় ভাষার আশ্রয় অ বরচলিত ও অবিশ্রান্ত ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, তদ্বারা নিয়তই কংগ্রেস-নীতি কংগ্রেসের শিক্ষা প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক পল্লীতে প্রেরিত ও প্রচারিত করিতে হইবে। রাজনীতি ও প্রজানীতি, স্বায়ত্ত শাসন, নির্ব্বাচন, গ্রাম্যপঞ্চ, লোকাল বোর্ড, ডিষ্ট্রীক্ট ও মিউসিপাল-বোর্ড, ক্রমে ক্রমে স্থানীয় ও সুপ্রিম কৌন্সিলাদির কথা, সাধারণ কার্য্য পরিচালন প্রথা-প্রণালী বিষয়ক শিক্ষা, —মূল সূত্র,—"কখ" হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। অতি সহজ ও সরল, এমন কি গ্রাম্য ভাষায় চিত্তাকর্ষক করিয়া ও নিত্য পরিদৃষ্ট বিষয় ও লোকব্যবহার হইতে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া, শিক্ষা বিধান করা চাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা, বক্তৃতা কথোপকথন লিপি, ইত্যাদি দ্বারা নিয়মিত ভাবে, ও বিষয়ের একই অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থিত, ক্রমবর্দ্ধনশীলতার পর্য্যায়ে, শিক্ষা সঞ্চালিত করিতে হইবে। গ্রাম্য পাঠশালা, স্কুল, টোল, হাট, নিমন্ত্রণ সভা, দেবালয় মশজিদ প্রভৃতি লোক সাধারণের সমাগমের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে ও বৈঠকে বক্তৃতা, কথোপকথন, পাঠ, আলাপ ও আলোচনার ব্যবস্থা দ্বারা এ শিক্ষা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজে, মফঃস্বলের অতি অপরিচিত পল্লী সকল মধ্যেও প্রবিষ্ট করান যাইতে পারে। প্রত্যেক কনফারেন্সের অধীনস্থ এলাকা মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক, প্রথমতঃ পরীক্ষা স্বরূপ না হয়, অল্প সংখ্যক প্রচারক, শিক্ষক ও পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়া ও স্থানে স্থানে অবকাশ-যুক্ত ও অল্পাধিক পরিমাণে শিক্ষিত ও সাধারণ হিত-রত, স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ও সহৃদয় ব্যক্তি সকলকে অবৈতনক এজেণ্ট বা সম্পাদক নির্ব্বাচন করিয়া, তাঁহাদের দ্বারা অল্পে অল্পে, কার্য্য পরিচালনা করা যাইতে পারে। পরন্তু ইঁহাদের দ্বার কংগ্রেস ও কনফারেন্স দেশের আর ও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহা উপযুক্ত সময়ে আবশ্যক মত ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু কার্য্যে ব্যবহার ও প্রয়োগ করিতে পারেন। পক্ষান্তরে, এই সূত্রে, স্থানীয় অনেকানেক অভাব অভিযোগেরও প্রতিকার হইয়া ও নিত্য নৈমিত্তিক বহুব্যাপারে, স্থানীয় লোক সাধারণ সুমন্ত্রণা ও সৎপরামর্শাদি দ্বারা উপকৃত হইয়া, প্রকৃত পক্ষে ও প্রভূত পরিমাণে কংগ্রেস ও কনফারেন্সের পক্ষপাতী হইয়া উঠে ও শত শত সহস্র সহস্র লোক, গ্রাম কি গ্রাম, মহকুমা—কি-মহকুমা স্থানীয় কনফারেন্স নিচয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই রূপে ক্রমে প্রত্যেক জেলায়, কনফারেন্সের নিজের অসংখ্য "পল্লী পঞ্চায়েত" গ্রাম্য সমিতি বা "ভিলেজ ইয়ুনিয়ন" ও তাহাদের উদ্ধতন পরিচালক ও পরিদর্শক সভা, মহকুমার ও জিলার ভিন্ন ভিন্ন সদর ও কেন্দ্র স্থলে সৃষ্ট ও গঠিত হইয়া প্রাদেশিক কনফারেন্সপুঞ্জও মূল কংগ্রেসকে প্রকৃত বলে, বলীয়ান ও সংশয়মাত্র বিরহিত সুদৃঢ় ভিত্তি-স্থিত এমন এক সজীব, সক্ষম ও সমর্থ মহা-শক্তি-সমন্বিত করিতে পারে যাহাকে পৃথিবীর কোনও সভ্য রাজশক্তিই উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। এইরূপ হইলেই প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব, সম্যক ও অখণ্ড একতা ও স্বায়ত্ত শাসনের যথার্থ ভিত্তি স্থাপিত হয়, সে অধিকার অবশ্যম্ভাবী হইয়া তাহা প্রাপ্তির অধিক অবশিষ্ট থাকে না। গবর্ণমেণ্ট স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সসম্ভ্রমে সে অধিকার অর্পণ করিতে বাধ্য হইতে পারেন।

শিক্ষা প্রদান-স্থলের সর্ব্বাদ্য মূল গ্রাম ও পল্লী-হইতে, এবং শিক্ষনীয় বিষয়ের সর্ব্বাদ্য অক্ষর,—কংগ্রেস কথার

"ক, খ" হইতে কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। অন্যথা, আশানুরূপ ফললাভের সম্ভাবনা হয় না। আজ ১৬ বৎসর কঙ্গ্রেস হইয়াছে; কিন্তু এ যাবৎ কালের মধ্যে কঙ্গ্রেসের মূলতত্ত্ব বিষয়ক জন সাধারণের বোধ্য, শিক্ষতব্য ও জ্ঞানগম্য কোনও পুস্তক পুস্তিকা প্রস্তুত ও প্রকাশিত করেন নাই। স্বদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কঙ্গ্রেস বিষয়ক মূল তত্ত্ব বা কোনও বিবরণই সুচারু রূপে ও চিত্তাকর্ষক ভাবে লিখনক্ষম একটী শক্তিমান সুলেখক দেখা দেন নাই। কঙ্গ্রেস কনফারেন্স দেশীয় ভাষা হইতে, আপনাদিগকে একেবারেই দূরে রাখিয়াছেন, কাযেই ঐ দুয়ের একটীরও উৎপত্তি হয় নাই। যাহাহউক অতঃপর অবিলম্বেই "কংগ্রেস-শিক্ষা প্রথম পাঠ্য পুস্তকাবলী" প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় প্রস্তুত হইয়া প্রদেশে প্রদেশে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। ধর্ম্ম কর্ম্ম বা লোক-নীতি সর্ব্বসাধারণ্যে প্রচারিতব্য যে বিষয়ই হউক, প্রথম কল্পে, তাহার মূল তত্ত্ব বিজ্ঞাপক-সর্ব্বাদ্য সাহিত্য সর্ব্বলোক-বোধ্য জনসাধারণের ভাষায় সৃষ্ট হইয়া অবাধ প্রচারিত না হইলে, সে বিষয় কোনও কালে ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত হয় না, পৃথিবীর সাধারণ অনুষ্ঠান মাত্রেরই ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে, কঙ্গ্রেস-কর্তৃপক্ষ গণের এ বিষয়টী ধীর ভাবে ভাবিয়া দেখা বিধেয় হয়। কঙ্গ্রেস সম্বন্ধে অত্যুৎকৃষ্ট ইংরেজী রচনা বিস্তর দেখা যায়; কিন্তু, দেশীয় ভাষায় তাহার অতি ক্ষীণ অনুকরণও অদ্যাবধি একটীও দেখি নাই।

শুনিয়াছি কঙ্গ্রেসের বহু ও বিবিধ বিষয় সবিস্তারে বিবৃত করিয়া, অবশ্য ইংরেজীতেই, উন্নত অঙ্গের মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করিবার জন্য এবার বিশেষ বিশেষ সুলেখকগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সংবাদ সত্য হইলে, কঙ্গ্রেসের ইষ্ট কল্পে. ইহা অতীব প্রশস্থ পন্থা। প্রবন্ধ রচনার্থে, যে সকল বিষয় নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কঙ্গ্রেসের মূল তত্ত্ব শিক্ষার সোপান স্বরূপ প্রথম পাঠ্য পুস্তকাবলী প্রথম ইংরাজীতেই প্রস্তুত করিবার জন্য কোনও যোগ্য ব্যক্তির উপর ভার দেওয়া হউক না; তাহা কঙ্গ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত হইলে, ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অনুদিত হইতে পারে। ইহা ভিন্ন প্রতি প্রদেশে, সেই প্রদেশের ভাষায় লিখিত ও চালিত কঙ্গ্রেসের নিজস্ব এক এক খানি সাপ্তাহিক, না হয়, অন্ততঃ মাসিক সংবাদ-পত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। এ পক্ষেও এতাবৎকালের মধ্যে কোন চেষ্টা হয় নাই। ইদানীং এদেশে অসংখ্য সংবাদ পত্রের প্রচার সত্ত্বেও জন সাধারণের শিক্ষোপযোগী, বিশেষতঃ কঙ্গ্রেস ও রাজনীতির মৌলিক তত্ত্ব শিক্ষোপযোগী সারবান এবং যুগপৎ উপদেশ ও আমোদ-প্রদ সংবাদ-পত্র একটীও নাই। কঙ্গ্রেস পক্ষ হইতে অত্যল্প মূল্যে ঐ রূপ সাময়িক পত্র সকলের সৃষ্টি হইয়া অল্প মূল্যে ও স্থল বিশেষে বিনা মূল্যে ভূরি পরিমাণ প্রচারিত হইলে, কঙ্গ্রেস বিষয়ক জ্ঞান ও কঙ্গ্রেসের স্থানীয় প্রতিপত্তি নিশ্চয়ই অতি বেগে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পুস্তক পুস্তিকা প্রথমতঃ বিনা মূল্যে বা অত্যল্প "মিশনরী" মূল্যে লক্ষ লক্ষ বিতরিত হওয়া বিধেয়।

এই সকল বিষয়ের যে ব্যয় তাহাই প্রকৃত পক্ষে কঙ্গ্রেসের যথার্থ ও ন্যায্য করণীয় কার্য্যের খাঁটী ব্যয়; পরন্তু, উহা উৎপন্নক্ষম, আয়জনক ও সর্ব্বোতোভাবে ইষ্টকর ব্যয়। এ ব্যয়ের দণ্ড ক্রান্তি মাত্রও ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইবার নহে। পুনশ্চ, এ ব্যয়ও যে একেবারে পাহাড় পর্ব্বত পরিমাণ ব্যয় তাহাও নয়। প্রথমতঃ প্রত্যেক প্রদেশের জন্য দশ হাজার টাকা, অন্ততঃ পাঁচ ছয় হাজার করিয়া টাকা বরাদ্দ করিয়া, পরীক্ষাস্বরূপ দেখাই হউক না ফল কিরূপ হয়।

কিন্তু হায়! সপ্তদশ কঙ্গ্রেসাধিবেশনে এ পক্ষে, কার্য্যতঃ কি হইল!! এই প্রবন্ধ লিখিয়া প্রেসে পাঠাইবার পর উক্ত অধিবেশনে কি ব্যাপার—কি বিষম বিসদৃশ ব্যবস্থা লোকে দেখিল এবং দেখিয়া বিবেকী মাত্রেই অসীম বিস্মিত ও নিরতিশয় নিরাশ হইল। কঙ্গ্রেসের দুই তিনটী মাত্র কর্ত্তাব্যক্তির ব্যক্তিগত উপরোধে ও জিদে, কঙ্গ্রেস বিষয়ে বিলাতবাসীর শিক্ষা বিস্তার ও "ইণ্ডিয়া" নামক বিলাতী ইংরেজী, সাপ্তাহিক পত্র প্রচারের একবৎসরের ব্যয়ার্থে প্রায় একলক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইল। কিন্তু, সে বিষয়ে এদেশে এ দেশীয় লোকের যৎসামান্য শিক্ষাদি উপলক্ষে একটী পয়সা ব্যয় করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইল না। সে কথাটাই একেবারে উঠিল না। এ ব্যাপারকে—এ ব্যবস্থাকে কি বলিবেন বলুন দেখি! বড়লোকের বড় কথায় আমাদের মত ক্ষুদ্র প্রাণীর কোন কথা কহা হয়ত বেআদবি বা বাতুলতা বলিয়াই গণ্য হইবে। কিন্তু, উহা কি যথার্থই আত্মঘাতী কার্য্য নয়? উহা দেখিয়া, উহা ভাবিয়া, আন্তরিক ভাবে কঙ্গ্রেসানুরাগী লোকের বুকের রক্ত শুকাইয়া যায় না

ও চিত্তে একটা অশ্রদ্ধার উদ্রেক হয় না? আর ঐ কথাটা কি সমগ্র কঙ্গ্রেসের বা কঙ্গ্রেসের প্রধান প্রধান প্রাদেশিক প্রতিনিধি ও কর্তৃত্ব স্থানীয় বিজ্ঞ ও বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি-বর্গের ইচ্ছার অভিমতে ও অনুমোদনে করা হইয়াছে? না তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে কয়েকটী মাত্র লোকের ব্যক্তিগত শক্তি ও সুবিধার সুযোগ লইয়া করা হইয়াছে? পরন্ত, অপরাপর আরও কয়েকটী অন্যায় ও অল্প সংখ্যকের আত্ম স্বার্থ-পোষক এবং বহুসংখ্যক বিশিষ্ট প্রতিনিধির প্রতিকূল প্রকৃত কার্য্যানুষ্ঠান পন্থার প্রতিকূল কার্য্যের ন্যায়, ঐ কার্য্যেও কি কঙ্গ্রেস মণ্ডলীর মধ্যে একটা মহা মনোমালিন্য, মনোবাদ ও বিচ্ছেদ সংঘটন ও পরিবর্দ্ধন করে নাই। এবারের কঙ্গ্রেসঅধিবেশনের কিছু পূর্ব্বে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের বিবাদের উল্লেখ করিয়া, এই প্রবন্ধের প্রথমাংশের আরম্ভেই আমরা যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম এবং যাহার জন্য সবিশেষ সতর্কতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থ পরি-হারের প্রস্তাব করিয়াছিলাম, ঠিক তাহাই ঘটিয়া কঙ্গ্রেস মণ্ডলীতে বিবাদ ও বিচ্ছেদের বীজ বপন করিয়াছে। ঐ কয় ছত্র লিখিবার সময়ে আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই যে আমাদের লিপি-অঙ্কিত মসি শুষ্ক হইতে না হইতেই, সপ্তাহ মধ্যে ঐরূপ সাংঘাতিক ঘটনা ঘটিবে। বস্তুতই এ দুর্ভাগ্য দেশের ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ভাবিলে, এবং দেশের আশা ভরসা স্থল বড়লোকদের মতি গতি ও কার্য্য রীতি চিন্তিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়।

যাহা হউক, ঐ সকল অত্যাবশ্যকীয় জীবন-মরণ অনুষ্ঠানের কিছুই না করিয়া, একমাত্র ইংরেজী ভাষা বুকে ও ইংরেজী "স্পিচ" মুখে করিয়া এবং কেবলমাত্র বিলাতি আন্দোলন বিলাতি রোদন বিলাতে বিলাতি লোকের "কাঙ্গ্রেসিক শিক্ষা" সাধন এবং বিলাতে সংবাদপত্র প্রচার করণ দ্বারা ভারত উদ্ধার হইবে অবধারিত ভাবিয়া, দেশের লোকের নিকট না ঘেঁসিয়া, তাহাদের শিক্ষার্থে কপর্দ্দক ব্যয় না করিয়া ও সংগৃহীত অর্থের প্রত্যেক পাই বিলাতের ব্যবহারার্থে বৎসর বৎসর বিলাতে পাঠাইয়া দিয়া ও বিলাতমাত্র সার বুঝিয়া, কঙ্গ্রেস ও কনফারেন্স যদি হিমাচলবৎ অনড়ভাবে হজরৎ মহম্মদের ন্যায়, পর্ব্বতাগমের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকেন, মহম্মদ নিজে পর্ব্বতের নিকটে না যান, তবে অন্ততঃ প্রথমতঃ পর্ব্বত নিজে পা চালাইয়া কখনই মহম্মদের মসজীদে আসিয়া কুর্ণিশ্ করিবে না; ইহা নিশ্চয়। কাযেই "যথা পূর্ব্ব তথা পর"। কঙ্গ্রেস কন-ফারেন্স লোক সাধারণের কাছে যেমন অজ্ঞাত ও অপরিচিত আছেন, তেমনি চিরকাল থাকিবেন, একান্তই যদি আরও কতক কাল মধ্যে আত্ম-ক্লান্ত হইয়া ভবলীলা বা ভারতলীলা সম্বরণ না করেন।

উপস্থিত সপ্তদশ অধিবেশন উপলক্ষে কংগ্রেসের অভিনব এক আনুষঙ্গিক অঙ্গ "শিল্প প্রদর্শনীর" অনুষ্ঠান হইয়াছে, ইহা অতীব উপযুক্ত। এবং কাংগ্রেসিক লোক-নাতের যথার্থই এক অতি বিশিষ্ট, পরিপক্ব ও সমীচিন অভি-ব্যক্তির পরিচায়ক। ইহাতে দূরদর্শন ও সূক্ষ্মদর্শন উভয়ই যুগপৎ বিদ্যমান আমরা দেখিতে পাইতেছি। এবং এরূপ রাজনীতিনিরপেক্ষ উচ্চস্তর ও সমাজের নিম্নস্তর আকর্ষক অনুষ্ঠান এতাবৎ কেন হয় নাই বলিয়া বিস্মিত এবং আদৌ হয় নাই বলিয়া দুঃখিত হইতেছি। এই শিল্প প্রদর্শনী কেবল "শিল্প প্রদর্শনী" বলিয়া আমরা ইহার এত পক্ষপাত প্রকাশ ও প্রশংসা ঘোষণা করিতেছি না। শিল্পপ্রদর্শনীর যতটা উপকার তাহা অপেক্ষা শতগুণে অধিক উপকারের গুরুভার ইহার আছে। "শিল্প প্রদর্শনীর ন্যায় 'কৃষিপ্রদর্শনী" কংগ্রেসের অঙ্গ ও প্রত্যেক কনফা-রেন্সের ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধানাধীন করিয়া দিলে, আরও অধিক উপকার হইবে। এতদ্দ্বারা দ্বিবিধ মহৎ উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে। শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনীর দ্বারা প্রথমতঃ দেশের মৃতপ্রায় ও উৎসাহ উদ্দীপনামাত্রবঞ্চিত শিল্প, অত্যাবশ্যকীয় বা জীবন ধারণের অনিবার্য্য ও নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুজাত উৎপাদক শিল্প ও অল্পাধিক জীবনীশক্তি উত্তেজনা লাভ করিয়াও য়ুরোপীয় উদ্ভাবনের অভিনব উপায় ও কার্য্যকৌশলাদি শিক্ষা করিয়া, পুনঃ সজীব ও জাগ্রত হইতে পারে, এবং কার্য্যকারিতায় অপেক্ষাকৃত একটু অধিক ক্ষিপ্রতাযুক্ত হইয়া যন্ত্রজাত দ্রব্যের সহিত, সম্যক না হউক, অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও প্রতিযোগিতা করিয়া, প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। পরন্ত চিরাবনত ও কার্য্য-বিধানের একই সঙ্কীর্ণ কারাগারে স্মরণাতীত কাল আবদ্ধ, দেশের জীবন ধারণের একমাত্র সম্বল কৃষি বল, অল্পাধিক উত্তেজনা উদ্দীপনা প্রাপ্ত হইয়া, কিছু না কিছু পুষ্ট হওয়া খুব সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ এই দুই

(এখন এক) অনুষ্ঠান কংগ্রেসের এই বিশেষ বিভাগে, বিদেশীয় ও স্বদেশীয় এমন সব কৃতী উচ্চপদস্থ, অত্যুজ্জ্বল প্রতিভাশালী বিশেষবিদব্যক্তিদিগকে—শ্রেষ্ঠতর শ্রেণীর য়ুরোপীয় ধনবান্ ও প্রভৃত বুদ্ধিমান শ্রেষ্ঠ ও প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগকে. আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের সৎপরামর্শ ও সহায়তা পাইয়া সবিশেষ উপকৃত হইতে পারে, যাঁহারা কংগ্রেস রাজনীতির প্রতিকূল বা কার্য্যগতিকে তাহার সহিত আত্ম-একত্ব স্থাপিত করিতে অপারগ। তৃতীয়তঃ ও সর্ব্বোপরি এই ও এবম্বিধ অনুষ্ঠান, কংগ্রেসের যাহা মজ্জাগত উদ্দেশ্য, মর্ম্মস্থলের প্রধান উত্তেজনা তাহার সাফল্য কল্পে সবিশেষ সহায় ও সমর্থক হওয়ার সম্ভাবনা। কেন না ইহাতেও বৎসরে একবার করিয়া, নিম্নতর ও অশিক্ষিত স্তরের লোক—কারিকর ও কৃষক শ্রেণীর লোক সকল কংগ্রেসের সংস্পর্শে, সংস্রবে ও সংসর্গে আসিয়া কংগ্রেসকে চিনিবে, কংগ্রেস মূলতঃ কি বস্তু, তাহা বুঝিবে, এবং ক্রমে কংগ্রেসের আশ্রয় পাইয়া ও কংগ্রেসের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া আপনাদের নিজের ও স্ব স্ব শ্রেণীর ও সম্প্রদায়স্থ লোকের উপকার করিতে পারিবে ও তাহাদিগকে একে একে আকৃষ্ট করিবে। কংগ্রেসও এইরূপে তাহাদিগকে চিনিবেন এবং তাহাদের প্রকৃত অভাব অভিযোগ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুঝিবেন, পরন্তু উভয়ের পরস্পরের অত্যুন্নত নিম্ন চিত্তের চিন্তা রাশির আদান প্রদানে উভয় পক্ষেই লাভবান হইবেন। এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে তখন, আমরা প্রকৃত কারিকর প্রতিনিধি ও যথার্থ কৃষক প্রতিনিধি, কংগ্রেস মণ্ডপে উপস্থিত দেখিলেও দেখিতে পারি।

প্রদর্শনীর জন্য বিশেষ বিভাগ সৃষ্ট ও বিশেষ কমিটি গঠিত হইয়া, তৎপরতার সহিত সম্বৎসর কাল ব্যাপিয়া কার্য্য হওয়া আবশ্যক।

আমরা উপরে একরূপ উল্লেখ করিয়াছি, কংগ্রেসের ২য় উদ্দেশ্য "স্বায়ত্তশাসনাধিকার" সাধনার পথে কংগ্রেস কি পরিমাণ কার্য্য করিয়াছেন, কি পরিমাণ সফলতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সফলতা ব্যবস্থাপক সভানিচয়ের পূর্ব্বসংহিতা সকলের সংস্কার, এবং ব্যবস্থাপক সভায় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক নির্ব্বাচিত সদস্যের আহ্বান; পরন্তু, গবর্ণমেন্ট-প্রস্তাবিত বিধিব্যবস্থাদির সম্বন্ধে আলোচনা করা ও অভিমত দেওয়ার অধিকার দেওয়ায়, সাধারণতঃ শাসন কার্য্য ও বজেটের আয় ব্যয় সম্বন্ধে প্রশ্নাধিকার। অপিচ কোনও নূতন বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন কল্পে বা পুরাতন আইনের সংস্কার কল্পে পাণ্ডুলেখ্য উপেক্ষত করার অধিকারও নির্ব্বাচিত সদস্যগণের আছে। গবর্ণমেন্টের স্বেচ্ছানুযায়ী কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া জয়ী হইবার সম্ভাবনা ইহাদের কোনও কালে নাই, সরকার পক্ষকে ভোটসংখ্যায় অন্ততঃ সংখ্যা দ্বারাও অতিক্রম করিবার অবসরও ইহাদের খুব কম ঘটে, প্রায়ই ঘটে না। তথায় বিধিব্যবস্থার কোন ধারা উপধারা "রদ" করিবার বা "বহাল" রাখিবার ক্ষমতাও ইহাদের অতিনির্দ্দিষ্ট শক্তির অতীত, পরন্তু তাহার সংস্কার সংশোধন কল্পে ইহাদের কৃত প্রস্তাব ও প্রার্থনাও খুব কমই রক্ষিত হয় বা হয়ই না, তথাচ ইহাদের স্বাধীন বাদ প্রতিবাদ আলোচনা অভিমতাদি কৌন্সিল গৃহের বায়ু অনেকটা স্বাস্থ্যকর ও সংস্কৃত রাখে এবং সময়ে সময়ে ইহাদের প্রস্তাবে প্রতিবাদে, বা সমর্থন সমন্বয়ে, আইন কানুনের এক আধ কণার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন হইয়া, যাহা হউক কিছু না কিছু উপকার হয় ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে।

এই অধিকারের সূত্রপাত লর্ড ডাফ্রিন করেন, মৃত মহাত্মা মিঃ ব্রাডলর সবিশেষ সহায়তায় ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। যে দিক দিয়াই যাহা হউক উহা, যে কংগ্রেসেরই কার্য্যকারিতার ফল তাহাতে সন্দেহ নাই। সদস্য ও সভাপতি নির্ব্বাচনক্ষম মফস্বল মুনিসিপালিটী ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড কংগ্রেসের সহগামী বা কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যবস্থা। স্বায়ত্ত শাসনাধিকার লর্ড রিপন ও লর্ড ডাফারিনের সময়েই যাহা কিঞ্চিত উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার পর হইতে উহার উন্নতি মাত্র নাই, অবনতিই হইয়া চলিয়াছে।

এখন আমরা জন সাধারণ, ইহা অবশ্য স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি এবং মুক্ত কণ্ঠে বলিতে বাধ্য যে, উহার অধিকাংশ কার্য্য এখনও অকৃত অসম্পাদিত ও অবান্ধ থাকিলেও কংগ্রেস তাহার দুই বিশাল উদ্দেশ্যের অন্ততঃ অণুপরমাণু, অন্ততঃ ক্রান্তি দন্তিও "আদায় দিয়াছেন"। যাহা দিয়াছেন এবং কংগ্রেস যাহা করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতি, পরিমাণ এবং মূল্য ও কংগ্রেসের অত্যল্প জীবন কাল ও নানা প্রতিকূল অবস্থার তুলনায়, উপেক্ষণীয়ও নহে, অল্পও নহে। প্রত্যুত তাহা,—এপতিত নিদ্রিত জাতির পুনঃ জাগরণের

ও পুনরুত্থানের যদি এখনও কিছু আশা থাকে, তাহা নিশ্চয়ই আশাপ্রদ। কংগ্রেস যে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, যে বিরাট ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার তুলনায় ষোল বৎসর কাল কিছুই নয়, অপার মহাসাগরে জল বুদ্বুদ মাত্র। পরন্তু, ঐ স্বল্প কালে যতটুকুই হউক সে মহৎ কার্য্য সমাধা হইয়াছে। তাহার তুলনায় যে ব্যয় হইয়াছে, তাহা অতি তুচ্ছ যৎসামান্য মাত্র। আজ যে ঐ বাডন উদ্যানে বোম্বাই, মান্দ্রাজ, মধ্যদেশ, উত্তর পশ্চিম, অযোধ্যা, পাঞ্চাল, মহারাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র, বিহার, উৎকল এবং বঙ্গদেশ—আর্য্যাবর্ত্ত দক্ষিণাপথের, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় ভ্রাতৃগণ একত্রিত হইয়া আলিঙ্গন ও হস্ত মর্দ্দন করিতেছেন, উহার জন্য—কেবল উহার জন্য লক্ষ স্বর্ণ ব্যয়িত হইলেও সে অতি সামান্য,—কারণ এই সংঘটন, এই সংমিলন শত শত লক্ষ স্বর্ণ প্রসূ।

সমাপ্ত

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

ভূমণ্ডলের ভবিষ্যৎ।

(জ্যোতির্ব্বিদের দিবাস্বপ্ন।)

ক্যামিলে ফ্ল্যামেরিয়ন ফরাসিরাজ্যের অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিৎ এবং বৈজ্ঞানিক। তিনি জন্মিয়াছেন ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে, ১৮৫৮ অব্দে জ্যোতির্ব্বিদ্যায় যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, ক্রমে তাহা বাড়িয়া বাড়িয়া এখন চরমে উঠিয়াছে। গ্রন্থ তাঁহার অনেক। সকল গ্রন্থই জ্যোতির্ব্বিদ্যায় পরিপূর্ণ; তাঁহার গ্রন্থের আদরও সর্ব্বত্র। এই অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিৎ মহাশয়ও কিন্তু মধ্যে মধ্যে জ্যোতির্ব্বিদ্যায় বিভোর হইয়া স্বপ্ন দেখেন। পণ্ডিতের স্বপ্ন পাণ্ডিত্যপূর্ণ, বৈজ্ঞানিকের স্বপ্নে বিজ্ঞানের লীলা খেলা; স্বপ্নে সামঞ্জস্য আছে, বৈজ্ঞানিক কার্য্যকারণসম্বন্ধ ঠিক আছে, ব্যাপ্তি অব্যাপ্তির ভেদ আছে; বিজ্ঞানে যাহা ঘটিতে পারে, তাহাই আছে; যাহা না ঘটিতে পারে, তাহা নাই। বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানময় স্বপ্নও সুতরাং অগ্রাহ্য নহে। আর আমাদের মত অবোধের পক্ষেত পণ্ডিতের প্রলাপও বেদ-বাক্য। অতএব, ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ্যাসাগর ফ্ল্যামেরিয়নের ভবিষ্যদ্বাণী পাঠককে শোনাইতে বসিয়াছি। ১৮৯৩ সালের—জুলাই মাসে—"কসমোপলিটান" নামক প্রসিদ্ধ সাময়িকে তিনি "আমাদের কি হইবে?" নামে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, অদ্য তাহারই আভাস দিতেছি।

যাঁহারা মূল পড়িয়াছেন, এ আভাস তাঁহাদের জন্য নহে। যাঁহারা না পড়িয়া পণ্ডিত, যাঁহারা নাড়ী না ধরিয়া বড়ী না মাড়িয়া চিকিৎসক, যাঁহারা স্বভাবতই সর্ব্বজ্ঞ, যাঁহারা না লিখিয়া লেখক, যাঁহারা সমাজের সব্‌জান্তা সমালোচক, আমাদের এ আভাস তাঁহাদের জন্যও নহে। আমাদের আভাস আমাদের জন্য—যাঁহারা আমাদের মত তাঁহাদের জন্য যাঁহারা জানিয়াও জানিতে কুণ্ঠিত নহেন, যাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিতে কাতর নহেন সেই সকল মহাশয় পাঠকের জন্যই আমাদের প্রবন্ধ, আভাসে আযাস তাঁহাদিগের জন্য।

মানবের ভবিষ্যৎ।

জ্যোতির্ব্বিৎ ফ্ল্যামেরীয়ন বিনা গণনায় কোন তথ্যে উপনীত হন নাই। ১৮৯৩ সালের জুলাই মাসে প্রবন্ধ লিখিবার সময়ে জ্যোতির্ব্বিৎ মহাশয় পৃথিবীর লোক-বৃদ্ধি সম্বন্ধে যে অনুপাত দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেই অনুপাতে নির্ভর করিয়াই ভবিষ্যৎ লোকবৃদ্ধিরও নির্ণয় করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইতেছেন, যখন ত্রিংশ শতাব্দী চলিতে আরম্ভ করিবে, তখন এই পৃথিবীতে মানবের সংখ্যা দ্বিগুণ হইবে। ফ্ল্যামেরিয়ন বলিতেছেন, "৩০০০ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর ২০১ কোটি লোকই ইংরেজিনবীশ হইবে। উহারা সকলেই ইংরেজি ভাষায় লিখিবে পড়িবে কথা কহিবে। কিন্তু তখনকার ইংরেজি ভাষায় গ্রীকমূলে উৎপন্ন শব্দেরই আধিক্য ও বাহুল্য হইবে" পৃথিবীর লোকসংখ্যা এখন ১৫০ কোটী, দ্বৈগুণ্যে সেই হারে ৩০০০ খৃষ্টাব্দে ৩০০ কোটীর কম হইবে না। ইহার ২০০ কোটী ইংরাজিনবীশ হইবে। ইহাই ফ্ল্যামেরিয়নের সিদ্ধান্ত।

শান্তির সাম্রাজ্য।

বিজ্ঞানমত্ত জ্যোতির্ব্বিশারদ জ্ঞানমুগ্ধ ফ্ল্যামেরিয়ন যুদ্ধ বিগ্রহাদি আসুরিক রাক্ষসিক ব্যাপারের বড় বিরোধী। জ্ঞানী

বৈজ্ঞানিক দার্শনিক প্রভৃতি সকল মহাপুরুষই যুদ্ধ বিগ্রহের ঘোর বৈদ্বেষী। বিলাতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার বুর-যুদ্ধের বিষম বিদ্বেষী। জ্যোতির্ব্বিদাভরণ লকীয়ারও দার্শনিক স্পেন্‌সারের সহযোগা। ফ্ল্যামেরিয়ন হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে বলিতেছেন :—

"অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হইবে না ; খৃষ্টীয় পঞ্চবিংশ শতাব্দী অতীত হইতে না হইতেই পৃথিবী হইতে যুদ্ধ বিগ্রহ তিরোহিত হইয়া যাইবে। অশান্তির পরাজয়ে শান্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

কিন্তু অশান্তির পরাজয় এবং শান্তির জয় কিরূপে হইবে? কোন্ জাতির বা কোন্ সম্প্রদায়ের চেষ্টায় এ অসাধ্য সিদ্ধ হইবে? কোন্ কৃপাময় বা কৃপাময়ী এই পৃথিবীতে করুণার স্রোত প্রবাহিত করিবেন? দেব না দেবীর মাহাত্ম্যে এই মহাব্রতের প্রতিষ্ঠা হইবে?

দেবীর মাহাত্ম্যে।

মুশোফ্ল্যামেরীয়ন বলিতেছেন, রমণীরাই পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন। কার্য্যপ্রণালীরও তিনি আভাস দিয়াছেন। জ্যোতির্ব্বিৎ মহাশয় বলিয়াছেন ;—

"যুদ্ধ-বিগ্রহাদি-জনিত ধ্বংস কার্য্য এখন ক্রমাগত চলিবে। এ আসুরিক পৈশাচিক ব্যাপার কিছুদিন বরং অধিকতর প্রবল হইবে। সংখ্যাতত্ত্ব বিশারদেরা দেখিবেন, প্রতি শতাব্দীতে ৪ কোটি লোক যুদ্ধে মরিতেছে। হিসাব করিয়া দেখিবেন, প্রত্যহ ১১০০ লোক অবিরত যুদ্ধে প্রাণ দিতেছে। চতুর্ব্বিংশ শতাব্দীর মধ্যসময় পর্য্যন্ত অর্থাৎ ২৩৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ভাবে চলিবে। ২৩৫০ খৃষ্টাব্দে পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইবে। চারিদিকেই সর্ব্বনাশ হইতেছে, যা পুত্র পৌত্রাদি অকালে অপঘাতে মরিতেছে, দেখিয়া, ইউরোপের যত জননীই একপ্রাণ হইয়া এক সভা করিবেন, একটি দল বাঁধিবেন। সকলেই স্বীয় পুত্র কন্যাদিগকে যুদ্ধবিরাগে শিক্ষিত এবং দীক্ষিত করিবেন। যুদ্ধের ভীষণতা নিষ্ঠুরতা মহাপাপতা প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিয়া,সকল জননীই স্বীয় পুত্র কন্যাদিগকে— প্রধানতঃ স্বীয় কন্যাদিগকে—যুদ্ধ বিগ্রহের ঘোর বিরোধিনী করিয়া তুলিবেন। শিক্ষার গুণে, এক পুরুষ যাইতে না যাইতে ইউরোপের যত যুবতী যুদ্ধের সহিত যুদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকরা হইবেন। যুদ্ধের আসুরিকতা এবং পৈশাচিকতা দেখিয়া সকল যুবতীই ভয়বিহ্বলা হইবেন। আপনারা ভয়বিহ্বলা হইয়া আর সকলকে ক্রমশঃ ভয়বিহ্বল করিতে থাকিবেন। এই বর্ব্বরতার তিরোভাব করিবার জন্য সকলেই কৃতসঙ্কল্প হইবেন। যতদিন সকল দেশের গবর্ণমেন্ট যুদ্ধে বিরত না হইবেন, সৈন্যভঙ্গ এবং রণপোত ধ্বংস না করিবেন, তত দিন ইউরোপের রমণীরা কিছুতেই ক্ষান্ত হইবেন না। রাজপুরুষ ও রাজমন্ত্রীরা—মহাসভার সভ্যেরা—কোন রাজ্যেই যুদ্ধত্যাগে সম্মত হইতেছেন না, দেখিয়া ইউরোপের যত যুবতীই প্রতিজ্ঞা করিবেন "যে পুরুষ অস্ত্র স্পর্শ করিবে, তাহাকে বিবাহ করিব না।"

থুবড়ো সৈনিক।

ইউরোপের যত যুবতীই প্রতিজ্ঞা করিবেন, সৈনিককে বিবাহ করিব না। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সকলেই দল বাঁধিবেন। দল ক্রমেই প্রবল হইবে। প্রতিজ্ঞাপালন উপলক্ষে প্রথমে অনেক যুবতীকে কষ্ট পাইতে হইবে ; সুরূপ সগুণ সৈনিক সেনানীকে ভাল বাসিয়াও অনেক যুবতী বিবাহে বঞ্চিত হইবেন ; কেহ কেহ প্রেমের টানে পড়িয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গও করিবেন। কিন্তু সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে—সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে—ক্রমে সকল যুবতীকেই প্রতিজ্ঞা পালনে কৃতসংকল্প থাকিতে হইবে। মনের টান, প্রাণের আকর্ষণ —অগ্রাহ্য করিয়া, সহস্র ক্লেশেও প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইবে। সৈনিক পুরুষদিগের কিন্তু ক্লেশের অবধি থাকিবে না। সংসার তাঁহাদিগের পক্ষে অন্ধকারময় হইয়া উঠিবে। জীবন তাঁহাদিগের বিড়ম্বনাময় হইবে। ক্রমে সৈনিক পুরুষদিগের ভিতরও যুদ্ধবিরাগও প্রবল হইয়া উঠিবে ; ক্রমে সার্ব্বজনিক যুদ্ধ বিদ্বেষই সর্ব্বত্র বিরাজ করিতে থাকিবে।

অবিবাহে পঞ্চবর্ষ।

রমণীদিগের প্রতিজ্ঞার পর প্রথম পাঁচ বৎসর বিবাহ বিভ্রাট ঘটিবে। সৈনিক-বিবাহ সংসার হইতে উঠিয়া যাইবে। সৈনিক-বিবাহের ব্যতিক্রমে এক প্রকার বিবাহেরই ব্যতিক্রম ঘটিবে। কেন না, ফ্রান্স, জর্ম্মনী, ইটালি, স্পেন প্রভৃতি সকল দেশের সকল পুরুষ পল্টনে নাম লেখাইতে বাধ্য। প্রয়োজনের সময়ে সকলেই যুদ্ধ করিতে বাধ্য। অর্থাৎ সকল সমর্থ পুরুষই সৈনিক পুরুষ। সৈনিক পুরু-

ষের বিবাহে ব্যতিক্রম ঘটিলেই, সকল পুরুষেরই বিবাহে ব্যতিক্রম ঘটিবে। সুতরাং ইউরোপের সর্ব্বত্রই বিবাহ-বিভ্রাট ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে। কিছু দিন রেষারেষি চলিবে; পুরুষেরা প্রথম প্রথম কিছুতেই অস্ত্রত্যাগে বা যুদ্ধত্যাগে সম্মত হইতে চাহিবে না। কিন্তু রমণীরাও আপনাদের অটল নির্ব্বন্ধ আরও অটল করিয়া রাখিবেন। অগত্যা শেষে পুরুষদিগকেই গড়াইয়া পড়িতে হইবে। প্রেমের ফাঁশে—পরিণয়ের আশে—সকল পুরুষকেই রমণীদিগের পদানত হইতে হইবে; সকলকেই যুদ্ধে বিরত হইতে হইবে। সুতরাং সকল রাজ্যেই যুদ্ধবিদ্বেষী পুরুষের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া উঠিবে। যুদ্ধবিরাগী পুরুষদিগেরও দল হইবে, সমিতি সভা হইবে। দল ক্রমে প্রবল হইবে, সমিতি সভাও ক্রমে বলবতী হইয়া উঠিবে। চারিদিকেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে বক্তৃতা চলিবে। ইউরোপের সব সংবাদপত্রেই যুদ্ধের প্রতিকূলতা হইবে। সর্ব্বত্র সকল পার্লেমেণ্টেই ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহের প্রতিবাদ চলিতে থাকিবে। সর্ব্বত্রই মহাসভার সভাদিগকে যুদ্ধদ্বেষী হইয়া উঠিতে হইবে। পাঁচ বৎসরেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে; যুবতীদিগকে পাঁচ বৎসরের অধিক কাল প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য কষ্ট পাইতে হইবে না। ২৩৫৫ খৃষ্টাব্দেই ইউরোপ হইতে যুদ্ধ বিগ্রহ উঠিয়া যাইবে। আর, ইউরোপে উঠিলেই সর্ব্বত্র উঠিবে।

আমেরিকায়।

ফ্ল্যামেরীয়ন ১৮৯৭ অব্দে বলিয়াছিলেন;—

"মার্কিণ রাজ্যে অনেক পূর্ব্বেই যুদ্ধ লোপ হইয়া যাইবে; ২৩৫৩ অব্দের অনেক পূর্ব্বেই মার্কিণ রাজ্য যুদ্ধ বিগ্রহ একেবারেই ভুলিয়া যাইবে। ২৩৫০ অব্দে যখন ইউরোপের রমণীরা সৈনিক-বিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকিবেন, সে সময়ে তাঁহারা পুরুষদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিতে পারিবেন,—

'আমরা সকলেই ইউরোপ ছাড়িয়া আমেরিকায় যাইব। সেখানে সৈনিক নাই, সেনানী নাই; আমরা মার্কিণ পুরুষদিগের পাণিগ্রহণ করিব।'

কাজেই ইউরোপীয় পুরুষদিগকে, থুবড়ো থাকিবার ভয়ে, একান্তই নারীহীন হইয়া থাকিবার আশঙ্কায়; অন্ধকার দেখিতে হইবে; অগত্যা যুদ্ধ বিগ্রহের বিরোধী হইতে হইবে।"

ফ্ল্যামেরীয়ন ১৮৯৭ সালে যখন ঐ কথা কহিয়াছিলেন, তখন মার্কিণজাতি শান্তিরই একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তখন স্পেনের সহিত মার্কিণের যুদ্ধ হয় নাই, তখন স্পেনের রাজ্য মার্কিণ কাড়িয়া লন নাই; তখন মার্কিণের রাজ্যবৃদ্ধি-লালসা বলবতী হয় নাই; তখন মার্কিণ পোত পল্টন বাড়াইবার জন্য ব্যস্ত হন নাই। প্রবন্ধের দ্বিতীয় সংস্করণে বোধ হয় ফ্ল্যামেরীয়নকে মতান্তর করিতে হইবে। হয়ত মার্কিণ রাজ্যকেও ইউরোপের সহিত মিশাইয়া মার্কিণ যুবতী-দিগকেও সৈনিক-বিবাহে বিরত রাখিতে হইবে।

মার্কিণের ভাবান্তর।

কিন্তু অনেক সময়েই মনে হয়, মার্কিণের এই উপস্থিত যুদ্ধানুরাগ—এই রাজ্যবৃদ্ধিলালসা—শীঘ্রই মিটিয়া যাইবে; শান্তিসেবক মার্কিণ আবার শীঘ্রই শান্তিসেবক হইবেন। সুতরাং ২৩৫০ অব্দের অনেক পূর্ব্বেই মার্কিণ রাজ্য, শান্তির একান্ত সেবক হইয়া, যুদ্ধ বিগ্রহাদির শত্রু হইয়া থাকিবেন। তাহা হইলে ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদের ভবিষ্যদ্বাণীও সফল হইবে; ২৩৫০ অব্দের ইউরোপীয় যুবতীরা অনায়াসেই মার্কিণ রাজ্যে যাইবার কথা, কহিতে পারিবেন। আর যুবতীদিগের মার্কিণযাত্রার সঙ্কল্প দেখিয়া, ইউরোপীয় পুরুষ-দিগকেও ভয়বিহ্বল হইয়া যুদ্ধবিরাগী হইতে হইবে। তাহা হইলেই সকল দিক বজায় থাকিবে। আর, ইউরোপ আমেরিকায় যুদ্ধবিরাগ প্রবল হইলেই, সমগ্র ভূমণ্ডলই শান্তিময় হইবে। ইউরোপের জন্যই এশিয়ায় যুদ্ধ; ইউরোপের চৈতন্য হইলেই সর্ব্বত্র মঙ্গলের আধিপত্য হইবে।

ইউরোপের সর্ব্বত্র।

পাঁচ বৎসর প্রতিজ্ঞা অটল রাখিয়া, ইউরোপীয় মহিলারা যখন পুরুষদিগকে পরাস্ত করিবেন; যখন জর্ম্মণী, ইতালি, অষ্ট্রিয়া, স্পেন প্রভৃতির পুরুষেরা স্ব স্ব মহাসভায় যুদ্ধ-বিরাগের বক্তৃতা করিতে থাকিবেন; যখন সকল সভা—সকল গভর্ণমেণ্ট—সকল মন্ত্রী যুদ্ধদ্বেষে উত্তেজিত হইয়া উঠিবেন; তখন এক সপ্তাহের মধ্যেই ইউরোপের সর্ব্বত্র সৈন্যভঙ্গ এবং রণপোতভঙ্গ হইয়া যাইবে। সৈনিক সেনানীরাও সর্ব্বত্র তরোয়াল বন্দুক কামান ম্যাক্সিম ছাড়িয়া শান্তিপথের পথিক হইবেন। তরোয়াল সঙ্গীনের ইস্পাত শিল্পযন্ত্রে পরিণত হইবে, কামান রণপোতের লৌহ কৃষিযন্ত্রে

পরিণত হইবে। ২০৫৬ অব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ সার্ব্বদেশিক শান্তিসপ্তাহ বলিয়া পরগণিত হইবে। ২০৫৬ অব্দের ১লা জানুয়ারি যেরূপ নববর্ষোৎসব হইবে, তেমন উৎসব পৃথিবীতে কোন কালে হয় নাই।

বিবাহের ধূম।

২০৫৬ অব্দের ঐ জানুয়ারি মাস ইউরোপের সর্ব্বত্রই সুখের মাস বলিয়া পরিগণিত এবং অভিহিত হইবে। সুখের মাস হইবে শান্তির মাস, আর প্রণয় ও পরিণয়ের জন্য হইবে মকরধ্বজের মাস। পাঁচ বৎসর বিনা বিবাহে—বিনা রমণী-সঙ্গে—থাকিতে বাধ্য হইয়া, পুরুষেরা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিবেন। সুতরাং শান্তির প্রথম সপ্তাহেই চারি দিকে বিবাহ-সম্বন্ধের ধূম লাগিয়া যাইবে। ২০৫৬ অব্দের জানুয়ারি মাসে ইউরোপ বিবাহোৎসবে উন্মত্ত হইয়া উঠিবে। গির্জ্জায় স্থান হইবে না; এক এক গির্জ্জায় এক এক দিনে শতাধিক পাণিগ্রহণের ব্যবস্থা হইবে। নানাস্থানে বিবাহের জন্য স্বতন্ত্র গির্জ্জা বসাইতে হইবে। যত সভাগৃহই গির্জ্জার কার্য্য সম্পন্ন হইবে। ইউরোপের বিবাহকার্য্য দিবালোকে সম্পন্ন হয়। সুতরাং যত থিয়েটারেও বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইবে—যত রঙ্গালয়ও গির্জ্জার আসনে বসিবে। কিন্তু তথাপি কুলাইবে না। মাঠে ঘাটে তাঁবু পড়িবে; তাঁবুতেই গির্জ্জার কাজ হইবে। একটিন্ পাদরির সংখ্যা দিন কতক খুবই বাড়িয়া উঠিবে। বৈবাহিক পরিচ্ছদের দর একবারেই চড়িয়া উঠিবে। বৈবাহিক নাচভোজে ইউরোপ জমজম করিতে থাকিবে। খাদ্যপোয়াদির মূল্যবৃদ্ধি হইবে। ফলতঃ ২০৫৬ অব্দের জানুয়ারি মাসটা ইউরোপের পক্ষে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

বিলাত ও রুষিয়া।

বিলাত এবং রুষিয়া প্রথমে দল হইতে দূরে থাকিবে। বিলাতের কোন পুরুষকে পল্টনের কার্য্যে বাধ্য হইতে হয় না। বিলাতে অসৈনিক পুরুষ অনেক। আর বিলাতের রমণীরাও প্রথম প্রথম ইউরোপীয় রমণীদিগের সহিত মিশিবেন না। বিলাত যে দিকে, রুষিয়াও সেই দিকে। বিলাতের যে নীতি, রুষিয়ারও সেই নীতি। কিন্তু ইউরোপের আর সকল রাজ্যই যখন, একসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, একটা বিরাট বিশাল সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইবে, যখন সেই বিরাট সাধারণতন্ত্রের সকল নর নারীই যুদ্ধে বিরত হইবেন, তখন বিলাত ও রুষের নর নারীদিগকেও অগত্যা যুদ্ধদ্বেষে আক্রান্ত হইতে হইবে। তখন বিলাত ও রুষিয়াকেও দলে মিশিতে হইবে। মার্কিণ সাধারণতন্ত্রের আহ্বানে অনুরোধে তখন ইউরোপের সেই নব বিরাট সাধারণতন্ত্র, মার্কিণ সাধারণতন্ত্রের সহিত যোগ দিয়া, শান্তির পতাকা উড়াইয়া দিবেন। তখন বিলাত এবং রুষিয়া আর উদাসীন থাকিতে পারিবেন না। ইঁহাদিগকেও ক্রমে শান্তির পতাকা উড়াইতে হইবে। জগতের সর্ব্বত্রই তখন শান্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সুখ সর্ব্বত্র।

শান্তির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলেই, সকল রাজ্যের খরচপত্র কমিয়া যাইবে। যুদ্ধের জন্যই ত খরচ! রাজ্যের অধিকাংশ রাজস্বই ত এখন পোত পল্টনেই খাইয়া ফেলে। সৈনিক সেনানী অস্ত্র শস্ত্র রণপোত টর্পেডোর জন্যই যে, রাজ্যের অধিকাংশ রাজস্ব খরচ হইয়া যাইতেছে, তাহা সকলেই দেখিতেছেন। ইউরোপ এখন এক মহাশিবির। সমগ্র ইউরোপের সৈন্য সামন্ত একত্র করিলে, কুরুক্ষেত্রের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীকেও লজ্জা পাইতে হয়। এক রুষের সম্রাটই যখনতখন ৫০,৬০ লক্ষ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইতে পারেন। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ লক্ষ ফরাসী জর্ম্মণও অনায়াসে সাজাইতে পারেন। ২০,২৫ লক্ষ ইতালি অস্ট্রিয়ারও আছে। ইংলণ্ডেরও ৬ লক্ষের কম নহে। আবশ্যক হইলে, রুষ, ফরাসী ও জর্ম্মণ সৈন্যসংখ্যা যত ইচ্ছা বাড়াইতে পারেন; এক রুষই এককোটীর যোগাড় করিতে পারেন। ৫০।৬০ লক্ষের জন্য জর্ম্মণ ফরাসীকেও ভাবিতে হয় না। রণপোতও কম নাই! ইংলণ্ডের অধিক দেখিয়া রুষ, জর্ম্মণ, ফরাসী, সকলেই রণপোতের ক্রমাগত আধিক্য করিয়া আসিতেছেন। পোত পল্টনে ইংরেজ প্রতি বৎসর ৬০।৭০ কোটী টাকা ফেলিয়া দিতেও কাতর নহেন। ৩০।৪০ কোটির জন্য কেহইত কাতর নহেন। রুষ যেখানে যাহা পাইতেছেন, সমস্তই পল্টনে ফেলিতেছেন। পোত পল্টনের জন্যই খরচপত্র ভয়ঙ্কর বাড়িয়াছে বলিয়া, ইউরোপের সকল প্রবল নরপতিকে প্রজাপেষণে বাধ্য হইতে হইয়াছে। প্রজার করভার বাড়িলেই পীড়ন বাড়িয়া থাকে; করভার সর্ব্বত্র বাড়িয়াছে। ২০৫৬ অব্দে যুদ্ধ বিগ্রহ উঠিয়া

যাইবে, যুদ্ধের পোত পল্টন উড়িয়া যাইবে, রাজ্যের ব্যয় কমিয়া যাইবে; করভারও সুতরাং কমিয়া যাইবে। রণপোত সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র দুর্গ কেল্লা প্রভৃতি উঠিয়া গেলেই, রাজ্যের খরচ একেবারেই কমিয়া যাইবে; প্রজাদের করভারও একেবারেই হাল্কা হইয়া পড়িবে। প্রজারা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবে। সকল রাজ্যেই উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইবে। শিল্প বাণিজ্যাদি চরমে উঠিবে। প্রকৃত সভ্যতা-বিস্তারের তখনই আরম্ভ হইবে। ২৩৫৬ খৃষ্টাব্দের পরেই পৃথিবীতে সুখ শান্তির প্রকৃত সূত্রপাত হইবে।

আর কি হইবে ?

ফ্ল্যামেরীয়ন নিজেই বলিতেছেন; "পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এক মাপ, এক ওজন প্রচলিত হইবে; একরূপ মুদ্রাই সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে। সময়-নির্দ্ধারণে ও মানচিত্রাঙ্কণে এক দ্রাঘিমা—গ্রীণউইচের মধ্যন্দিনদ্রাঘিমা—সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইবে। ক্রমেই কিন্তু পৃথিবীতে নানারূপ পরিবর্ত্তন হইতে থাকিবে। অষ্টাবিংশ শতাব্দীতে অর্থাৎ ২৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই, ফ্রান্সের লোপ হইবে। ২৯০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই ইতালির লোপ হইবে। ৩২০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জর্ম্মণীর তিরোভাব হইবে। তখন ইংরেজকেও ভূমি ছাড়িয়া সাগর মহাসাগরে রাজ্যবিস্তার করিতে হইবে;—জাহাজী রাজ্যেই ইংরেজকে রাজত্ব করিতে হইবে। ফরাসীর জ্যোতির্ব্বিৎকেও মানিতে হইয়াছে, পোতবলে এখনও বহুকাল—৩২০০ খৃষ্টাব্দের পরেও—ইংরেজ একাধিপত্য করিবেন।

আরও কি হইবে ?

হইবে কত কি! বসবাসাদির জন্য পৃথিবীর বন জঙ্গল সমস্তই উড়িয়া যাইবে; ভূমণ্ডলকে একেবারেই বনশূন্য হইতে হইবে। আর্ত্তববিজ্ঞানের চূড়ান্তরূপ উন্নতি হইবে। আকাশ মেঘাদির অবস্থা তখন বৈজ্ঞানিকদিগের কল্যাণে লোকে পূর্ব্বাহ্ণেই নিশ্চিত অভ্রান্তরূপে জানিতে পারিবে। তখন খপোতেরই প্রাধান্য হইবে; মানুষ নানাবিধ ব্যোমযানে চড়িয়া আকাশের চারিদিকে ইচ্ছামত বিচরণ করিবেন। ব্যবসায় বাণিজ্য ব্যোমযানে চলিবে। কুত্রাপি আর সমুদ্র-তীরে বা নদীতটে কষ্টম-হাউস দেখিতে পাওয়া যাইবে না; জাহাজী মালের উপর মাশুল লইবার জন্য তখন আর কোন কষ্টম-হাউসেই কাহাকে ব্যস্ত থাকিতে দেখা যাইবে না। বাষ্পের ব্যবহার রহিত হইয়া যাইবে। সকল কল বলই তাড়িতে চলিবে। বিজ্ঞানের ক্রমাগতই উন্নতি হইবে, জ্যোতির্ব্বিদ্যারও চূড়ান্ত হইবে।

তার পর ?

উন্নতি যে, কত দিকে কতরূপ হইবে, তাহা এখন ভাবিয়া পাওয়া যায় না! অর্থ খুবই সচ্ছল হইবে; শতকরা আট আনা বার্ষিক সুদে টাকা ধার দিবার জন্য ধনপতিরা লালায়িত হইবেন। জ্যোতির্ব্বিৎ ফ্ল্যামেরীয়ণকে এখন নিশ্চিতই উত্তমর্ণদিগের জ্বালায় জ্বালাতন হইতে হইতেছে; টাকা ধার তাঁহাকে নিশ্চিত প্রায়ই করিতে হয়; সুদের দায়ে তাঁহাকে বড়ই বিব্রত হইতে হয়! তাই তখন সুদ শতকরা ॥০ আনা হইবে, দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিৎ মহাশয় বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু হায়! যখন এই সুখের স্রোত প্রবাহিত হইবে, তখন ত জ্যোতির্ব্বিৎ ফ্ল্যামেরীয়ণ এ ভূমণ্ডলে থাকিবেন না; অন্ততঃ এখনকার আকারে ত তখন কিছুতেই থাকিতে পাইবেন না!

পান ভোজনের কি হইবে ?

২৩৫৬ অব্দের পর খাদ্যের জন্য আর এখনকার মত জীবহত্যা হইবে না। জল বায়ু এবং উদ্ভিজ্জ হইতেই রসায়নবিৎ ব্যবসায়ীরা নানাবিধ খাদ্য পেয় প্রস্তুত করিবেন। উদরপূর্ত্তির জন্য কাহাকে কষ্ট পাইতে হইবে না। নানাবিধ অমৃতসমান পানীয়, নানাবিধ অমৃত-ফল, নানাবিধ দেবভোগ্য পিষ্টক এবং দেবদুর্লভ মোদক, রসায়নাগারে প্রস্তুত হইয়া, লোকের তৃপ্তি এবং উদরপূর্ত্তি করিবে।

আবার ?

আবার কৃষিকার্য্যও কেবল তাড়িতসাহায্যে সম্পন্ন হইবে। শস্যাদি তাড়িতেই উৎপন্ন হইবে। সমুদ্রজল হইতে হাইড্রোজেন প্রস্তুত হইবে। নায়াগ্রাপ্রভৃতি যত জলপ্রপাতে এবং যত নদীস্রোতে তাড়িত উৎপন্ন হইবে। সেই তাড়িতেই আলোকসংস্থান হইবে। তাড়িতস্রোত একস্থান হইতে—বহুদূরে বহুস্থানে—নীত হইবে। সুতরাং আলোকও বহুদূরে বিস্তৃত হইবে। সূর্য্যকিরণ গ্রীষ্মকালে কলে পড়িয়া ধৃত ও সঞ্চিত হইয়া থাকিবে, শীতকালে বিতরিত হইবে। রৌদ্রেরও সুতরাং তখন বাণিজ্য চলিবে। পৃথিবীপৃষ্ঠে গভীর নলকূপ প্রোথিত হইবে। পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ তাপ সেই কূপে উত্থিত

হইয়া, যত নগর গ্রামকেই তাপ দিবে। যন্ত্র-সাহায্যে সেই তাপের হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া, লোকে ঘর বাড়ীর তাপ আপনাদের মনোমত করিয়া লইবে; শরৎ বসন্তে অল্প লইবে, গ্রীষ্মে আদৌ লইবে না, কিংবা নামমাত্র লইবে। তাহা হইলেই, কার্য্যতঃ পৃথিবীতে আর ঋতুভেদ থাকিবে না। তাপের তারতম্যই ত ঋতুভেদের হেতু। যখন সে তারতম্য থাকিবে না, তখন ঋতুভেদই থাকিবে না।

মানব-দেহ।

মানবদেহে নানারূপ পরিবর্ত্তন হইবে। নর নারী উভয়েরই মাথা আরও বড় হইবে, দেহ আরও ছোট হইবে। বিলাতের বিজ্ঞানকল্প ঔপন্যাসিক ওয়েলস্ সাহেব বলেন, "মানুষের মস্তিষ্ক যত বাড়িবে, তাহার মাথাও তত বাড়িবে, আর দেহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি ততই ছোট হইতে থাকিবে। শেষে চরম উন্নতির সময়ে মানুষের মাথাটাই হইবে সর্ব্বস্ব। তখন মানুষকে কলে বসিয়া গতিবিধি করিতে হইবে। হাত পার কার্য্য নানাবিধ যন্ত্রে সম্পন্ন হইবে। মানুষ যন্ত্র পরিয়াই যাওয়া আসা করিবে। মঙ্গলগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে ভূমণ্ডলের অনেক পূর্ব্বে, সেখানকার মানব উন্নতির চরমে উঠিয়াছে। সেখানকার মানবের মাথাই সব, সে যন্ত্র সাহায্যেই চলা ফিরা করিয়া থাকে। মঙ্গলের যোদ্ধারা যখন এই পৃথিবীকে আক্রমণ করিবে তখন কলে চড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইবে, কল পর' বড় বড় মাথা-গুলা চারি দিকে ছুটিবে। আর নানারূপ ভয়ঙ্কর যন্ত্রে পার্থিব যোদ্ধাদিগের ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।"

মস্তকের ভবিষ্যৎ প্রকাণ্ডত্ব অনেক বৈজ্ঞানিকেরই অনুমোদিত। এ পক্ষে ফরাসী জ্যোতির্ব্বিৎ ফ্ল্যামেরীয়ন একক বা অদ্বিতীয়ক নহেন।

২০৫৬ অব্দের পর পৃথিবীতে জাতিভেদ ধর্ম্মভেদ থাকিবে না। সকল জাতিই একজাতিরূপে পরিণত হইবে, সকল বংশ একবংশে পর্য্যবসিত হইবে, সকল লোকেই এক ধর্ম্মের উপাসক হইবে। কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-সমন্বিত জ্ঞানধর্ম্মই হইবে তখনকার সেই একধর্ম্ম। ধর্ম্মভেদ থাকিবে না, জাতিভেদ থাকিবে না; রীতিভেদও থাকিবে না। তখন শাসনপ্রণালীর ভেদ থাকিবে না, পৃথিবীর সকল রাজ্যই এক শাসনপ্রণালীর অধীন হইবে। যখন সকল রাজ্যই এক বিরাট সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইবে, তখন আর শাসনপ্রণালীর তারতম্য থাকিবে কিরূপে? পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মানবের বসতি হইবে, সর্ব্বত্রই মানবের আধিপত্য হইবে। বনের লোপ হইবে; সুতরাং বন্য জন্তুরও লোপ হইবে। সাগর মহাসাগরেও মানবের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ হইবে। আর হোয়েল শীল প্রভৃতি সামুদ্রিক জীবের যেরূপ ধ্বংস হইতেছে, তাহাতে ২০৫৬ অব্দের পর যে, সাগর তিমিহীন ও শীলশূন্য হইয়া যাইবে, তাহা ত স্বতঃসিদ্ধ।

মানসিক উন্নতি।

তখন আর এখনকার ইন্দ্রিয় কয়টীতে কাজ চলিবে না। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় পেশীবলের ন্যায় সপ্তম অষ্টম, দুইটী নূতন ইন্দ্রিয় মানুষকে পূর্ণ করিবে। দেহস্থ তাড়িত-শক্তি এখন মানুষ নিজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, কেননা বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়গ্রামে সে অনুভূতি হয় না। ঐ তাড়িত জ্ঞানের এক নূতন ইন্দ্রিয় মানবে স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে। আবার যোগশক্তিরও একটা নূতন ইন্দ্রিয় আবির্ভূত অর্থাৎ প্রকটিত হইয়া পড়িবে। এই যোগেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানব দূরস্থ লোক জনের সহিতও সংবাদের আদান প্রদান করিতে পারিবে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রেরও ক্রমেই উন্নতি হইবে। নব নব যন্ত্রের উদ্ভাবনা এবং আবিষ্কার হইবে। "টেলিফনোস্কোপ" বা "দূরশ্রবণ-দর্শন" যন্ত্র নামে এক নবযন্ত্র উদ্ভাবিত হইবে। তাহার সাহায্যে লোকে বহুদূরস্থ শব্দ শুনিতে এবং বহুদূরস্থ বস্তু দেখিতে পাইবে। শ্রবণ-দর্শন-কার্য্য একত্র সময়ে সম্পন্ন হইবে। আমেরিকার এডিসন এইরূপ যন্ত্রের পথ অনেকটা মুক্ত এবং প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। আমেরিকার নিকোলা তেস্লাও উদাসীন নহেন। বস্তুতঃ আল্ভা এডিসন এবং নিকোলা তেস্লা এই ১৯০২ অব্দে যাহা করিয়া তুলিয়াছেন, ইংলণ্ডের লর্ড কেল্ভিন প্রভৃতি যাহা করিয়াছেন, ফ্রান্সের ফ্ল্যামেরিয়ন নিজে যাহা করিয়াছেন, ইতালির মার্কোনি এখনই যাহা করিয়াছেন, তাহাতে অনায়াসেই বুঝা যায়, এই হারে ২০৫৬ অব্দে বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠাই হইবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের তখন যাহা হইবে, এখন তাহার অনুমানও করা যায় না। এখনকার অদৃশ্য তখন দৃশ্য হইবে, এখনকার অশ্রাব্য তখন শ্রাব্য হইবে, এখনকার অস্পৃশ্য তখন স্পৃশ্য হইবে। এখনকার সমস্ত অজ্ঞেয়ই তখন

জ্ঞেয় হইবে। যোগবিদ্যার বিস্তার হইবে। আত্মার যে সকল ক্রিয়াকলাপ রীতিপ্রকৃতি এখন অজ্ঞাত অজ্ঞেয়, আধ্যাত্মিক বিদ্যা অর্থাৎ যোগবিদ্যা তখন তৎসমস্তই মানবের জ্ঞাত এবং জ্ঞেয় মধ্যে পরিগণিত করিয়া দিবে। এক মনের উপর তখন অন্য মন ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিবে। দুরস্থ মনের সহিতও মন অনায়াসে সম্বন্ধ রাখিতে পারিবে। এই পৃথিবীর ত কথাই নাই, অন্যান্য গ্রহের সহিতও তখন মানব সহজেই সম্বন্ধ রাখিতে পারিবেন। মঙ্গলের সহিতত যে, প্রথমে সংবাদের আদান প্রদান হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তৎপরে শুক্রের সহিত; শেষে বৃহস্পতির সহিত সম্বন্ধ ঘটিবে। ঐ সকল গ্রহের মানব বা মানবসম জীবগণের সহিত অত্রত্য মানব জীব সংবাদের আদান প্রদান করিয়া, ঘনিষ্ঠতা করিতে পারিবেন। চিকিৎসাবিদ্যার বকাল মকাল ঔষধ পত্র সব উড়িয়া যাইবে। এখন যাহাকে তোমরা হিপ্‌নোটিজম বা মোহিনী শক্তি বল, যাহাকে এনিমল ম্যাগনেটিজম বা জৈব চুম্বকশক্তি বল, যাহাকে সাইচিক বা আধ্যাত্মিক যোগশক্তি বল, ঐ সব শক্তির ২৩৫৬ সালে পরিণতি বিষয়ে পরাকাষ্ঠা হইবে। তখন ঐ সকল শক্তির সাহায্যেই চিকিৎসকেরা মানবের সকল রোগ ব্যাধি দূর করিয়া দিবেন। আর রোগ ব্যাধি তখন হইবেও কম। যে টেলিপ্যাথি বা যোগ-শক্তি-সমুৎপন্ন-সংবাদ সঞ্চারণ এখন কোন কোন লোকের বিশ্বাস্য হইলেও অনেকেরই অবিশ্বাস্য, যোগী মহাযোগীরা যে টেলিপ্যাথি বা দূরজ্ঞানশক্তির সাহায্যে সমগ্র জগতের খবর রাখিতে পারেন, শুনিয়া অনেকেই এখন উপহাসরসিকতার পরিচয় দিয়া থাকেন; সেই টেলিপ্যাথি, সেই দূরজ্ঞান শক্তি—২৩৫৬ অব্দে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া অনেকেরই আয়ত্ত হইবে। তখন মানবের মানসিক শক্তি ক্ষমতাও চরমে উঠিবে।

পৃথিবীর অবস্থা।

২৩৫৬ খৃষ্টাব্দের পর পাশ্চাত্য জগতে রাজ্য থাকিবে একটি; কেন না যত রাজ্যই সাধারণ-তন্ত্রে পরিণত হইয়, ক্রমে মিলিয়া যাইবে। ক্রমে সমস্ত রাজ্যই এক রাজ্যে পরিণত হইবে। সেই মহারাজ্যের রাজধানী আমেরিকায় মিচিগান হ্রদের তীরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন পর্ত্তুগালের রাজধানী লিসবন সাগর-গর্ভে নিহিত থাকিবে। স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ, ইতালির রোম, নেপল্‌স এবং ফ্লোরেন্সের কিছুই থাকিবে না, থাকিবে কেবল ধ্বংসাবশেষ। ফরাসীর প্যারিসেরও সেই দশা ঘটিবে। চীনের বর্ত্তমান ৫০।৬০ কোটি মানুষ তখন ১০০ কোটির উপর দাঁড়াইবে। ২৩৫৬ অব্দের পর ১০০ কোটী চীন পশ্চিম ইউরোপে বসবাস করিবে। পূর্ব্বে ইংরেজিনবীশ ২০০ কোটী মানবের কথা কথিত হইয়াছে, চীনদিগের কথা কথিত হয় নাই। শিল্প-বিজ্ঞানাদিসম্বন্ধেও ইংরেজিনবীশদিগের কথাই কথিত হইয়াছে; মিচিগান হ্রদের তীরে তাহাদিগেরই রাজধানী বসাইবার কথা বলা হইয়াছে। শতকোটী চীনের রাজধানী হইবে কিন্তু ইউরোপে। ইউরোপ যাইবে আমেরিকায়, চীন আসিবে ইউরোপে। ফ্রান্সের প্যারিস বিলুপ্ত হইবে, সকল নগর বিলুপ্ত হইবে না। শতকোটী চীনের দীর্ঘ রাজধানী ফ্রান্সের বোঁর্দো হইতে তুলুস পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। তখন এইরূপ দীর্ঘ রাজধানীই আবশ্যক হইবে। হলণ্ডের এমষ্টারডম এবং রটারডম, ফ্রান্সের রুয়ে এবং মার্শেল নগর সাগরগর্ভে ডুবিয়া থাকিবে। ঐ সকল নগরের উপর গভীর জলরাশি বিরাজ করিবে।

ক্রমশঃ।

ক্রমেই সর্ব্বনাশের পথ মুক্ত হইতে থাকিবে। পঞ্চাশীতি শতাব্দীর মধ্যেই—৮৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই—প্যারিসের উপর এত জল হইবে যে, সচূড় নতর্দ্দমও ডুবিয়া থাই পাইবে না। তখন চীনও সাগরমগ্ন হইয়া থাকিবে। পক্ষান্তরে আটলাণ্টিকের গভীর তল উচ্চে উঠিতে থাকিবে। এখন যেখানে জলের আবস্ত, তখন সেখানে উঠিবে তল। কিন্তু আটলাণ্টিকের জলও তখন শততাল ছাড়াইয়া উঠিবে এবং চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিয়া দিবে। আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটের পূর্ব্ব দিকটা—আটলাণ্টিকের দিক্‌টা—একেবারেই অদৃশ্য হইবে, একেবারেই অতলস্পর্শে যাইবে। ওদিকে প্রশান্ত এবং ভারত মহাসাগরের মধ্যস্থিত সামুদ্রিকার ছোট বড় যত দ্বীপই সংযুক্ত লিপ্ত হইয়া এক বিরাট বিশাল মহাদেশে পরিণত হইবে।

যৌবন ও বার্দ্ধক্য।

মানুষের আয়ু ক্রমেই বাড়িতে থাকিবে। বিজ্ঞান ও জ্ঞান মানুষকে আয়ুর্ব্বৃদ্ধি করিবার নানাবিধ উপায় পন্থা

দেখাইয়া দিবে। কিন্তু চরমে উঠিয়াও মানুষ ১৫০ বৎসরের অধিক বাঁচিতে পাইবে না। তবে এখন যাহারা ১৫০।১৬০ বৎসর বাঁচে, তখন তাহারা ২০০ বৎসরেরও অধিক বাঁচিবে। সাধারণতঃ মানুষ ১৫০ বৎসর বাঁচিবে। জীবন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যৌবন-বৃদ্ধিও না হইবে এরূপ নহে। মানুষ বাঁচিবে ১৫০ বৎসর, তাহার যৌবন থাকিবে ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত। ১০১ বৎসরে পড়িলে নর নারী যৌবন পার হইবে। ক্রমে সকল দিকেই সুবিধা হইবে। উন্নতির সত্য সত্য পরাকাষ্ঠা হইবে। উন্নতিকে "নযযৌ নতস্থৌ" হইয়া স্থিরভাবে থাকিতে হইবে। তখন উন্নতি হইবে না, কিন্তু অবনতিও হইবে না। এই ত্রিশঙ্কুভাব থাকিবে পৃথিবীতে "এক লক্ষ বৎসর।" এক লক্ষ বর্ষের পর অবনতির সূত্রপাত হইবে।

পৃথিবীর ধ্বংস।

ঐ লক্ষ বর্ষের পর ক্রমেই পৃথিবীর জলভাগ সংকুচিত হইতে থাকিবে, পার্থিব জলের পরিমাণ ক্রমেই কমিতে থাকিবে। ক্রমে মহাসাগরগুলি উপিয়া যাইবে, মহাসাগরের সমস্ত জল শুখাইয়া যাইবে। উষ্ণকটিবন্ধে সাগর অতি-বিলম্বে নির্জ্জল হইবে। কিন্তু সর্ব্বশেষে উষ্ণকটি-বন্ধের সাগরকেও শুখাইয়া যাইতে হইবে। পাহাড় পর্ব্বত সবই অদৃশ্য হইবে। পাহাড় পর্ব্বত অদৃশ্য হইলেই তুষারপাত রহিত হইবে। সুতরাং নদ নদী বহিবে না। বন জঙ্গলের ত কথাই নাই, কোনরূপ গাছ পালাও তিষ্ঠিতে পারিবে না। ক্রমেই পৃথিবীর গতি-বেগও কমিতে থাকিবে। এখন ভূমণ্ডল স্বীয় অক্ষে যে বেগে ঘুরিতেছে, সে বেগ থাকিবে না। ক্রমে ক্রমে বেগ একেবারেই নির্ব্বেগ হইয়া পড়িবে। পৃথিবীর আহ্নিক গতি ক্রমেই মন্দীভূত হইতে থাকিবে, সুতরাং দিবসের পরিমাণও বাড়িতে থাকিবে। আহ্নিক গতি মন্দীভূত হওয়ায়, দিন এত বড় হইবে যে, এখনকার ঘণ্টার ১১০ ঘণ্টায় তখনকার দিন অতিবাহিত হইবে। মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে দেশ কাল পাত্র তিনেরই লোপ হইয়া থাকে। খণ্ডপ্রলয়ে লোপ হয় না, ভাবান্তর হয়।

ভয় নাই।

প্রলয়ই বল, খণ্ডপ্রলয়ই বল, আর ভূপ্রলয়ই বল, প্রলয়ে এখনও বিলম্ব আছে। ২০৫৬ অব্দের পর উন্নতির যুগ; ক্রমে বহুকাল উন্নতি। অনন্তর বহুকাল পরে স্থিরতা। সেই স্থিরতা ১ লক্ষ বৎসর। তাহার পর অবনতির আরম্ভ। অবনতি হইবে অনেক দিন। সর্ব্বশেষে ধ্বংস বা প্রলয়। বিলম্ব অনেক। ফরাসী জ্যোতির্ব্বিৎ ফ্ল্যামেরীয়ন গণিয়া বলিতেছেন, সেই প্রলয়ে এখনও "১ কোটি বৎসর" বিলম্ব আছে। অতএব, "নভেতব্যং নভেতব্যম্।"

পাঠক নিশ্চিন্ত থাকুন; কোটি বৎসর নিতান্ত স্বল্পকাল নহে। আবার এই কোটি বর্ষের শেষভাগে দিন যাইবে ১১০ ঘণ্টায়। আমাদের আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া সকলেই সচ্ছন্দে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে থাকুন। এখন হইতে নিশ্বাস আটকাইয়া পড়িয়া থাকাত যুক্তিসঙ্গত নহে।

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত।

লাক্ষা প্রসঙ্গ।

লাক্ষার সহিত ভারতবাসী মাত্রেরই বিশেষ পরিচয় আছে। লাক্ষা অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে নানা-রূপ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ভারতে ইহার ব্যবসাও বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ, কাব্য, নাটক ইত্যাদিতে ইহার যেরূপ ভূরি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে যে, স্মরণাতীত কাল হইতেই প্রাচীন আর্য্যগণ লাক্ষার ব্যবহার জানিতেন। রঞ্জনক্রিয়াতেই লাক্ষার অথবা লাক্ষারসের অর্থাৎ অলক্তকের প্রতিপত্তি অত্যন্ত অধিক ছিল। তৎকালে সুন্দরীগণ অলক্তক রাগে স্বীয় স্বীয় কোমল চরণ-তল রঞ্জিত করিয়া তাহার শোভা শতগুণ বর্দ্ধিত করিতেন। পুরসুন্দরীগণের চরণ-রঞ্জন ভিন্ন যে লাক্ষার অন্য কোন কার্য্য ছিল না তাহা নহে; লাক্ষায় বস্ত্র রঞ্জিত হইত, চিত্র কার্য্যে ব্যবহৃত হইত, অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণে প্রযুক্ত হইত, নানা প্রকার কাষ্ঠ ও ধাতু দ্রব্যে পালিশ ও বার্ণিশ করিতে লাগিত, এক প্রকার দাহ্য মশাল প্রস্তুত হইত, পুত্তলিকাদি নির্ম্মিত হইত ইত্যাদি।

মহাভারতের যুগে যে লাক্ষার ব্যবহার জানা ছিল, তাহা জতুগৃহ ব্যাপারেই বেশ জানিতে পারা যায়। রামায়ণের যুগেও ইহার ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে লাক্ষার ব্যবহার জানা ছিল কি না, বেদে ইহার উল্লেখ

আছে কি না, আমরা তাহা বলিতে পারি না। বেদ-বিশারদ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহা জানাইলে বাধিত হইব। যাহা হউক লাক্ষার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে রামায়ণ মহাভারতই আমাদের যথেষ্ট প্রমাণ। তারপর লাক্ষা প্রাচীন হউক বা নূতন হউক, সে বিষয় লইয়া তত দূর বাক্‌বিতণ্ডা করিবারও কোন বিশেষ আবশ্যকতা নাই; কারণ তাহাতে সাধারণ পাঠক পাঠিকাগণের বা দেশীয় জন সাধারণের বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ঋগ্‌বেদে লাক্ষার উল্লেখ থাকুক আর নাই থাকুক, বায়ু বা বিষ্ণুপুরাণে তাহার কোন তত্ত্ব প্রকটিত হউক বা না হউক, জৈমিনী সংহিতায় লাক্ষার বৈদ্যুতিক শক্তির কোন পরিচয় প্রকটিত হউক বা না হউক, লাক্ষা যে একটী ব্যবসায়ের বস্তু এবং বহুদিন হইতে ভারতবর্ষে ইহার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, ইহাতে কোন সন্দেহ বা মতদ্বৈধ নাই।

ভারতের লাক্ষা বহু দিন হইতে ইয়ুরোপে বাণিজ্যার্থ রপ্তানি হইতেছে, ইয়ুরোপে ইহার রঙের বিশেষ আদর ছিল, আজ কাল অন্যান্য রঙের আমদানিতে ইহার প্রভা কিঞ্চিৎ মলিন হইয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি কোন কোন রঙের কার্য্যে ইহার আদর এখনও বেশ আছে। তারপর লাক্ষা হইতে যে জতু পাওয়া যায় তদ্দ্বারা নানা প্রকার পুত্তলিকা ও সখের জিনিস, নানারূপ গহনা, মোহর করিবার জন্য গালা ইত্যাদি নানা বস্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে। বার্ণিশের কাজেও লাক্ষার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও আদর আছে।

সুতরাং ইহার সম্বন্ধে দুই চারি কথা আলোচিত হওয়া মন্দ নহে, এইরূপ মনে করিয়াই আমরা অদ্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি। কয়েক খানি সাপ্তাহিক পত্রে ইতঃপূর্ব্বে এ বিষয় কিছু আলোচিত হইয়া ছিল, কিন্তু ইহার বিষয় বিশেষ ভাবে কিছু বলা হয় নাই। এজন্য আমরা স্বকীয় অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া এবং নানা পুস্তক অবলম্বন করিয়া ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে উদ্যুক্ত হইলাম।

প্রাচীন কালে কি কি উপায়ে লাক্ষার রঙ বাহির করা হইত, কিরূপে জতু সাহায্যে অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ করা হইত ও বার্ণিশ প্রস্তুত করা হইত, কিরূপেই বা ইহার চাঁচ হইত, তাহার জানিবার সুবিধা আমাদের নাই; তবে অভিধানে উহার নামভেদ দেখিয়া এ বিষয় কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। আমরা লাক্ষার প্রাচীনতত্ত্ব সংগ্রহের চেষ্টায় আছি; সুযোগ হইলে পুনরায় তাহা জানাইব। ভারতবর্ষের মধ্যে আসাম, মালাবার উপকূল, মধ্য প্রদেশ, মালদহ, বহরমপুর, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যার পার্ব্বত্য প্রদেশ, মানভূম, সিংহভূম প্রভৃতি স্থানে লাক্ষার চাষ প্রচলিত আছে। বোধ হয় প্রায় সকল স্থানেই একই প্রকারে ইহার চাষ আবাদ হইয়া থাকে; আমরা ময়ূরভঞ্জের এবং ছোটনাগপুরের লাক্ষার চাষ অবলম্বন করিয়াই অদ্য বলিতেছি; আমি যতদূর জানিয়াছি, শুনিয়াছি এবং দেখিয়াছি তাহাতে ময়ূরভঞ্জের লাক্ষা কীটের পালন, লাক্ষা সংগ্রহ প্রভৃতি ছোটনাগপুরের সহিত প্রায় তুল্য, সুতরাং আমরা সাধারণ ভাবেই বর্ণনা করিয়া যাইতেছি।

আমরা সাধারণ মোহর করা বাতি গালা, বা পাতগালা বা চাঁচগালার আকারেই লাক্ষা দেখিয়া থাকি। বঙ্গের কোন কোন স্থানে মোহর করা গালাকে লা, আর পাত গালাকে চাঁচ বলে। এই চাঁচ সাধারণতঃ স্বর্ণকারগণ অলঙ্কারাদির ছাঁচ তুলিতে অথবা ফাঁপা স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে পূর্ণ করিবার জন্যই ব্যবহার করিয়া থাকে। স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে পুরিবার জন্য স্বর্ণকারেরা গালাকে অগ্নিসংযোগে গলাইয়া তাহা হইতে অতি সুন্দর সূক্ষ্ম সূত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। সেগুলি ঔজ্জ্বল্য এবং সৌন্দর্য্য-প্রভায় স্বর্ণহারকে যেন নিন্দা করে, অথবা স্বর্ণ বর্ণ রেশম :—তন্তুকেও যেন লজ্জা দেয়, এই সূত্র অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ এবং অতীব কোমল। এতদ্ব্যতীত চুড়ীওয়ালা সম্প্রদায়ভুক্ত বেদিয়াগণ এই সব গালার সহিত মৃত্তিকা চূর্ণ এবং আরও কি কি বস্তু জাত এবং রং মিশ্রিত করিয়া নানাপ্রকার চুড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া তাহা নানাপ্রকার রং দ্বারা রঞ্জিত করে এবং নিম্ন শ্রেণীর কৃষক সম্প্রদায়মধ্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। কৃষক রমণীগণের নিকট এই সব গালার অলঙ্কার বড়ই মনোরম। দরিদ্র, অল্পসন্তুষ্ট কৃষক বালিকা ও যুবতীগণ এই সব অলঙ্কার পরিধান করিয়া যেমন আনন্দিতা হয়, আমাদের ভদ্রঘরের সুশিক্ষিতা বিদুষী সভ্যাভব্যা অনেক রমণী সোণার চুড় গড়াইয়া পরিলেও তত আনন্দ পান কিনা সন্দেহ! বার্ণিশে গালার ব্যবহার বিষয় পরে বলা যাইবে।

যাহা হউক আমরা বাজারে লাক্ষাকে বাতি অবস্থায় বা পাত অবস্থায় দেখিতে পাই বটে, কিন্তু ইহার উৎপত্তি

যে কিরূপে হইয়া থাকে তাহা অনেকেই অবগত নহেন। রেশম এবং তসর যেমন গুটী পোকা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, লাক্ষার জন্যও আমরা সেইরূপ একপ্রকার কীটের নিকট কৃতজ্ঞ। ইহাদিগকে লাক্ষা কীটই বলা হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে ইহাদিগকে যৌ কীটও বলে।

এই সব কীট বন্য বৃক্ষের শাখায় স্বীয় বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে; এই বাসাই লাক্ষা। এই সব কীট অনেক বৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখা পল্লবে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে কুসুমগাছ, পলাশ গাছ, বদরী বা কুল গাছ এই গুলিই প্রধান। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে প্রধানতঃ কুসুম গাছই লাক্ষার আবাদ জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কুসুম গাছ বলিতে যেন কেহ কুসুম ফুলের ছোট ছোট একরূপ গাছ যে বাঙ্গলা দেশে আবাদ করা হয় তাহা না বুঝেন। কুসুম গাছ একরূপ বন্য বৃক্ষ। ইহা বেশ বড় বড় হইয়া থাকে, এবং শাখা পল্লব পত্রাদিতে বিভূষিত হইয়া অনেক খানি স্থান ব্যাপিয়া থাকে; ইহারা যেন কতকটা পিটুলী গাছের মত। ময়ূরভঞ্জে অসভ্য কৃষকগণ, যাহারা লাক্ষার আবাদ করে, তাহাদের জন্য প্রত্যেক কুসুম বৃক্ষের উপর একটা রাজকর নির্দ্দিষ্ট আছে। করের পরিমাণ খুব সামান্য। প্রজাগণ গুপ্তভাবে লাক্ষা বিক্রয় করিতে না পারে এজন্য বনবিভাগের কর্ম্মচারিগণকে প্রধান প্রধান ঘাটিতে লোক নিযুক্ত করিয়া রাখিতে হয়। একবার বন বিভাগের কর্ত্তা এই কর আদায় সম্বন্ধে একটু অধিক তীক্ষ্ণতা অবলম্বন করায় লাক্ষার চাষ ভাল হয় নাই; সুতরাং রাজস্বও কম হইয়াছিল। শুনিয়াছিলাম প্রজারঞ্জক মহারাজ শেষে প্রজাগণের সুবিধার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন।

কুসুমবৃক্ষ জাত লাক্ষাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। কারণ বাজারে ইহা হইতে জাত জতুর আদর অধিক। পলাশাদি জাত লাক্ষা হইতে অলক্ত ভাল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু জতু ভাল পাওয়া যায় না। লাক্ষার শতকরা ৬০, ৭০, কি ৭৫ ভাগ ধূনা বা রজন, আর ১০।১২ ভাগ অলক্ত থাকে। এই অলক্ত ভাগ লাক্ষা কীটের বাসার অভ্যন্তর ভাগে থাকে, এবং ইহা ঐ জাতীয় স্ত্রী কীটের দেহের অংশবিশেষ। লাক্ষা কীটেরা দুইবার আপনাদের বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। একবার বসন্তকালের শেষ ভাগে, আর একবার বর্ষা কালের শেষ ভাগে। ইহারা কতকটা রেশম কীটের জাতীয়। কীট শাস্ত্রে ইহাদিগকে coccus lacca বলে এবং coccus cactii এর সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত করা হয়। ইহাদের পুং জাতির কেবল পক্ষোদ্গম হইয়া থাকে; সেও প্রথমে হয় না, বাসার মধ্যে থাকিয়া কেহ সম্পূর্ণ রূপ পুষ্ট হইলে বাহির হইবার সময় পক্ষোদ্ভেদ হইয়া থাকে। ইহাদের মত বহু বিবাহকারী জীব আর জগতে আছে কি না সন্দেহ; কারণ ইহাদের প্রত্যেক পুং জাতীয়ের হিসাবে প্রায় ৫০০০ স্ত্রী কীট পড়ে; সুতরাং প্রাচীন হিন্দু রাজগণ বা বাদশাহগণ ইহাদের নিকট লজ্জায় অধোবদন হইতেন তাহার সন্দেহ নাই। পক্ষযুক্ত পুংজাতীয় কীটের আয়তন স্ত্রীকীটের প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ হইবে।

ইহারা কোন বৃক্ষে আশ্রয় লইবার সময় দুই চারিটি পুরুষ এবং কতকতকগুলি স্ত্রী একত্র হইয়া আইসে। তার পর বৃক্ষের কোমল শাখা পল্লবের ত্বক্ স্বীয় শুণ্ড দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া তদভ্যন্তরস্থ রস গ্রহণ করিয়া দেহের পুষ্টিসম্পাদন করে এবং এক প্রকার আঠাবৎ পদার্থ স্বীয় দেহ হইতে বাহির করিয়া ডালে মাখাইয়া দেয়; এই আঠাবৎ পদার্থে ক্রমে তাহাদের সর্ব্ব শরীর আবৃত হইয়া যায়; তখন তাহারা রেশমকীটের ন্যায় স্বীয় দেহ নিঃসৃত রসে গঠিত আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া কূটস্থ জীবের ন্যায় অথবা ধ্যানমগ্ন বল্মীক সাধুর ন্যায় অবস্থান করিতে থাকে। এই আঠাবৎ পদার্থ তাহারা স্বীয় দেহ রক্ষার জন্যই বাহির করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা তাহারা একটা নিরাপদ আশ্রয় স্থান নির্ম্মাণ করিয়া লয়। কিন্তু এই আশ্রয় স্থানই তাহাদের জীবন-নাশের মূল হইয়া উঠে। এই আঠা নির্ম্মিত আবরণ ডালের উপরে ও চতুর্দ্দিকে বেশ করিয়া আঁটিয়া বসে; এ গুলি মধু চক্রের ন্যায় ছিদ্রবিশিষ্ট। এই জীবিত সমাধি হইতে পুং কীট গুলি শেষে উদ্ধার পায়, কিন্তু স্ত্রী কীট গুলির আর উদ্ধার নাই। তাহারা ঐ সমাধির মধ্যেই স্বীয় গর্ভস্থ অসংখ্য সন্তানের প্রসব ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া নিজপ্রাণ বিসর্জ্জন করে। গর্ভ গ্রহণের সময় হইতে একমাস মধ্যেই স্ত্রী কীট গুলির আকৃতি একটা কিম্ভূত কিমাকার মত হইয়া পড়ে; তাহাতে প্রধানতঃ একটা উজ্জ্বল মসৃণ লাল রঙের জরায়ু স্থানী মাত্র দেখা যায়, শুণ্ড বৃক্ষত্বকে প্রবিষ্ট থাকে, আর বাহিরে জতুর আবরণের উপরিভাগে ছোট ছোট কয়েকটি ফোটকের মত [illegible]।

এই লালবর্ণ জরায়ু স্থালাহ লাক্ষার রঙের অর্থাৎ অলক্তকের উপাদান। ইহার পরই জরায়ু বিদীর্ণ হইয়া অসংখ্য লাক্ষা-কীটশিশু উদ্ভূত হয় এবং তাহারা স্বাভাবিক সহজ জ্ঞান-প্রভাবে জতুকাবরণ ভেদ করিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে বাহির হইয়া আশ্রয় বৃক্ষকে ছাইয়া ফেলে এবং আহার কার্য্যে মত্ত হইয়া যায়। এইরূপ লাক্ষা শিশু দ্বারা আবিষ্ট বৃক্ষ গুলির দিকে তাকাইলে যেন বোধ হয় যে, তরুগুলি লালবর্ণ ধূলায় সপত্র পল্লব আচ্ছাদিত হইয়া আছে এই কীটেরা বড় ঔদরিক। বৃক্ষ শাখার রস শোষণে বিশেষ ক্ষিপ্রতা ও আগ্রহের পরিচয় দিয়া থাকে এবং তাহা দেখিতে অতি সুন্দর।

লাক্ষাকীট একবৃক্ষে বংশানুক্রমে বাস করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য এই সব ক্ষুদ্র কীটের অধিকাংশই স্ত্রী জাতীয়। লাক্ষা রমণীগণ বড় কন্যা জননী ; ভাগ্যে ইহাদের মধ্যে বিবাহে ঘড়ি চেন ও হাজার হাজার দান পণের দাবী নাই তাই রক্ষা, নতুবা তাহাদের দশা কি হইত ?

এই সব কীট আবার আহার কার্য্য করিতে করিতে পুং যোগে গর্ভিনী হইয়া পুনরায় লাক্ষাবরণে আচ্ছাদিত হয়। এইরূপে ইহাদের বংশবৃদ্ধি হইতে থাকে, শেষে একই বৃক্ষে বহুদিন বাস করিতে করিতে যখন বৃক্ষের ছালের সকল অংশই কঠিন লাক্ষার আবরণে পুরু হইয়া উঠে, তখন অগত্যা বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে এই পুরুষানুক্রমিক বাস-স্থান ত্যাগ করিতে হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, লাক্ষা কীট বাসা হইতে বাহির হইয়া গেলে শূন্য বাসা পড়িয়া থাকে ; এই বাসা গুলির অভ্যন্তরভাগ মধুচক্রের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বিশিষ্ট। এই সব ছিদ্রে অলক্তক সঞ্চিত থাকে, কিন্তু কীট বাহির হইয়া গেলে ঐ সব শূন্য বাসায় অলক্তকের ভাগ প্রায় কিছুই থাকে না। এজন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রঞ্জন এবং অলক্তক পাইতে হইলে সুপুষ্ট কীটযুক্ত বাসা আহরণ করাই প্রয়োজন এবং তাহাই সাধারণতঃ করা হইয়া থাকে। শূন্য বাসা গুলিকে ফুঁকি বলে ; ইহা বোধ হয় ফাঁকা অর্থাৎ শূন্যের তুল্যার্থ বোধক। ফুঁকির জতু বেশ ভাল, তবে অলক্তক শূন্য। যে সব বৃক্ষে লাক্ষা কীটের বাস তাহাদের তলদেশেও অনেক সময় অনেক বায়ু বিতাড়িত লাক্ষার শূন্য বাসা পাওয়া যায়, এগুলিও সংগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রয় করা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ আশ্বিন কার্ত্তিক হইতে পৌষ পর্য্যন্ত, আর বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত কীটযুক্ত বাসা সংগ্রহ করা হয়। লাক্ষার রঙ নানা প্রকারের আছে. কোন গুলি কমলা লেবুর রঙ, কতক গর্ণেটের রঙ, কতক ঘোরাল কাল মত, কোন কোন লাক্ষার পীতাভ রঙ ইত্যাদি। ইহাদের রঙকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা শ্বেতাভ করিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং তৎপর অন্য রঙ দ্বারা স্বর্ণবর্ণ করিয়া এতদ্বারা অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হয়।

লাক্ষার আবাদ করিতে হইলে ভাল কুসুম, পলাশ কি কুলের গাছ কতগুলি নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়া স্ত্রী ও পুং জাতীয় কীট ঐ সব বৃক্ষে ছাড়িয়া দিতে হয় এবং কিছুদিন কীট গুলিকে পক্ষী প্রভৃতির হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হয়।

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের মধ্যে অনেক স্থানেই লাক্ষার আবাদ আছে। এইসব লাক্ষা বা যৌ প্রায়ই পুরুলিয়া, রাঁচি, প্রভৃতি স্থানে বিক্রীত হয়, অনেক সময় মহাজনদিগের লোক গ্রামে আসিয়া প্রতি বাড়ী হইতে জতু সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়। ময়ূরভঞ্জে গিয়া একটু পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক এইরূপ জতু সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় চালান করিতে পারিলে বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারা যায়। আমরা দুই একজনের বিষয় অবগত আছি, তাঁহারা এইরূপ উপায়ে এবং তসর-কোয়া খরিদ বিক্রয় দ্বারা বেশ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন।

কোন ভদ্র লোক এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে গেলে উদার হৃদয় মহারাজের নিকট যথেষ্ট সহানুভূতি পাইতে পারিবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। তবে এ কথা জানা আবশ্যক যে, বাণিজ্য ব্যবসায়ে বাবুগিরি করিতে গেলে চলিবেনা ; সুধু লোক জন দ্বারা ব্যবস্থা করিয়া নিজে সুখাসনে তাকিয়ায় ঠেস দিয়া আলবোলা চুম্বনে কাটাইলে লাভ হইবে না ; নিজে একটু খাটীয়া খুটিয়া উপযুক্ত স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া সুবিধা বুঝিয়া মাল খরিদ করিতে পারিলে বেশ সুবিধা হইবে। অসভ্য প্রজাগণ ধূর্ত্ত মহাজন-চর কর্ত্তৃক অনেক প্রকারে প্রতারিত হইয়া থাকে ; বল পূর্ব্বক অধিক গ্রহণ, ওজনে বঞ্চনা, মূল্য কম প্রদান ইত্যাদি নানা রূপে স্বার্থপর অনেক নীচাশয় ব্যক্তি সরল স্বভাব কৃষক-দিগকে প্রবঞ্চনা করে। আমাদের বিশ্বাস, কোন ভদ্র ব্যক্তি যদি সৎপথে থাকিয়া ইহাদের সঙ্গে ন্যায্য ব্যবহার

করেন, তবে তাঁহার প্রভাব ইহাদের মধ্যে বিশেষরূপ বিস্তৃত হইবে এবং শীঘ্রই তাঁহার কারবারের উন্নতি দেখা যাইবে। অল্প মূলধনে ব্যবসায়ের একটি পথ প্রসঙ্গক্রমে আমরা দেখাইয়া দিলাম, এই ব্যবসায়ে উদ্যোগী পুরুষ মাত্রেই প্রচুর উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন।

লাক্ষার মূল্যও নিতান্ত কম নহে, কুসুমজাত লাক্ষার মণ ১০৷১২৲ হইতে ২০৷২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বদরী প্রভৃতি জাত লাক্ষার মণও ৮৷১০৲ হইতে ১৫৷১৬৲ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সময় সময় কিছু ন্যূনাধিক্যও হইতে পারে। ছোট নাগপুর ও রাঁচিই ইহার প্রধান বাণিজ্য স্থান; এবং লাক্ষা প্রধানতঃ রাঁচি হাজারিবাগ প্রভৃতি জেলা হইতে বিক্রয়ার্থ রাঁচিতেই লওয়া হয়। পুরুলিয়াতেও ইহার কারবার চলিয়া থাকে।

লাক্ষার চাষে বিশেষ কোন কষ্ট বা ব্যয় নাই। আমাদের দেশে পলাশ এবং কুল গাছে এই কীটের বেশ আবাদ হইতে পারে। ইহার বীজকীট বহরমপুর, মালদহ প্রভৃতি স্থানে চেষ্টা করিলে মিলিতে পারে; ময়ূরভঞ্জ, রাঁচি, রাইপুর, সম্বলপুর প্রভৃতি স্থানেও মিলিতে পারে। বেশ একটু দেখিয়া শুনিয়া চাষ করিতে পারিলে সমস্ত খরচাদি বাদ বিঘা প্রতি ৩০৷৪০৲ বা ততোধিক লাভ হইতে পারে।

যে সমস্ত বৃক্ষে লাক্ষার চাষ করা হয়, সেই সমস্ত বৃক্ষে কীটেরা বাসা নির্ম্মাণ করিলে পর বাসাগুলি বেশ পুষ্ট হইলে তাহা সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। যে সমুদয় ক্ষুদ্র পল্লবে এইরূপ বাসা থাকে, সেগুলি ভাঙ্গিয়া লওয়া হয়; বড় বড় শাখায় বাসা হইলে ডাল হইতে উহা চাঁচিয়া লওয়া হয়। কিন্তু প্রায়শঃই ছোট ডালেই বাস করা হয়।

এইরূপে অনেক বাসা সংগৃহীত হইলে পর শেষে সে গুলি ডাল হইতে পৃথক করিবার চেষ্টা করা হয়। এই কার্য্যে কোন কোন স্থানে চরকীর মত একরূপ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়; এই চরকী দুইটি স্ত্রীলোকে ঘুরাইতে থাকে; কোন কোন স্থানে ঢেঁকি বা উদূখলের ন্যায় একরূপ যন্ত্রের সাহায্যেও এই কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। এইরূপে বাসাগুলি ডাল হইতে বিচ্ছিন্ন এবং কিয়ৎ পরিমাণে পিষ্ট হইলে পর, হাতে বাছিয়া এবং কুলার দ্বারা ঝাড়িয়া কাষ্টের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ধূলা মাটি প্রভৃতি হইতে ইহাদিগকে মুক্ত করা হয়। তারপর পুনরায় ইহাদিগকে পিষ্ট করিয়া এবং সূক্ষ্ম চালুনী দ্বারা চালিয়া লওয়া হয়। এইরূপ করাতে লাক্ষাগুলি ঘোর কমলালেবুর রঙের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পরিণত হয়। ইহাদিগকে 'রংদার চৌরি' বলে। ইহাদের সঙ্গে অলক্তক মিশ্রিত থাকে। এই গুলিকে কিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বড় বড় মাটির গামলার মধ্যে ফেলিয়া রমণীগণ পদ দ্বারা দলিত করিতে থাকে। এক একটি রমণী একটী একটী গামলার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া পদদ্বারা লাক্ষাখণ্ড গুলিকে চাপিয়া ধরে এবং হস্ত দ্বারা কোন স্তম্ভ বা দেওয়াল আশ্রয় পূর্ব্বক একবার বামে একবার দক্ষিণে অঙ্গসঞ্চালন করিয়া লাক্ষা খণ্ডগুলিকে অবিরত পদদ্বয় দ্বারা আধারের গাত্রে ঘর্ষিত করিতে থাকে। কঠিনাঙ্গী অসভ্য রমণীগণের চরণ-সন্তাড়নে অপমানিত হইয়াই যেন লাক্ষা ক্ষোভে, লজ্জায় রক্ত বর্ণ হইয়া উঠে! তাহার অন্তর্নিহিত অলক্তক রাগ বাহিরে স্ফুটিত হইয়া পড়ে, অমনি উপর হইতে উদ্ভাসিত অলক্তক ছাঁকিয়া লইয়া আবার তাহাতে জল ঢালিয়া দেওয়া হয় এবং লাক্ষার জতু অংশ নিম্নে পড়িয়া যায়। এইরূপে যতক্ষণ লাক্ষার বিন্দুমাত্র রস অবিশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে এই রমণীর চরণ-তাড়ণ সহ্য করিতে হয়; জল ঢালিয়া সে রাগ-অপনোদনও চলিতে থাকে। পরে যখন লাক্ষার স্বীয় রাগ-গৌরব লুপ্ত হইয়া যায়, আর শত চরণ প্রহারেও রাগের বিশেষ চিহ্ন দেখা যায় না, তখন রমণীগণ বিজয়িনী হইয়া এই রণরঙ্গে ভঙ্গ দেয়। এইরূপ সারাদিনের শ্রমে একমণ দেড়মণ লাক্ষা হইলে অলক্তক বাহির করা হইয়া থাকে এবং ইহার মজুরীস্বরূপ রমণীগণ দেড় আনা কি দুই আনা করিয়া পাইয়া থাকে।

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে (আমার যতদূর জানা আছে) প্রজাগণ লাক্ষা হইতে বড় একটা অলক্তক ও জতু পৃথক করার অনুষ্ঠান করে না; তাহারা স্বীয় স্বীয় লাক্ষাক্ষেত্র হইতে লাক্ষা আহারণ পূর্ব্বক একেবারে মহাজনদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া দেয়। ময়ূরভঞ্জে লাক্ষা হইতে অলক্তক ও জতু বাহির করিবার কোন বিস্তৃত কারখানাও নাই। কেহ এখানে সুবিধা মত স্থান নির্ব্বাচণ করিয়া এইরূপ একটা কারখানা স্থাপন করিলেও লাভবান হইতে পারেন।

জতুকে পাত গালায় পরিণত করিয়া বিক্রয় করিলে বেশ লাভ হয়। রাঁচির গালার কারখানায় যে ভাল গালা প্রস্তুত হয় তাহা ৪৮৲ আটচল্লিশ টাকা মণ হিসাবে বিক্রীত হইয়া থাকে। অলক্তকের মূল্য বাজার অনুসারে এত তারতম্য হইয়া থাকে যে সে বিষয় ঠিক বলা অসম্ভব।

এইরূপ পৃথককৃত অলক্তক মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া লওয়া হয়। এইরূপ ছাঁকিয়া লওয়াতে পূর্ব্বে গামলা হইতে উঠাইবার সময় রঙের সহিত যে কিছু কাষ্ঠখণ্ডাদি, লাক্ষার গুঁড়া কি ময়লা মাটী মিশ্রিত হইয়া থাকিবার সম্ভব, তাহা কাপড়ের মধ্যে থাকিয়া যায়। এগুলিকে 'পাঁক' বলে এবং ইহাও ৩৲।৪৲ টাকা মণ হিসাবে বিক্রীত হইয়া থাকে।

ছাঁকা রঙ্গের জল কাপড় হইতে একটা ঢালু স্থানের উপর দিয়া তারের চালুনীর মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে কতকগুলি ক্রমনিম্ন বক্রনালির ভিতরে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে একটা কূপের মধ্যে পতিত হয়। এই কূপের মুখ আরও সূক্ষ্মতর তারনির্ম্মিত চালুনী দ্বারা আবদ্ধ থাকে। এইরূপে এই রঙের জল মধ্যে এখনও যা কিছু ময়লা অবশিষ্ট থাকে তাহার নালার মধ্যেও শেষোক্ত চালুনীর মুখে সঞ্চিত হইয়া থাকে; তদ্ব্যতীত উক্ত কূপের তলদেশেও অবশিষ্ট ময়লা জমিয়া যায়।

এইরূপে জলকূপের মধ্যে সঞ্চিত হইলে তাহা ক্রমে যন্ত্রযোগে উদ্ধৃত করিয়া বড় একটা চৌবাচ্চার মধ্যে ঢালা হয়, এবং তাহার সঙ্গে চূণের জল মিশ্রিত করা হয়। এইরূপ করায় রঙটা জল হইতে পৃথক হইয়া যায়, এবং চৌবাচ্চার তলায় জমিয়া থাকে। পরদিন ঐ রঙ চৌবাচ্চা হইতে উঠাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রসমন্বিত অভ্যন্তর ভাগে বস্ত্রমণ্ডিত বাক্সের মধ্যে রাখা হয়, এইরূপে রঙগুলি শুষ্ক হয়। তারপর ইহা হইতে রঙগুলি বাহির করিয়া চাপসহ একপ্রকার ফরমার মধ্যে ফেলিয়া চাপ যন্ত্রের দ্বারা লম্বা ইঞ্চি কি ঐরূপ পুরুখণ্ডে পরিণত করা হয়। তারপর সে গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কাটিয়া গুদামজাত করা হয়। এইরূপে অলক্তক রঙ প্রস্তুত হয়।

আমরা বাজারে যে আলতার চাকৃতি দেখিতে পাই, সেগুলি তুলা প্রভৃতির পাত, এই অলক্তক রঙের জলে ডুবাইয়া শুষ্ক করিয়া প্রস্তুত হয়; এবং আমাদের কুললক্ষ্মী-গণের চরণরাগ সম্পাদনার্থে ব্যবহৃত হইয়া স্বীয় ক্ষুদ্র জীবনকে ধন্য মনে করে। তবে অনেক চতুর দোকানদার খুনখারাপী বা মেজেণ্টার রঙেও পাত ডুবাইয়া আলতাপাত প্রস্তুত করিয়া থাকে।

অলক্তক পৃথক করিয়া লইবার পর যে জতু অবশিষ্ট থাকে তাহা অন্য গুদামে লইয়া গিয়া বেশ করিয়া শুষ্ক করা হয়, তারপর ইহা হইতে "মলমমা" নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ গুলি সাবধানতার সহিত বাছিয়া বাহির করা হয়, কারণ এই 'মলমমা' গালা প্রস্তুত করিবার কালে, জতুতে মিশ্রিত থাকিলে জ্বলিয়া উঠিতে পারে। মলমমা শেষে ৯।১০ টাকা মণ হিসাবে গালাওয়ালাদের কাছে বিক্রয় করা হয়; তাহারা তাহা দ্বারা নানাপ্রকার বলয়াদি আভরণ প্রস্তুত করিয়া নিম্নশ্রেণীর রমণীগণের স্বাভাবিক অলঙ্কারতৃষ্ণা নিবারণের উপায় করে। এই সব গালার অলঙ্কার কলিকাতায় পাঠিকাগণ দেখিয়াছেন কি না জানি না, পল্লীগ্রামের পাঠিকাগণ অবশ্যই দেখিয়াছেন।

এইরূপ পৃথককৃত জতু সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত দুই ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট থলির মধ্যে একটা লম্বাঘরের মধ্যে লইয়া যাওয়া হয়; সেখানে অনেকগুলি চুল্লী আছে। এই চুল্লীর সমীপেই একটা পিতলের বড় চোঙ্গের মত পাত্রে বালি কি এইরূপ কোন তাপশোষক পদার্থ পূর্ণ করিয়া মাটির দিকে একটু হেলাইয়া রাখা হয়। চুল্লীর নিকটে কোন একটা কিছু বসাইয়া তার উপর ঐ থলিগুলি বসাইয়া তলায় ঘৃতকুমারী-পত্র-নির্ম্মিত বা অন্যরূপ একটা বিস্তৃত আধার রাখা হয়। এই সময় দুইব্যক্তি দুইদিকে বসিয়া লাক্ষার থলিয়াটী বেশ করিয়া ঘুরাইতে থাকে, যেন সব দিকে সমান তাপ লাগিতে পারে। এইরূপ উত্তাপে লাক্ষা গলিয়া থলির ছিদ্র পথে বহির্নিস্থত হয় এবং পূর্ব্বস্থাপিত পাত্রে পতিত হইতে থাকে; এই সময় ঘূর্ণনকারীদের একজন একহাতে থলি ঘুরাইতে থাকে এবং অন্য হস্তে একখানি তাড়ু দ্বারা গলিত লাক্ষাকে বেশ করিয়া মিশ্রিত করিয়া দিতে থাকে। ভালরূপ মিশ্রণের পর সে ঐ গলিত লাক্ষা এক তাড়ু লইয়া পিতলের চোঙ্গটীর উপরের দিকে মাখাইয়া দেয়, সেখানে আর এক জন স্ত্রীলোক ঐরূপ পত্রহস্তে দাঁড়াইয়া থাকে, দর্বী হইতে গলিত লাক্ষা পিতল পাত্রে গালাইয়া দিবা মাত্রই সে হস্তস্থিত পত্রদ্বারা বেশ সমান ভাবে পাত্রের গায়ে গালা মাখাইয়া দেয়। ইহার পর এই পাতের উপরও নীচের

মোটা কঠিন অংশ কাঁচি দ্বারা কাটিয়া লইয়া আবার থলির মধ্যে ফেলিয়া গালান হয়। এদিকে রমণী ঐ পাত গরম থাকিতে থাকিতে চোঙ্গ হইতে খুলিয়া লইয়া অগ্নির সমীপেই বেশ করিয়া বিছাইয়া রাখিয়া দেয়। অগ্নির সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া রাখায় পাতগুলি বেশ পাতলা হয়, আর পত্রাবমর্ষণ জনিত কোন দাগ পাতের গায় থাকিতে পারে না। এইরূপ প্রস্তুত পাতগুলিকেই পাতগালা বলে। এগুলিকে শেষে গুদামে লইয়া গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া বাক্সবন্দী করিয়া যত বাণিজ্য স্থানে চালান করা হইয়া থাকে।

ভাল লাক্ষা বাহির করিয়া লইবার পর থলিতে যাহা অবশিষ্ট থাকে সেগুলিকে আবার গলাইয়া ছোট ছোট আকারে টিকের মত করিয়া অল্পমূল্যে বিক্রয় করা হইয়া থাকে।

আমরা বাজারে যে পাতগালা বা চাঁচগালা দেখিতে পাই, তাহার উৎপত্তি ও প্রস্তুতের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। সাধারণ গালা, মোহরের জন্য যে লাল গালা দেখিতে পাওয়া যায়, উহাতে লাক্ষার সহিত অন্যান্য বস্তু মিশাইয়া সিন্দূরাদির দ্বারা রং করা হয়. তারপিন ও কর্পূরের সহিত গালা মিশাইয়া রং করিয়াও একপ্রকার মোহর করা গালা প্রস্তুত হয়। ডাকঘরে যে সব মোহর করার গালা ব্যবহার হয় তাহা রজন, গালা ও ইষ্টক চূর্ণ প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

লাক্ষা রং বা অলক্তক রং রেশম পশম প্রভৃতি রঞ্জিত করিতে যথেষ্ট ব্যবহার হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয়েরা ইহার ব্যবহার জানে।

জতু বা গালার অলঙ্কার নির্ম্মাণ, মোহর করা, স্বর্ণকারের কার্য্য প্রভৃতি ব্যতীত বার্ণিশের কার্য্যে খুব অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং এই জন্যই ইহার আদর এত অধিক। ভারতবর্ষে অনেক প্রকার বার্ণিশই এই জতুর সাহায্যে করা হইয়া থাকে। বাক্স, ডেক্স, আলমারি চেয়ার প্রভৃতি অসংখ্য কাষ্ঠের বস্তুর বার্ণিশের ত কথাই নাই, প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা ইহা পিত্তলাদি ধাতুর উপরের পালিশের কার্য্যেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গালার বার্ণিশে জিনিসের ঔজ্জ্বল্যও যেমন বৃদ্ধি পায়, উহার স্থায়িত্বও তেমনি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অনেক রকম বার্ণিশের ও পালিশের সূক্ষ্ম কাজ পর্য্যন্ত এই গালার দ্বারা হইয়া থাকে।

সাধারণ বার্ণিশ করিতে লাক্ষার সহিত সিরকা বা ভিনিগার কি সুরাসার মিশাইয়া বার্ণিশ প্রস্তুত হয়, আর তাহার সহিত ইচ্ছামত রঙ আদি মিশ্রিত করা হইয়া থাকে।

কোনও কোনও সিমেন্টের কাজেও গালার ব্যবহার হয়। ইংরাজি (Lacquer) বার্ণিশের প্রধান উপকরণ গালা; গালার নাম হইতেই এই বার্ণিশের নামকরণ হইয়াছে; এই লাক্ষার সাহায্যে যে নানা প্রকারের বার্ণিশ প্রস্তুত হয়, তাহাদের মধ্যে একটী বার্ণিশের প্রস্তুত প্রক্রিয়া আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠক পাঠিকাগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। অনেক পেতলের জিনিসেই এই বার্ণিশ দেখিতে পাওয়া যায়।

পাতগালা	৮ আউন্স;	একত্রে এক গ্যালন পরিশ্রুত সুরাসারে (Rectified Spirit) মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে।
হরিদ্রা	৮ „	
স্যাণ্ডারাক্ (Sandarach)	২ „	
ড্রাগনের রক্ত (Dragon's blood)	½ „	
আর্ণটেস্ (Arnotes)	২ „	

শেষোক্ত জিনিস কয়টির বাঙ্গলা কোন নাম জানি না, তবে ড্রাগনের রক্ত দেখিয়া যেন পাঠকপাঠিকাগণের কেহ ডাইনিদের আশ্রয় গ্রহণের আবশ্যকতা বোধ না করেন; উহা এক প্রকার বৃক্ষের রক্তবর্ণ রস। উহা সকল ইংরাজ বণিক দোকানে পাওয়া যাইবে। বার্ণিশের কার্য্যে জাপানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জাপানীগণ বার্ণিশের কার্য্যে লাক্ষা ব্যবহার করিয়া থাকে, তদ্ব্যতীত উহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বার্ণিশ তদ্দেশীয় উশী নামক বৃক্ষের রস হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইয়ুরোপে জাপানী বার্ণিসের খুব আদর আছে।

যাহা হউক আমাদের লাক্ষার বার্ণিশও কম নহে; বার্ণিশ-রাজ্যে লাক্ষাও প্রথম শ্রেণীর আসন অধিকার করিয়া আছে।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

জব্বলপুরের পথে।

আবার প্রবাস জীবনের, এক নূতন যবনিকা উত্তোলিত হইল। এলাহাবাদ গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছি—এমন সময়ে দেখি মিঃ পিঃর লগেজ লইয়া কুলীগুলা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া সেকেণ্ড ক্লাসের দরজার সম্মুখে নামাইতেছে। আমাকেও তিনি সেখানে দেখিতে পাইবেন, এরূপ আশা করিয়াই আসিয়াছিলেন। আমার আর এখন সে মূর্ত্তি নাই। মাথায় নাইট ক্যাপ আঁটিয়া, অলষ্টার চড়াইয়া, বুট পায়ে দিয়া আমিও এখন তাঁহার মত সাহেব। ধোঁয়া বাহির না করিলেও মুখে একটা চুরট ধরিয়াছিলাম। খালি ছিল না—আমার চস্‌মা। মিঃ পিঃ আমায় দেখিয়া সেক্‌হ্যাণ্ড করিলেন, একটু হাসিলেন। সে হাসির অর্থ আমি বুঝিলাম—তিনি যেন বলিতেছেন "বেশ মানাইয়াছে—সাবধান! চাল চলনে ধরা পড়িও না।"

দুইজনেই গাড়িতে উঠিলাম। মনে একটু আনন্দ হইল। এই কয় দিনের বিচ্ছেদে বড় অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম। সবে মাত্র বলিতে যাইতেছি—"পিঃ—তুমি কেমন ছিলে" এমন সময়ে এক বাধা পড়িল। বাধা আর কিছু নহে—এক শ্বেতাঙ্গ আসিয়া সস্ত্রীক সেই কক্ষে উঠিলেন। বুঝিলাম, একটু বাঙ্গলায় কথা কহিবার সুযোগ লোপ হইল। মিঃ পির চেহারাটীও বেশ গৌরবর্ণ ছিল—মেজাজটাও গম্ভীর—চাল চলনও কেতা দুরস্ত। তিনি যে খাঁটি সাহেব তাহাতে সহসা কেহ অবিশ্বাস করিতে পারিত না। কিন্তু আমার অনভ্যাসের ফেঁ, কাজেই একটু সাবধানে থাকিতে হইল।

সাহেবরা উঠিয়া একখানি বেঞ্চ দখল করিলেন। আমরাও একখানি করিয়াছিলাম। তাহারা আপনা আপনি কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। মেম সাহেব সাহেবকে বলিতেছেন—"John Dear, our journey will end in 3 hours and we will stop with Mr Legrie for a day or two—He is so anxious." কথায় বুঝিলাম তিন ঘণ্টা বাদে সাহেব নামিয়া যাইবেন। সতনা পর্য্যন্ত তাঁহারা যাইবেন এই বুঝিলাম। অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম। কথা কহিতে না পাই, দুই ঘণ্টা একখানা বই পড়িলে, কাটিয়া যাইবে।

সাহেবের বেঞ্চের নীচে, একটা ক্ষুদ্র বাস্কেট ছিল। তিনি সেটীর ডালা খুলিলেন। একটা Tumbler বাহির হইল। একটা পিলসেনার বিয়ারের মুখ খুলিয়া, সেই বাক্সের মধ্যে একটা কাচের পাত্র হইতে খানিকটা বরফ লইয়া সাহেব বিয়ার ঢালিয়া মেমের সম্মুখে ধরিলেন। মেম্ সাহেব হাসিয়া বলিলেন—Oh ! thank you John. মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সেই ঈষদ্রক্তময় আসবপূর্ণ পাত্র শূন্য হইয়া পড়িল। মেম সাহেব শয্যায় আড় হইলেন। "জন" ও তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া বসিয়া একখানি পাইওনীয়ারের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিয়া তাঁহার রক্তবর্ণ চক্ষু দুটিকে আমাদের নেত্রপথের অতীত করিয়া দিলেন।

মিঃ পি, হ্যাগার্ডের Solomons mine খুলিয়া নিমগ্নচিত্ত ছিলেন। আমিও উপায়ান্তর না দেখিয়া একখানা পুরাতন ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের বাররত্রয় পঠিত পুরাতন সংবাদ পাঠে মন দিলাম।

গাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছে। এলাহাবাদ হইতে নৈনির পথে, আবার গঙ্গা যমুনার দূর দৃশ্য দেখিলাম। পার্শ্বে নৈনি জেলখানা। নিম্নে এলাহাবাদ সহরের ঘুটিঙ্গ মণ্ডিত রাস্তার উপর একা ও বিবিধ শকটাদির ঘর্ঘর নিনাদিত গতি। দূরে আকবর সার "দরিয়াপারী কেল্লা" একখানি চিত্রপটের ন্যায় পরিদৃশ্যমান। পোলের উপর দিয়া গাড়ি ছুটিতেছে। ধন্য ব্রাডফোর্ড লেসলি! ভারতের বুকে কি কীর্ত্তিস্তম্ভই না রাখিয়া গিয়াছ।

খাদগড় পার হইলাম। রাস্তার বন্ধুর অবস্থা, পার্শ্ববর্ত্তী পরিবর্ত্তনীয় অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, পাহাড়ে দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ক্রমশঃ রেলের গতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিন্ধ্যাচলের সমশ্রেণীভুক্ত বন্ধুরগাত্র পর্ব্বত গুলির সংখ্যা বাড়িয়া উঠিল। দুইদিকে মাঠ, মাঠের প্রান্ত সীমায় খুব দূরে বড় বড় পাহাড়। তাহার উপর কত বড় বড় গাছ, ঝোপ, জঙ্গল। মাঠের মধ্যে মধ্যে এক একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। কয়েকখানি জীর্ণ দুরাবস্থাময় কুটীর সমাবেশেই এই গ্রামের সূচনা।

সটনায়।

গাড়ী যখন সট্‌নায় আসিল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। আজ কাল সট্‌নায় পৌঁছিতে রাত্রি হয় না। বেঙ্গল নাগপুরের সহিত প্রতিযোগীতায় ই, আই রেলওয়ে কোম্পানী সময়ের ও ট্রেণের গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। মোটের উপর সট্‌নে একটী খুব বড় ষ্টেশন। এখানে সাহেবদের ডিনারের বন্দোবস্ত আছে। গাড়ী অনেকক্ষণ থামে। এঞ্জিন বদল হয়। সাহেবরা যাহাকে বড় বলেন—আমরাও তাহাকে বড় বলিতে বাধ্য।

সট্‌না মধ্য ভারতের সামন্ত রাজ্য রেওয়ার সীমামধ্যে। সট্‌নায় রেওয়া রাজ্যের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট বাস করেন। ষ্টেসন হইতে সহরটি অৰ্দ্ধ ক্রোশ। এ দেশের সহর যেমন হয় সেইরূপ। হাট বাজার আছে, ছোট ছোট লাল সুরকীর রাস্তা আছে, ছোট বড় মাঝারি রকমের অনেক গুলি বাড়া আছে। সাহেবদের মধ্যে অনেকে এই সহরে থাকেন। জলহাওয়া খুব ভাল। মহারাজারও সহরের মধ্যে কয়েকটী প্রাসাদ আছে। অনেক সাহেব বাহির হইতে রেওয়ার জঙ্গলে শিকারের লোভে এই সটনায় মহারাজের ও ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভারতের রাজ রাজড়া হইতে সামান্য কুটিরবাসীর সাধারণ ধর্ম্ম—অতিথি পরায়ণতা। কাজেই কালর দেবতা সাহেব অতিথির পরিচর্য্যার কোন রূপই ত্রুটি হয় না।

আমার এক সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধু রেলওয়ে এঞ্জিনের নাম দিয়াছিলেন "অগ্নিময় অশ্ব", কথাটা আগে পছন্দ হয় নাই। কিন্তু সটনায় আসিয়া বুঝিতে পারিলাম আমার প্রিয় বন্ধু মিঃ পি এই 'অগ্নিময় অশ্বর' মূদঙ্গার রূপ খানা গ্রহণ দেখিয়া ক্ষুধার সংক্রামকতা গ্রস্ত হইয়াছিলেন। কেননা সটনায় পৌঁছিয়া তিনি সটান Refreshment Room এর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; গাড়ী প্রায় অৰ্দ্ধ ঘণ্টা থামিবে। আমি ও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। সেখানে সাহেবী খানা খাইবার প্রবৃত্তি না থাকিলেও, মিঃ পিঃর সাহেবী ধরণে জঠরাগ্নির সন্তোষ সাধন ব্যাপারটা দেখিবার একটা কৌতূহল হইয়াছিল।

পরিষ্কার পোষাক পরা খানসামা, শুভ্রবস্ত্র মণ্ডিত টেবিলের উপর একটি প্লেট কয়েক স্লাইস্ টোষ্ট করা রুটি, দুই খানি কেক, চারি খানি জিঞ্জার বিস্কুট, ও এক পেয়ালা গরম চা, দুধ, চিনি রাখিয়া গেল। বুঝিলাম লাইট টিফনের ব্যাপার। মিঃ পি আমায় চা খাইবার জন্য, বাঙ্গালা দেশের সীমার বাহিরে কুসংস্কার টা পরিত্যাগ করিবার জন্য, ইঙ্গিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আমি এমনি দুর্ব্বলচিত্ত যে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। মিঃ পি ইচ্ছামত দুগ্ধ ও শর্করা মিশ্রণে চা টাকে সুপেয় করিয়া লইয়া "সিপ" করিতে লাগিলেন—আমি কামরায় ফিরিয়া আসিয়া ট্রাঙ্ক খুলিয়া খানকয়েক লুচী ও একটু মিষ্টান্ন দ্বারা উদর তৃপ্তি করিলাম।

সটনার গাড়ি ছাড়িবার সময় হইল। শেষ ঘণ্টা দিল। মিঃ পি সহাস্য মুখে একটা চুরট টানিতে টানিতে কামরায় আসিয়া বলিলেন—"দেখ সাহেবী পোষাক পরিলেই সাহেব হয় না। অনেক কাজে সাহস চাই। ঐ শুক্‌না লুচী গুলা চিবাইয়া কেন কষ্ট পাইলে? আমার সঙ্গে খাইলেই ত হইত।" গাড়ি ছাড়িয়া দিল। মিঃ পির—কথায় কোন উত্তর করিলাম না। উত্তর করিলেই বিতণ্ডার সৃষ্টি হইবে। সট্‌নার গাড়ি ছাড়িবার পর মেদিনী অন্ধকারনিমজ্জিতা হইল। সে রাত্রে

চন্দ্রালোক ছিল না। প্রকৃতির নয়নমোহন দৃশ্য দর্শনের সাধটা সেই অন্ধকারেই বিসর্জ্জন দিলাম। ক্রমশঃ দেখি শীত বাড়িতেছে। পাহাড়ে শীতের সূচনা বুঝিয়া গায়ে আবার কাপড় দিলাম।

সটনা হইতে, দিওড়ি পর্য্যন্ত কেবল টাইমটেবল খুলিয়াছি। জব্বলপুর পৌঁছিতে পারিলেই যেন বাঁচি। যেখানে আমাদের নামিবার কথা ছিল—তাহারা আমার পরমাত্মীয়। কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে কোনরূপ টেলিগ্রাম করা, বা কোনরূপে সংবাদ পাঠান হয় নাই। তাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞ নহেন। তাহা হইলে হয়তঃ আমাদের মনের কথা বুঝিয়া ষ্টেসনে আসিয়া অপেক্ষা করিতেন। জব্বলপুরে পৌঁছিতে অনেক রাত্রি হইবে। সে রাত্রে, অপরিচিত স্থানে কে আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট স্থান দেখাইয়া দিবে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ভরসা মিঃ পি সঙ্গে। আমার ত এই প্রথম বিদেশ যাত্রা।

জব্বলপুর।

ভরসাটা নিতান্ত অপাত্রে করি নাই। বোধ হয় সে রাত্রে মিঃ পি না থাকিলে আমাদের বড় কষ্টই পাইতে হইত। গাড়ী খানি যখন পৌঁছিল তখন রাত্রি অনেক। ষ্টেসনে যে দুই চারি খানি শিগ্রাম ছিল, তাহা অন্য যাত্রীদের আত্মীয়েরা ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রথম শ্রেণীর গাড়ী (যাহা এ দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীর মত) তাহার এক খানি ছিল, কিন্তু ষ্টেশন মাষ্টার সাহেব সেখানি লইয়া চলিয়া গেলেন। আমি বড়ই বিপদে পড়িলাম। কেননা আমাকেই গাড়ীর চেষ্টায় বাহির হইতে হইয়াছিল। মিঃ পি এত দুর্দ্দশায়ও তাঁহার সাহেবী কেতা ছাড়েন নাই। ফিরিয়া আসিয়া দেখি একটী প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর গৃহে এক খানি কৌচের উপর মি পি সানন্দিত মনে চুরট টানিতেছেন। দুই তিনটা কুলী তাঁহার জিনিস পত্র একটা টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিতেছে। আমার লগেজগুলাও সেই সঙ্গে ছিল। একজন কেলনারী খানসামা, সেই খানে পি—সাহেবের আদেশ অপেক্ষায় দণ্ডায়মান। ঘটনাটা দেখিয় বুঝিলাম পি সাহেব আমার আগেই সন্ধান পাইয়াছেন, ষ্টেসনে একখানিও গাড়ী নাই। সাহেবী পরিচ্ছদের চালচলনের একটা যে বাহাদুরি আছে তাহা সেই দিন বুঝিলাম। মিঃ পি ইংরাজীতে বলিলেন—"ভায়া, আজ বাকী কয়েক ঘণ্টা রাত্রি এই ষ্টেসনেই কাটাইতে হইবে। ঘরটী যখন পাইয়াছি, তখন আর ভাবনা নাই।"

যাহা হউক সে রাত্রিটা নিদ্রায় অনিদ্রায়, সুখে দুঃখে এক রকম কাটিল। আমার adventure করিবার বাসনাটা ছেলে বেলা হইতেই। সে দিন একটী ছোট খাট রকমের হইয়া গেল।

প্রভাতে উঠিয়া আমরা ষ্টেসনের টয়লেটরুমে গিয়া মুখ হাত ধুইয়া লইলাম। ষ্টেসনের চাকরেই দেখি দুই খানি শিগ্রাম লইয়া উপস্থিত। কুলীরা একখানি গাড়ীতে মাল উঠাইয়া দিল, আমরা অপর একখানি গাড়ীতে উঠিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলাম।

আমার থাকিবার স্থান হইয়াছিল জব্বলপুরের ভূতপূর্ব্ব Extra Assistant Commissioner স্বর্গীয় নবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে। মিঃ পিকেও সেইখানে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু স্বাধীন ভাবের উপর আদব কায়দায় একটা বাঁধাবাঁধি পড়িবে বলিয়া তিনি তাঁহার সমবয়স্ক এক বন্ধুর বাটিতেই চলিয়া গেলেন।

জব্বলপুর সহর।

জব্বলপুরের আত্মীয়েরা আমায় দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। আসিবার কোন কথা বার্ত্তাই ছিল না। কাজেই সহসা আমায় সশরীরে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তাঁহারা বড়ই প্রফুল্ল হইলেন। সে দিনটা বিশ্রামেই কাটিল। অপরাহ্ণে মিঃ পির সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি ও তাঁহার সেই উকীল বাবুটি, আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত, কাজেই সহর ভ্রমণে যাইতে হইল।

জব্বলপুর সহর, আধুনিক। আধুনিক অর্থাৎ ৩০।৩৫ বৎসরের মধ্যে ইহা বর্ত্তমান উন্নতির অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। জিঃ আইঃ পি রেল এখানে হইতে আরম্ভ হইয়া, বোম্বাই পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ইঃ আই আর, এই জব্বলপুরে আসিয়া জিঃ আইঃ পির সহিত মিলিত হইয়াছে। এখানকার রাজা গোকুল দাস স্বাধীন ব্যবসায় ও আত্ম নির্ভরতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁহার সেপাহী শাস্ত্রিওয়ালা বিস্তৃত প্রাসাদ, অতুল ঐশ্বর্য্য ও অপর দিকে অসংখ্য স্বর্ণ রৌপ্য পাত্রের অধিকারী হইয়াও ভূপৃষ্ঠে পত্রের উপর একাহার যেন প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের জীবন্ত উদাহরণ। জব্বলপুরে অনেক উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী বাস করেন।। কয়েকজন সিভিল জজ, মুনসেফ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর আছেন। বাঙ্গালী উকীলও অনেক। এখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীদের সহৃদয়তা ও সরল ভাব দেশের বড়ই দুর্ল্লভ জিনিস। এখানে অতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও বাঙ্গালীকে অতিথিরূপে পাইলে, স্বদেশের লোক দেখিতে পাইলে, বড়ই আদর অভ্যর্থনা করেন।

জব্বলপুর সহরটী যে খুব বড় তা নয়। চারি দিকে পরিষ্কার প্রশস্ত রাজ পথ। সহরের বাহিরেই পাহাড়। অবশ্য সকল দিকে এ পাহাড় নাই। পথ ঘাট বেশ পরিচ্ছন্ন। চকটী অতি বিস্তৃত। সর্ব্বদাই জনপূর্ণ। ক্রেতা বিক্রেতার সমাবেশ দেখিলে এক এক সময়ে কলিকাতার বড়বাজারের পথ বলিয়া বোধ হয়।—জব্বলপুরের মধ্যেই ক্যাণ্টনমেণ্ট বা সেনানিবাস। সেনানিবাসের আশে পাশে বড় বড় "বাঙ্গলো", এখানে সাহেবেরা বাস করেন। জব্বলপুরের চিফকোর্টটী অতি সুন্দর। হায়! এ সব দেশেও আমাদের হতভাগ্য দেশের ন্যায় অর্থী প্রত্যর্থীর মধ্যে মহাসংগ্রাম! বড়ই পরিতাপের বিষয়।

ঠগীজেল

জব্বলপুরের একটী প্রধান দর্শনীয়। কর্ণেল স্লিমানের কার্য্যক্ষেত্রই ছিল মধ্যভারবর্ষ। যে ঠকের নামে পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে লোকে কাঁপিয়া উঠিত, একাকী দূরদেশে সহসা যাইতে সাহস করিত না—এই ভদ্রবেশী, সঙ্কেত ভাষী, ফাঁসুড়ে দিগের হাতে প্রাণ নাশের ভয়ে দলবদ্ধ না হইয়া পথ চলিত না, আজ তাহাদের বংশধরেরা ঠগীজেলের মধ্যে বংশানুক্রমে বন্দীভাবে থাকিয়া শিল্প শিক্ষায় বা নানাবিধ ব্যবহারিক বিদ্যায় দীক্ষিত হইয়া পূর্ব্ব স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়াছে।

ঠগের উৎপাত এক সময়ে বড়ই বেশী হইয়াছিল। ডাকাত অপেক্ষা লোকে ঠককে বেশী ভয় করিত। ডাকাত প্রকাশ্যে আসে, আসিবার আগে লোকে জানিতে পারে, কিন্তু ঠক কখন সঙ্গ লইয়াছে তাহা নির্ণয় করিয়া বলা ঐ সব সময়ে বড় দুষ্কর ছিল। পথিক হয়তঃ স্থানান্তরে যাইতেছে। পথিমধ্যে দেখিল তাহার অপেক্ষা আরও একদল সম্ভ্রান্তলোক সেই পথে চলিয়াছে। সে তাহাদের সঙ্গ পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইল। আলাপ পরিচয়ে বড়ই সুখী হইয়া তাহাদের দলে গিয়া মিশিল। সহসা কোথা হইতে সঙ্কেত শব্দ বাহির হইল—"চিলিয়া মাজনা" বা "হুকা ভরলেও" অমনি সেই হতভাগ্য বিশ্বস্ত চিত্ত পান্থের গলদেশে পশ্চাৎ হইতে তড়িদ্বেগে রেশমী ফাঁস লাগাইয়া তাহার জীবনলীলার শেষ করিয়া দিল।

কর্ণেল স্লিমান লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে এই ঠকের সমস্ত প্রধান দলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেন। স্লিমানের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও উদ্যমে ঠগেরা ব্যবসা ছাড়িয়া দেয়। স্লিমান যে কয়টী বিশিষ্ট দলপতিকে এই সময়ে ধরিয়া ছিলেন, তাহাদের কয়েক জনকে এই জেলে আবদ্ধ রাখেন। তাহারা জেলের মধ্যেই—বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বংশ বৃদ্ধি করে। এখন জব্বলপুরের ঠগী জেলে যে সব ঠক বাস করি-

তেছে, তাহারা অপরাধীদিগের বংশীয়। গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস—নর শোণিতলোলুপ শার্দ্দূল যেমন কথনও শোণিতস্বাদ ভুলিতে পারে না—ঠগদের বংশাবলীর মধ্যে জাতীয় বৃত্তি পরিহার কল্পনাও সেইরূপ অসম্ভব। ইহারা জেলে থাকিয়া কার্পেট বস্ত্রাদি বয়নে, নানারূপ শিল্পকার্য্যে শিক্ষিত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট আছে। জব্বলপুরে আসিলে একবার ঠগী জেল দেখা উচিত।*

নবরাত্রি।

আমাদের দেশে দুর্গোৎসবের যে আনন্দ, এ দেশে পূজার সময়ে সাধারণ লোকে নব রাত্রিতে সেইরূপ আনন্দই উপভোগ করে। সৌভাগ্য ক্রমে আমরা পূজার সময়েই জব্বলপুরে আসিয়াছিলাম। সপ্তমীর প্রাতে নিমন্ত্রণ পত্র পাইলাম। এখানকার পদস্থ বাঙ্গালীরা চাঁদা করিয়া প্রতিবৎসর শারদীয়া পূজা করেন। যত বড় বড় উচ্চ পদস্থ জজ ম্যাজিষ্ট্রেট তহশীলদার প্রভৃতি রাজ কর্ম্মচারীরা, উকীল ও অধ্যাপকেরা, ও অন্যান্য প্রবাসীরা একত্রিত হইয়া মহামায়া পূজার দিবসত্রয় মহানন্দে অতিবাহিত করেন। অনেক হিন্দুস্থানীও এই পূজায় যোগ দেন। প্রায় ৫।৬ হাজার টাকা চাঁদা উঠে। প্রথমদিনে আমরা যাই নাই, অষ্টমীর দিন পূজার মন্দিরে গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে বোধ হইল যেন বাঙ্গলা দেশে কোন আত্মীয়ের বাটীতে পূজার নিমন্ত্রণে আসিয়াছি। পূজার দালানের সম্মুখেই একটী বৃহৎ মণ্ডপ। মণ্ডপটী ঝাড় লণ্ঠন, ছবি, আয়না, ধ্বজা পতাকা ও ফুলের মালা বেশ সুন্দররূপে সুরুচির সহিত সাজান। স্থানীয সিবিল জজ ও আর দুতজন পদস্থ বাঙ্গালী সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছেন। তাঁহারা আমাদের গলায় ফুলের মালা দিলেন; আতর ও গোলাপফুলের একটী তোড়া দিলেন। সে দিন জনতাও খুব ছিল। মধ্য প্রদেশের কর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা চিফ কমিশনার সাহেব হইতে অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, মিলিটারিগণ, কালেজের ইংরাজ অধ্যাপক, ডিষ্ট্রীক্ট পুলীস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি সকলেই সে ক্ষেত্রে উপস্থিত। ব্যাপারটা ফ্যান্সি বল নয়, লেভি নয়, বা ড্রয়িং রুম নয়—হিন্দুর সাম্বৎসরিক—আবহমান কাল প্রচলিত—একটী আনন্দোৎসব। এ ক্ষেত্রে আমন্ত্রিত রাজকর্ম্মচারিগণ—দশীযদের সহিত যেরূপ ভাবে প্রাণ খুলিয়া মেশামিশি করিতেছেন—এ দৃশ্যটা দেখিবার জিনিশ বই কি? বাঙ্গলা দেশে—রাজধানী কলিকাতায়—আমরা এরূপ প্রীতি সম্মিলন বড় একটা দেখিতে পাই না। কি কমিশনার, কি জজ, কি ম্যাজিষ্ট্রেট—সকলেরই গলায় ফুলের মালা, হাতে ফুলের তোড়া, মুখে একটা স্বাভাবিক প্রীতির ভাব—। সেই আগ্রহপূর্ণ করমর্দ্দন প্রীতিজনক গ্রীবাসঞ্চালনে—সেই শ্বেত কৃষ্ণের প্রভেদ জ্ঞান বিরহিত সরলতা মণ্ডিত সংমিশ্রণ আলাপন সম্ভাষণ আমার দেখে বড় ভাল লগিয়াছিল। আর একটা কথায় বড় হাসি আসিতেছিল। মিঃ পিও এ ক্ষেত্রে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি সাদা সাহেব, খাঁটি বাঙ্গালী হইয়া তিনি ফুলের মালা গলায় দিবার সময় যেন একটু চিত্তের দুর্ব্বলতা দেখাইলেন। সাহেবী পোষাকে এক ছড়া মালা গলায় দেওয়া যেন অসভ্যতা বিবেচনা করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন তাঁহার অপেক্ষা শতগুণে সাদা সাহেবেরা আনন্দের সহিত মালা পরিতেছেন—অঙ্গুলি ডুবাইয়া আতর দান হইতে আতর লইতেছেন, তখন মিঃ পির, ন্যায় দাঁড়কাক বেশী সাহেবকে মনে মনে একটু লজ্জিত হইতে হইয়া ছিল বই কি? তিনি প্রথমে যে মালা ছড়াটি খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা সাহেবদের দেখাদেখি আবার গলায় দিলেন। আমি আর হাসি রাখিতে পারিলাম না।

যাক্ সেসব কথা, মুজরা আরম্ভ হইল। বেনারস হইতে আনীত বাইজীরা যখন মিঠা ভেরবীতে মিঠাসুরে "ভাউবাৎলাইয়া" গান আরম্ভ করিল তখন সকলেরই মনোযোগ সেইদিকে আকর্ষিত হইল অনেক ইংরাজ মহিলা গানের অর্থবোধ করিতে না পারিলেও সংগীতের সুন্দর সুর লহরীতে—বংশীধ্বনি মোহিতা কুরঙ্গীর ন্যায় স্থির ভাবে বসিয়া রহিলেন।

রাত্রি ১টার সময় নাচ ভাঙ্গিল। আমরা বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিলাম। পরদিন প্রাতে আমাদের নর্ম্মদা পাহাড় ও মর্ম্মর পাহাড় দেখিবার বন্দোবস্ত স্থির হইয়াছিল। কাজেই সরাসর গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

বিজয়ার-আনন্দ।

বিজয়ার কথা এই সময়ে বলিয়া রাখি। দশমীর দিন বিজয়োৎসব এখানকার অতি লোভনীয দৃশ্য। রাজা গোকুলদাসের ২৫।৩০ খানি ঘোটন গাড়ি এই সময়ে বাহির হয়। রামলীলারও ইহা শেষ দিন। এই দিনে রাজা গোকুলদাসের সাত মহলওয়ালা বাড়ীর সম্মুখের সরোবর তীরে মহাসমারোহ। একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, বাঙ্গালীদের দেখাদেখি হিন্দুস্থানীরাও দুর্গোৎসব করে। সকলেই যে প্রতিমা নির্ম্মাণ করে, তাহা নহে ইহাদের অধিকাংশই পটের মত চিত্র করিয়া মহিষমর্দ্দিণী মূর্ত্তি অঙ্কিত করে। পূজার ধুমধাম নাই। রাস্তার ধারে অস্থায়ী কুটীরে পূজার ব্যবস্থা। তারপর বিসর্জ্জন জাঁকজমক। অনেকে বিসর্জ্জন করে—আবার অনেকে পুষ্করিণির চতুঃপার্শ্বস্থ রাজপথে প্রতিমা লইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া যায়। তাহার উপর রামলীলার আনন্দ। রামের বানর কটক, রাবণ বধান্তে ফিরিয়া আসিতেছে। নানাবিধ মুখোস্ পরা বানর মূর্ত্তি সেই বড় বড় ফিটনে চড়িয়া পুষ্করিণীর চারি পাশের রাস্তায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। জনতাও খুব।

পরদিন প্রভাতে আমরা নর্ম্মদা প্রপাত দেখিতে যাত্রা করিলাম। ভোর ছয়টার সময় বাহির হইয়া বেলা নয়ঘটিকায় আমরা ভৃগুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। সম্মুখেই পঞ্চবটী পাহাড়। গাড়ী হইতে নামিয়াই পর্ব্বতের বিরাট দৃশ্যে মোহিত হইয়া পড়িলাম। যেন এক অজানিত রাজ্যে আসিয়াছি। এখানে যেন জরামরণ নাই, শোকতাপ নাই, হিংসা দ্বেষ নাই—এই বোধহইল। প্রকৃতির ন্যায় উদার হৃদয়া মাতা যেন বাৎসল্য স্নেহে পরিপ্লুত হইয়া সুন্দরবেশে মাতৃমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদের সম্বর্দ্ধনার্থে দেখা দিলেন।—

ক্রমশঃ—

কঙ্কণ চোর।

(গল্প)

মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে আজ মহা হুলস্থূল। রাজ্য সরগরম, রাজা সরগরম, রাজপথে হুলস্থুল। রাজ-অন্তঃপুরে মহা গণ্ডগোল। সকলেরই মনে আতঙ্ক। সকলেরই মনে ভয়। দাসী মহলে একটা মহা ত্রাশ।

---

* ঠগদিগের নিয়মিত দল ছিল। প্রত্যেক দলের একজন দলপতি থাকিত। পথিকের সঙ্গ লইবার সময়, প্রয়োজন মত তাহারা ভদ্র অভদ্র নানাবিধ বেশ ধারণ করিত। কতকগুলি সাংকেতিক শব্দ তাহাদের ঘৃণিত কার্য্যের পূর্ব্ব সূচনা স্বরূপ ছিল। 'চিলিয়া মাজলা' অর্থাৎ পাত্র মাজিয়া আন ইত্যাদি বাক্যে হতভাগ্য পথিকের কোন সন্দেহই হইত না—অতি সহজেই শিকার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে পারিত।—

না জানি কার অদৃষ্টে কখন কি ঘটে! রাজবাড়ীর চাকরী—কথায় কথায় মাথা যায়।

সহর কোতোয়াল পূর্ব্ব রাত্রিতে বিনিদ্র নেত্রে কাটাইয়াছে। রাজপুরীর প্রধান রক্ষক গজাধরলাল, তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা মানিয়া ঘূর্ণিত নেত্রে, পুরীর প্রহরীদের উপর মহা তম্বি করিতেছে। রাজপথে পথিকেরা কাণে কাণে কথাটা আন্দোলন করিতেছে, নগরীর অন্দরমহলে যুবতীরা চোক্ ঠারিয়া, বৃদ্ধারা মুখ বাঁকাইয়া, কথাটা নানা ছন্দে আলোচনা যে করে নাই এরূপ নহে। পুরুষেরা একটু চাপা। কথাটা তাহাদের মনের মধ্যেই লুকাইয়া লুকাইয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় তেজ সঞ্চয় করিতেছিল।

ব্যাপারটা কি খুলিয়াই বল না কেন? না বলিলে কেন এত হুলস্থুল তাহা ত বুঝা যাইবে না। রাজার প্রধানা মহিষী মুরলার হাতের রত্নখচিত সুবর্ণ কঙ্কণ চুরী গিয়াছে পূর্ব্ব রাত্রে রাণী কঙ্কণ হাতে দিয়া সোণার পালঙ্কে শুইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিদ্রিতাবস্থাতে কেমন করিয়া অমন সুরক্ষিত, প্রহরী বেষ্টিত পুরীর অন্দরের নিভৃত কক্ষ হইতে, রাণী মার গা হইতে, অলঙ্কার চুরী গেল—কেহই ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

যে রাত্রে কঙ্কণ চুরি যায়, সে রাত্রে রাণীর কক্ষে সোহাগী বলিয়া এক দাসী শয়ন করিয়াছিল। রাজা সে দিন নগর প্রান্তে 'বিলাসকাননে" ছিলেন, সেখানে একটা রাজকার্য্যের গোলযোগে রাত্রি অনেক হইয়া যায়। রাজা মহলে ফিরিতে পারেন নাই।

অতি প্রভাতে মহারাজা মহানন্দে বিলাস কানন হইতে ফিরিয়া পাটরাণী মুরলার গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, রাণী তখনও নিদ্রিতা। সেই সোণার পালঙ্কে রূপভরা দেহখানি বত্নখচিত বহুমূল্য নীল কৌষেয় বসনে আবরিত করিয়া মগধের রাজরাজেশ্বরী নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছেন। সেই সুকৃষ্ণ কেশজাল উপাধানের উপর এলাইয়া পড়িয়াছে। কবরী খুলিয়া গিয়াছে। কবরী-প্রোথিত রত্নময় ফুলগুলি শয্যার দুই পার্শ্বে খুলিয়া পড়িয়াছে, সেই সান্ধ্য তাম্বূলরাগরেখাময় ফুল্লাধরে তখনও হাসির ক্ষীণ রেখা মুছে নাই। সেই সূক্ষ্ম কজ্জল রেখাঙ্কিত চক্ষু তখনও নিদ্রার মোহময় মন্ত্র শক্তির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই।

কি সুন্দর! মগধের পাটরাণী মুরলা সুন্দরী কি সুন্দর! রাজা এরূপ ত অনেক বার দেখিয়াছেন—কই! কখনও ত ইহাকে অত সুন্দর দেখেন নাই।

প্রমোদ কাননে বসন্ত মুখরিত, পিক কুহরিত, মুকুল বিলম্বিত, প্রসূন বিকশিত কুঞ্জে যখন চাঁদের আলোয় মর্ম্মরের বেদিতে বসিয়া মহারাজ মহারাণীর মাথায় পুষ্প স্তবক গুঁজিয়া দিয়াছিলেন, সেদিনও মুরলা রাণীকে এত সুন্দর দেখায় নাই। আর এক দিন দুর্গের উন্নত প্রকোষ্ঠের উপর—আর এক চাঁদিনী রাত্রে, অঞ্জলি ভরা ফুল লইয়া দুই জনে নীচে গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিতেছিলেন। রাজার ফুলগুলা স্রোতের সঙ্গে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিল। রাণীর ফুল-গুলি তটের নিকট এদিক ওদিক ভাসিতে ছিল। রাজা রহস্য করিয়া বলিলেন—মুরলা, তোমার ফুল ভাসিয়া যাইতেছে না কেন? রাণী বলিলেন—পুরুষের প্রেম অতি লঘু! আমাদের প্রেম মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ভারি। যাহা লঘু তাহা ভাসিয়া যায়—যাহা ভারি তাহা চিরকালই গুরুত্বে পূর্ণ। রাজা সেই প্রকোষ্ঠের উপর বসিয়া—চন্দ্রালোকিত রাত্রে—রাণীর কথায় প্রেমোন্মত্ত হইয়া তাহার গণ্ডে চুম্বন করিলেন।

ঠিক সেই সময়ে কোকিল ডাকিয়া ছিল, চাঁদ সেই সময়ে মেঘের ভিতর ঢুকিয়াছিল। রাণী বলিলেন, "ছি, মহারাজ! আপনার কি লজ্জা করে না? এই বসন্ত দূত কোকিল—ঐ আকাশের চাঁদ—এই চুম্বন রেখা দেখিয়া আমায় কত লজ্জা দিতেছে।'

তখনকার সেই লজ্জারাগরঞ্জিত মুখের জ্যোৎস্না ভাসিত সৌন্দর্য্যও রাজার মনে জাগিয়া উঠিল। সে অনেক দিনের স্মৃতি। দিন পুরাতন হয়—স্মৃতি পুরাতন হয় না। রাজা মনে মনে ভাবিলেন—সেদিনও, সেই যৌবনের প্রথম বিকাশে তাহার মুরলাকে এত সুন্দর দেখায় নাই।—

মোহ এমনই জিনিষ বটে! মায়ার দূতী ছলনায় পরিপূর্ণ। কখন মানবের মন অধিকার করিয়া বসে বলা যায় না। তা রাজাই কি, আর দরিদ্রই কি।

রাজা দেখিলেন—রাণী জাগিয়া উঠিতেছেন। বন্দীরা নহবৎখানায় ভৈরবীর সুর জাগাইয়া রাণীর স্বপ্ন রাজ্যটা ছারখার করিয়া দিয়াছে। রাণী জাগিয়াছেন।

সেই পদ্মনেত্র উন্মিলিত হইল। রাণী দেখিলেন সম্মুখে

দাঁড়াইয়া রাজ্যেশ্বর! একটু যেন অভিমান হইল। একটু যেন রাগ হইল। কাল রাত্রে কোথায় ছিলেন; সেই জন্য অভিমান! রাজকার্য্য কি এতই বড়!

রাজা হাসিয়া ডাকিলেন—"মুরলা!" মান, মেঘের মত ভাসিয়া গেল। অস্তগামী সূর্য্যের চঞ্চল কিরণরেখার মত সরিয়া গেল। মুরলা বলিল—"কেন মহারাজ!" রাজা বলিলেন—"রাগ করিও না। আর আমি বিলাস কাননে যাইব না। তুমি অত সুন্দর! আমার ভ্রম ভাঙ্গিয়াছে।"

মুরলা উঠিয়া গেল। পার্শ্বের ঘরে কর্পূরবাসিত সুশীতল জল, স্বর্ণ-ভিঙ্গারে পুরিয়া দাসী দাঁড়াইয়াছিল। মুরলা মুখ প্রক্ষালন করিয়া, কবরী বাঁধিয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া মহারাজের সম্মুখে আসিল।

সৌন্দর্য্যের মোহ শীঘ্র যায় না। কারই বা গিয়াছে! লোকে আজীবন হয়ত তাহার চোখে লাগা একই সৌন্দর্য্য ধ্যান করিয়া চিতায় শুইয়াছে—তবু তাহার বাসনা পূর্ণ হয় নাই! সংসারে তাহার হয়তঃ স্ত্রী পুত্র সবই ছিল, সবই হইয়াছিল, কিন্তু যে সৌন্দর্য্য তাহার মনে অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার গুপ্ত চিন্তায় সে প্রাণের নিভৃতকন্দরে যেন একটা স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিয়া আসিয়াছে।

মহারাজ মহানন্দ হাসি মুখে ডাকিলেন—'মুরলা!'

মুরলা বলিল—'কেন মহারাজ!' মহারাজা বলিলেন 'মুরলা! তুমি কত সুন্দর'! মুরলা বলিল—'যিনি সমগ্র মগধের অধীশ্বর, শত সহস্র সুন্দরী যাঁহার চরণতলে লুটাইবার জন্য লোলুপ, তাঁহার সৌন্দর্য্য-ভোগ-লিপ্সার এত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা কেন?'

রাজা কোন উত্তর করিলেন না। মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার বোধ হইল—যদি জগতে সুন্দর কিছু থাকে—তবে সে মুরলা! যদি জগতে দেখিবার কিছু থাকে—তবে সে মুরলা। যদি জগতের আকাঙ্ক্ষার কিছু থাকে—তবে সে মুরলা! যদি জগতে ভোগের কিছু থাকে—তবে সে তাঁহার বিবাহিত মহিষী মুরলা।

দীপ নিভিবার আগে জ্বলিয়া উঠে। মহারাজের প্রেম-বহ্নিতে মুরলার রূপ আজ শেষ আহুতি হইল। আগুণ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মহারাজ দেখিলেন—মুরলা বিশ্ব ব্যাপিয়া আছে। প্রকৃতি-পটে মুরলার সুন্দর মূর্ত্তির সারাংশ অঙ্কিত। কোকিল-কূজনে মুরলার কণ্ঠস্বর অনুকৃত। নদীর কলকলনাদী তরঙ্গে, মুরলার প্রেমোচ্ছ্বাস প্রবাহিত। পর্ব্বতের উচ্চতার ও মহৎ ভাবের সঙ্গে মুরলার প্রেমের শ্রেষ্ঠভাব যেন বিজড়িত। অতবড় মগধেশ্বর মুরলার সৌন্দর্য্যে ভুলিয়া—চিত্ত বিকারের উন্মাদিনীশক্তিতে ভাবিলেন—জগৎ মুরলাময়! বাহ্য প্রকৃতি মুরলাময়! তাঁহার হৃদয় মুরলাময়! হায়, মগধের সিংহাসন! ছার রাজ্য! আর ছার সেই পিশাচী মুরলার কাছে সে?

কে সে পিশাচী—কে সে মুরলার তুলনায় অত নীচে নামিয়া পড়িল, তাহারা পরিচয় পাঠক পরে পাইবেন।

কিন্তু এ পোড়া জগতে কিছুই যেন চিরস্থায়ী নয়! চিরস্থায়িত্বের সম্বন্ধে, মর জগতের সকল জিনিসে যেন একটা অভিশাপ লাগিয়া আছে। ফুলরূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ লইয়া চিরস্থায়ী হয় না। কোরক বিকশিত হয়—সুবাস বিলায়, প্রস্ফুটিত হয়, কিন্তু ঝরিয়া পড়ে। মানুষ, সেত আরও বিনশ্বর। আজ যাহাকে দেখিতেছি—সে কাল আর নাই, চিতাভস্মে তাহার পরিসমাপ্তি; প্রবল তরঙ্গে নদীর দুকূল ভাঙ্গে, কতশত নগরীর সৌন্দর্য্য লোপ করে। তাহার শীতল গর্ভে কত লোক ডুবিয়া মরে। কিন্তু সেই নদী যখন ক্ষীণকায়া হইয়া মজিয়া যায় এবং যদি তাহার বুকের উপর কালের রেখাপাত হয়, চর পড়ে, তখন কত শোভাময়ী নগরী তাহার লুপ্ত-সলিলগর্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।—এ জগতে তবে থাকে কি? কিছুই নয়! হায় রে দুর্ব্বোধ্য নশ্বর প্রহেলিকা!

মহারাজ মহানন্দ, সৌন্দর্য্যভরা চখে—সেই বিমল প্রভাতে—প্রাণ ভরিয়া মহারাণীকে আলিঙ্গন করিলেন, ছি! ছি! আমাদের বলিতেও যে লজ্জা হয়! সে আলিঙ্গনে যেন প্রেমের স্থির নিথর সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। কত আদরের সম্বোধন, সম্ভাষণ, আলাপন, আপ্যায়ন—মধুর কথা যেন—সেই স্নেহবিপ্লুতকণ্ঠে বাধিয়া যাইতে লাগিল। মহারাজা মুরলার দক্ষিণ হস্তখানি ধরিয়া আদরের সহিত বলিলেন—'মুরলা! আমি তোমারই! এ মুকুট—এ রাজ-দর্প, এ অতুল ঐশ্বর্য্য, সম্মান, প্রতাপ সবই আজ তোমার চরণে বিক্রয় করিলাম, এতদিন তোমায় চিনি নাই, তোমার মর্ম্ম বুঝি নাই—আজ তোমায় চিনিয়াছি। তুমি আমার সর্ব্বস্ব।'

দক্ষিণ হস্তের কোমল স্পর্শে যেন আশা মিটিল না।

মগধেশ্বর সানন্দে মুরলার বাম হস্তখানি ধরিয়া চুম্বন করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি বাম হস্তের উপর পড়িল। কি ভাবিয়া—সেই সমাদরে-চুম্বিত হস্ত সবেগে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। সেই নিক্ষেপ-ভঙ্গিতে যেন কত অবজ্ঞা, কত অনাদর, মুখ ভঙ্গী প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

মহারাজা—শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার মুখ মলিন হইয়া গেল! অত আদরের সম্বোধন! অত উদ্ভ্রান্ত রূপোন্মাদ, অত প্রেমালাপ, যেন কোথায় মুহূর্ত্ত মধ্যে ভাসিয়া গেল। রাজা কঠোর কণ্ঠে ডাকিলেন, "মহারাণি!" মুরলা—আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন।—মহারাজের কণ্ঠস্বর—সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত। তাহা হইতে যেন—স্নেহ ঝরিয়া গিয়াছে—প্রেম শুকাইয়াছে—আদর লোপ হইয়াছে—সোহাগ ভস্মীভূত হইয়াছে, মহারাণী মুরলা বিস্ময়ান্বিত চিত্তে—মগধেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কেন মহারাজ!"

রাজা—বিজড়িত স্বরে উত্তর করিলেন—'তোমার বাম হস্তের স্বর্ণ কঙ্কণ কোথায়?' মুরলা রাণী সচকিতে—বাম হস্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন কঙ্কণ স্থানচ্যুত। তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস—তিনি হাত হইতে কঙ্কণ খুলিয়া রাখেন নাই।—কি সর্ব্বনাশ! বাম হাত হইতে কঙ্কণ খুলিয়া লইল কে?

রাজা বলিলেন 'মুরলা! কঙ্কণের সম্বন্ধে আমি তোমায় বরাবরই সাবধান করিয়া দিয়াছি। তোমায় যে দিন পত্নীরূপে অগ্নিসাক্ষী করিয়া গ্রহণ করি—সে দিনই তোমায় সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম।—কিন্তু তুমি আজ অসাবধানতায় কেবল আমার নয়—তোমারও সর্ব্বনাশ করিয়াছ।"

মুরলার মুখ মলিন হইল। মুরলা কাতর ভাবে অশ্রু প্লাবিত নেত্রে করযোড়ে বলিল—'সাবধানই করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজ্যেশ্বর! কই কখনও ত সাবধানতার কারণ বলিয়া দেন নাই।"

রাজা বলিলেন—'শুন মুরলা! তোমায় বিবাহ করিবার সময়—আমায় গুরুদেব গণনা করিয়া বলেন, এই নারীর সহিত তোমার সম্মিলন শুভকর নহে। সুলক্ষণা হইলেও ইহা হইতে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে। আমি তখন—নবীন যৌবনে তোমার সৌন্দর্য্যে মোহিত। তুমি রাজকন্যা, পরমা সুন্দরী। চিত্রে তোমার রূপ দেখিয়া আমি মোহিত হই। গুরুদেবের কথায় সংকল্প পরিবর্ত্তন করিতে পারি নাই।"

"গুরুদেব আমায় বলিয়াছিলেন—মন্ত্রপূতঃ স্বর্ণে মুরলার বাম হস্তের কঙ্কণ প্রস্তুত করিয়া দিব। সেই কঙ্কণ নিজ হস্তে পরাইয়া দিও। সাবধান—এই কঙ্কণ যেন কখনও না হারায়—বা চুরী না যায়।'

"আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "গুরুদেব! যদি ঘটনাবশে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটে, তাহার পরিণাম কি? "গুরুদেব বলিয়াছিলেন—"মহারাজ! এ ঘটনার পরিণাম বড় ভাল নয়। ইহাতে তোমার রাজত্বলোপ—মৃত্যু।—কেবল তোমার অনিষ্ট নয়—মুরলাও এ ঘটনায় মরিবে।"

"মুরলা—সেই মন্ত্রপূত কঙ্কণ আজ তুমি হারাইয়াছ। এখন বুঝিলে ইহার পরিণাম কি? যে অলক্ষ্য শক্তি ভবিষ্যতে এই সব ভীষণ ঘটনা নিচয়ের সৃষ্টি করিবে—তাহার কার্য্যপথ আমরা অবগত নহি। কিন্তু আমার গুরুদেব স্বয়ং সিদ্ধ, প্রজ্ঞাবান্। তাঁহার প্রত্যক্ষদর্শনে আমার অবিশ্বাস নাই। বরঞ্চ বিশ্বাসের অনেক কারণ আছে। আজ তুমি আমার, তোমার ও এই বিশাল রাজ্যের সর্ব্বনাশ করিলে।"

মুরলা কাঁপিতে কাঁপিতে মহারাজের পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে পদতল ধরিয়া বলিল—"মহারাজ! এ বিঘ্ন-প্রতিকারের উপায় কি? কে আমার এ সর্ব্বনাশ করিল?"

মগধেশ্বর মুরলার এ কাতর প্রশ্নের কোন উত্তর করিলেন না। জ্যোতিষের ভবিষ্যৎ মীমাংসায়, গুরু-কথিত আদেশবাণীতে তাঁহার মন তখন আন্দোলিত। তিনি তখন আত্ম-অনিষ্ট চিন্তায় উন্মাদ!

রাজা বিদ্যুৎবেগে মহারাণী মুরলাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া—দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

অন্তঃপুরে রত্নময় প্রকোষ্ঠে সেই রত্নগৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, রাণী মুরলা—তাঁহার চক্ষে ডুবিয়া গেল। সেই সৌন্দর্য্যমোহ—যেন ছায়াবাজির চিত্রের ন্যায় উড়িয়া গেল।

মহারাজ মনে মনে বলিলেন—"মুরলা, সর্ব্বনাশী সে নিজে মরিল—আমাকেও মারিল।"

মহারাজ মহানন্দ তৎক্ষণাৎ গুপ্তপ্রকোষ্ঠে এক ক্ষুদ্র

সভা আহ্বান করিলেন। সভায় রহিলেন—পক্ককেশ বৃদ্ধ মন্ত্রী—সহরের প্রধান কোতয়াল—প্রধান প্রাড়্‌বিবাক—প্রধান ধর্ম্মাধিকার ও রাজপুরীর প্রধান প্রহরী। সকলেই উচ্চপদস্থ, সম্মানিত, উচ্চ বেতনভোগী। কিন্তু মহারাজের মুখ দেখিয়া—মুখের বিকৃত ভাব দেখিয়া—তাহাদের প্রাণ উড়িল। যুদ্ধ বিগ্রহ বা রাজ্যের আশু অনিষ্টকারক কোন ঘটনার আবির্ভাবে গুপ্তকক্ষে এই রাজসভা আহূত হইত।

প্রধান মন্ত্রী রাজকার্য্যে চুল পাকাইয়াছে। তিনি অনেক দিন রাজ সংসারের নিমকভোজী। রাজার যৌবনেও তিনি বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি শুষ্ক মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইয়াছে মহারাজ ?"

রাজা বিকৃতকণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মহারাণী মুরলার হাত হইতে কে কঙ্কণ অপহরণ করিয়া লইয়াছে! মন্ত্রী তুমি জান—এ কঙ্কণ সম্বন্ধে গুরুদেব কি আদেশ করিয়াছিলেন ? রাজপুরীতে মহারাণীর কক্ষের অত পাহারার মধ্যে চুরি হইল, আমার ভবিষ্যৎ-সর্ব্বনাশ সূচিত হইল। এমন অকর্ম্মণ্য বিশ্বাসঘাতক পুরীরক্ষকদের আমি শূলে চড়াইতে চাই।"

রাজার কথায় সকলেই কাঁপিয়া উঠিলেন। রাজার প্রকৃতি সকলেই জানিতেন। তাঁহার আদেশ কখনও ব্যর্থ হয় নাই। মগধের সমস্ত প্রজা তাঁহার ভীষণ ভ্রূকুটিতে ভয় পাইত। মহারাজ মহানন্দের ক্রোধের মুখে কাহারও পরিত্রাণ নাই।

মন্ত্রী বলিলেন—"মহারাজ! আমাদের সময় দিন—কোতয়ালের উপর আদেশ প্রচার করুন। আমরা অপহৃত কঙ্কণের সন্ধান করিয়া দিব। মহারাজা মহানন্দ বলিলেন, "আমি পূর্ণ এক দিন সময় দিলাম। গতরাত্রে কঙ্কণ চুরি গিয়াছে।—আজ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সময়,—ইহার মধ্যে যদি আমি অপহৃত কঙ্কণ ফিরিয়া না পাই—তবে সকলেরই পরিণাম আমার ন্যায় অশুভ।" তখন সভাভঙ্গ হইল।

সেই অশুভ দিনে যেন আকাশের উজ্জ্বল দেবতা লোকলোচন—দিবাকর অতিশীঘ্র আকাশ হইতে সরিয়া পড়িলেন। সমস্ত দিনের অনুসন্ধানেও কোন ফল হইল না।. প্রণিধিনিয়োগেও কোন সন্ধান হইল না।

তাই সে দিন নগরে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। প্রথম পরিচ্ছেদে যে ঘটনা বিবৃত করিয়াছি—তাহার কারণ এই যে, সেদিনে চোরের কোন অনুসন্ধান হয় নাই।—

রজনী গভীরা। চিন্তান্বিত চিত্তে রাজ্যের প্রধান প্রাড়বিবাক নিজের ও সকলের অদৃষ্ট চিন্তা করিতেছেন, রাজ্যের ভবিষ্যৎ শুভাশুভের অনুমান করিতেছেন, এমন সময়ে এক গুপ্ত প্রণিধি তাঁহাকে একখানি পত্র দিয়া গেল। তিনি পত্রোন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন, তাহাতে লেখা আছে—"কঙ্কণ চুরির সন্ধান করা আপনাদের কর্ম্ম নহে। আপনারা প্রাণের চিন্তায় কাতর। চোর কাল নিজে রাজসভায় উপস্থিত হইবে।"

প্রাড়্‌বিবাক মহাশয়—আসন ত্যাগ করিয়া সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যে প্রণিধি এই পত্র আনিয়াছিল তাহাকে বলিলেন—"এ পত্র—তুমি কোথায় পাইলে? কে তোমায় দিল ?"

প্রণিধি বলিল—"মহাভাগ। মহাকালের মন্দিরবাসিনী শৈব সন্ন্যাসিনী আমায় এই পত্র দিয়াছেন। তিনি কোথায় এ পত্র পাইলেন—এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা আমি যুক্তিযুক্ত ভাবিনাই। তিনি খালি বলিয়া দিয়াছিলেন "এ পত্র তোমাদের প্রধান প্রাড়্‌বিবাক মহাশয়কে দিও।"

প্রাড়্‌বিবাক মহাশয় রাজকার্য্যে চুলগুলি শুক্ল করিয়াছেন। হঠিবার পাত্র নহেন। তিনি এই পত্রের রহস্যভেদে কৃতসংকল্প হইলেন। প্রণিধিকে বলিলেন—"এ পত্র যে দিয়াছে তাহার সন্ধান করিতে হইবে। তোমাকে আমার সঙ্গে সন্ন্যাসিনীর কাছে যাইতে হইবে।"

সেই গভীর রাত্রে প্রধান ধর্ম্মাধিকার ও প্রণিধি দুই জনে পাটলীপুত্রের রাজপথ অতিক্রম করিয়া মহাকালের মন্দিরে পৌছিলেন। মন্দিরদ্বার তখনও রুদ্ধ হয় নাই। সেই শৃঙ্খললম্বিত কাংস্য দীপাধারে তখনও ঘৃতসিক্ত বর্ত্তিকা সেই প্রস্তর মন্দিরকে আলোকিত করিতেছিল। মন্দিরবাসিনী সন্ন্যাসিনী সে সময় অজিন বিস্তৃত করিয়া নিবিষ্ট চিত্তে ভজন গাহিতেছিলেন।

প্রাড়্‌বিবাকের সহিত সন্ন্যাসিনীর পরিচয় ছিল। সন্ন্যাসিনী তাঁহাকে বসিতে আদেশ করিয়া বলিলেন "বুঝিয়াছি ধর্ম্মাধিকার! কেন এ রাত্রে আসিয়াছ? সেই পত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে, কেমন ?"

প্রাড়্বিবাক বলিলেন—"মা! আপনি সর্ব্বান্তর্যামী। এই পাটলিপুত্রের বিঘ্নবিনাশক মহাকালের সেবিকা। রাজ্যের বড় বিপদ উপস্থিত। মহারাজ উন্মাদপ্রায়। মহারাণী দিন রাত কাঁদিতেছেন। কাল প্রাতে সভা আহূত হইবে। যদি চোর ধরা না পড়ে, তাহা হইলে আমাদের রাজকোপ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইবে না। সকলেরই মাথা যাইবে।"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন—"মহারাণী মুরলার কঙ্কণচুরির কথা আমি শুনিয়াছি। তাহাতে যে অনিষ্ট-সম্ভাবনা তাহাও জানি। যে ব্যক্তি আমায় পত্র দিয়া গিয়াছে, তাহার নাম জানিলেও করিব না। বিশ্বাসহন্ত্রী হইব না।"

প্রাড়্বিবাক মাথার উষ্ণীষ খুলিয়া সন্ন্যাসিনীর পদপ্রান্তে রাখিলেন—বলিলেন "মা! চোর নিজে উপস্থিত হইবে বলিয়াছে। কথাটায় বিশ্বাস অবিশ্বাস দুইই হয়। চোর যে কেবল লোভে পড়িয়া চুরি করিয়াছে তাহা নহে! ইহার মধ্যে আরও কোন রহস্য নিহিত আছে। তাহা না হইলে সে ইচ্ছা করিয়া ধরা দিবে কেন? আপনি তাহার নাম বলিয়া দিন্। তাহাকে ধরিতে পারিলে বাহাদুরী আছে। সে নিজে ধরা দিলে আমাদের অকৃতিত্ব প্রমাণিত হইবে। জন্মের মত রাজার কাছে, রাজ্যের কাছে, সুনাম ডুবিবে! বলেন কি? মহারাণীর অন্তঃপুরের মধ্য হইতে, তাঁহার গাত্র হইতে অলঙ্কার চুরি! তাও পুরুষ চোর!!"

সন্ন্যাসিনী কি ভাবিয়া বলিলেন—"তা সত্য! কিন্তু তোমাদের মানরক্ষার জন্য আমি বিশ্বাসঘাতিনী হই কেন? তোমাদের সাধ্য থাকে—তাহাকে ধরিবার চেষ্টা কর।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতায় স্বদেশীয় শিল্প প্রদর্শনী।

এবার কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের সহিত একটী পরম শুভকর নব অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছে;—সে'টি ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনী। এই মহামেলায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নানা জাতীয় উৎকৃষ্ট শিল্পের সমাবেশ হইয়াছিল। অতি অল্প দিনের ঘোষণায় ইহাতে যেরূপ ভূরি পরিমাণ দ্রব্যের আমদানী হইয়াছিল, উপযুক্ত সময়ের উদ্যোগ যে ইহার সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতার সহায়তা করিত, তাহাতে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। যে দিন মেলায় প্রথম যাই, সেদিনও কংগ্রেসের অধিবেশন চলিতেছিল। দূর হইতে সঘন করতালিধ্বনি ও অবিশ্রাম হর্ষনিনাদ, মহাসভার আনন্দ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা বহিয়া আনিতেছিল; এদিকে মেলার দর্শকবৃন্দের বিস্ময়সঞ্জাত অস্ফুট আনন্দোচ্ছ্বাস বহিঃস্থ জনতার কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিতেছিল। যেমনই শিল্পমণ্ডপে প্রবেশ করিলাম—যেমনই চিরহাস্যময়ী শিল্পলক্ষ্মীর চরণতলে উপস্থিত হইলাম, অমনই সমস্ত চাঞ্চল্য ও সকল কোলাহল ভুলাইয়া তাঁহার সেই নব আশাদৃপ্ত নব গৌরবোদ্ভাসিত রমণীয় কমনীয় মূর্ত্তিখানি মানস পটে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এই বিস্ময়-বিগলিত আনন্দ, পুলকিত ভক্ত-দর্শকের হৃদয় উচ্ছ্বাসিত করিয়া প্রতিধ্বনিত হইল,—"জয় জয়, তব জয় হে"।

উৎসাহ উল্লাসে প্রদর্শনী প্রদক্ষিণ করিলাম। এত বিভিন্ন বিচিত্র মনোরম স্বদেশী দ্রব্যের একূপ সুবৃহৎ একত্রীকরণ আর কখনও হইয়াছে বলিয়া জানি না। যে দিকে যাই, কেবল শৃঙ্খলা ও শোভা। দেশীয় শিল্পীর গুণপণা দেখিয়া সকলকেই অবাক্ হইতে হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে বিলাসের বিবিধ উপকরণ ত ছিলই, তা ছাড়া নিত্য ব্যবহার্য্য বহুবিধ জিনিশ প্রদর্শিত হইয়াছিল। নির্ম্মাণ-নৈপুণ্যে অনেক দ্রব্য এমনই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে, অতিবড় বিলাসী হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্র গৃহস্থকেও স্বীকার করিতে হইয়াছিল—বাহ্যিক চাক্‌চিক্য অথবা কার্য্যকারীতার হিসাবে বিলাতি দ্রব্য অপেক্ষা সে গুলি কোনও অংশেই ন্যূন নহে। তবে যাঁহারা "ইস্তক বিলাতি জুতা, লাগায়েদ্ বিলাতি কুকুর" ভাল বাসিয়া থাকেন এবং উঁহাদিগকেই রুচির সিংহাসনে বসাইয়া ষোড়শোপচারে পূজা দিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগের কথা অবশ্যই স্বতন্ত্র। এই নূতন সভ্যতাগর্ব্বিত বিলাসপ্লাবিত দেশে যে বাহ্যিক চাক্‌চিক্য ঘটার খাতিরে দ্রব্যাদির গঠন প্রণালীর সংস্কার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে—হালের অনেক চতুর শিল্পী একথাটা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন, এবারের মেলার প্রদর্শিত পণ্যগুলিই তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ। নিত্য ব্যবহার্য্য অনেকগুলি পর্য্যন্তও এ দেশে এমন নৈপুণ্যের সহিত প্রস্তুত হইতে পারে, এই মেলা দেখার পূর্ব্বে, অন্ততঃ আমার ত সে ধারণা

ছিল না। পরের বিষয় লইয়া আমরা এতই ব্যাপৃত যে, ঘরের সংবাদ রাখিবার অবকাশ আমাদের কম। একটা বিলাতি জিনিস দেখিয়া তাহার সমস্ত ইতিবৃত্ত ফস্ করিয়া এক নিঃশ্বাসে আওড়াইয়া দিতে পারি। এমন কি দ্রব্য বিশেষটীর জন্মভূমিতে ক'টা পাহাড়, ক'টা নদী, সেখানকার আবহাওয়া, চালচলন কিরূপ, তাহার খুঁটিনাটি খবরটি পর্য্যন্ত রাখিয়া থাকি। সুতরাং আমাদের অভিজ্ঞতার অপ্রশংসা করা যায় না!

এবার আমরা কেবলমাত্র স্বদেশী জিনিসের ধূলিমাটি ঝাড়িয়া উহাকে ভদ্রবেশ পরাইয়া শিল্পমণ্ডপে ছাড়িয়া দিয়াছি। এটি আমাদের উদ্যোগ-পর্ব্ব, এখনও আমাদের এ সম্পর্কিত অনেক দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যই অনারব্ধ রহিয়াছে। এবার আমরা স্বদেশী জিনিসের কতকগুলি মাজা-ঘষা নমুনা প্রদর্শন করিয়া দেশীয় কলা-কৌশলের প্রতি সাধারণের বিশ্বাস ও বিস্ময় আকর্ষণ করিয়াছি মাত্র; যাহাতে এই শ্রদ্ধার ভাবটি সাধারণের মনে দৃঢ় মুদ্রিত হয় ও চিরস্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা করিতে বাকী আছে। আর করিবার আছে—জিনিস গুলি যাহাতে সহজ ও সুলভে প্রাপ্য হয়, তাহার আদর্শগুলি অবলম্বনে ঐ সকল জিনিস বহুল পরিমাণে প্রস্তুত করাইয়া দেশময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতে হইবে; তাই বলি, কার্য্যের গুরুতর ভাগ এখনও অসমাপ্ত পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা সুসম্পন্ন করিতে হইলে সাময়িক উত্তেজনার পরেও কর্ম্মপথটিকে সর্ব্বদা সচঞ্চল রাখিতে হইবে; অনেক ঝঞ্ঝা, বজ্র, কড়কাপাত মস্তকে আশীর্ব্বাদের ন্যায় ধারণ করিতে হইবে; অনেক আবর্জ্জনা জঞ্জাল ঝাটাইয়া পথ পরিষ্কার করিয়া যাইতে হইবে। স্বীকার করি, উহা সময়সাপেক্ষ, তদপেক্ষাও আমাদের সমবেত যত্ন-সাপেক্ষ। দুই চারিটী উত্তেজক প্রবন্ধ রচনা বা উদ্দীপক বক্তৃতা দানে উহার একাংশের মাত্র সহায়তা করিতে পারে। চাই প্রচুর অর্থবল, বিপুল জনবল, কার্য্যে এক-নিষ্ঠতা ও অটুট অধ্যবসায় এবং সর্ব্বোপরি অসাধারণ স্বার্থত্যাগ। নহিলে যদি আমরা শুদ্ধ কয়েকটী বিদেশী বণিককে চম্কাইবার জন্য ঢাক ঢোল বাজাইয়া এই নব অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করিয়া থাকি, তবে উহার বিসর্জ্জনেরই সূচনা করিয়াছি বলিতে হইবে। কিন্তু আমরা বিস্ফোচিত ভ্রুকুঞ্চন অহঙ্কারে এ নব অনুষ্ঠান মাত্রকেই সন্দেহের চক্ষে দেখিতে প্রস্তুত নহি, তবে উৎসাহদৃপ্ত শুভ ব্যাপার গুলিকে অহেতুক উদ্বেগের দীর্ঘ নিশ্বাসে নিষ্প্রভ বা নির্ব্বাপিত করিতে ইচ্ছুক নই। বরং আশাপরায়ণ ও বিশ্বাসবান্ হইয়া অর্ব্বাচীন বলিয়া পরিচিত হইতে কিছুমাত্র ভীত বা লজ্জিত নহি। এই তরুণ অনুষ্ঠানে একদিন সুপরিণতি ও সমৃদ্ধির বলে আপনার মহৎ লক্ষ্যকে প্রাপ্ত হইয়া আপনাতে আপনি কৃতার্থ হইব, এ ভরসা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি। সেই "একদিন" দূরে বা বহুদূরে থাকুক, উহার অস্তিত্বে বিশ্বাস কল্পনায় জাগাইয়া রাখা ভাল। স্বীকার করি, সেই দূর দিনকে নিকটে আনয়ন করা বহু কালের ধৈর্য্য ও তপস্যার আবশ্যক; উহা আলস্যের মত সহজ অথবা পর-নিন্দার মত মুখরোচক নহে, তথাপি উহা আমাদিগেরই কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনীয়। "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতে কোঽত্র দোষঃ"—এই কবিবাক্য মানিতে হইবে। নহিলে ভবিষ্যতের ইতিহাসে এ যুগের ভারতবাসীর নামে কলঙ্কের কালিমাময় দাগ চিরমুদ্রিত হইয়া যাইবে।

এখন আমরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছি যে, অতীত গৌরবের জন্য কাঁদিয়া আমাদের অনেকটা সময় বাজে খরচ হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য জগৎ তাহার বর্ত্তমানটিকে বেশ গুছাইয়া তুলিতেছে, তাই প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে আমরা দিন দিন হঠিতেছি। শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধে এ কথাটা খুব বেশী খাটে। আমাদের অনেক ছিল, কে তাহা অস্বীকার করে? কিন্তু এবার যে প্রমাণ হইয়া গেল, আমাদের এখনও অনেক আছে, কেবল বর্ত্তমানের অযত্ন ও উপেক্ষায় তাহা ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছে, তাহার প্রতিকারে যথোপযুক্ত আয়োজন হইলে বুঝিব যে, আমরা কল্পনা ক্রন্দন ত্যাগ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছি।

ইচ্ছা ছিল, প্রদর্শিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যগুলির উল্লেখ করি, কিন্তু মাসিক পত্রের ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার স্থানাভাব। যাঁহারা বিস্তৃত বিবরণ চান—তাঁহারা সাময়িক পত্র খুঁজিলেই তাহা পাইবেন। কেবল একটি জিনিসের উল্লেখ করিতেছি। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত কেলকার মহাশয়ের নবোদ্ভাবিত তাঁতযন্ত্র সম্বন্ধে যে আলোচনা চলিতেছে, তাহা অনেকেই জানেন। সেই যন্ত্রটির আদর্শ এই মহামেলাতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। সে দিন ইহার কার্য্যকারীতারও পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। এই একটি মাত্র যন্ত্র দেশে চলিয়া

গেলে বস্ত্র বয়নের অনেকটা 'মজুরী' বাঁচিবে ; সুতরাং সেই অনুপাতে ব্যয়ও হ্রাস হইবে। এইরূপে এ দেশে বস্ত্র ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক হইয়া বিদেশী বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় টিকিয়া যাইবে। এখন এই আদর্শ অবলম্বনে রীতিমত কাজে খাটাইবার উপযোগী বস্ত্র তৈয়ার করা আবশ্যক। উহা ব্যয়সাধ্য। আশা হয়, কেলকার মহাশয়ের কার্য্যকরী প্রতিভার পুরস্কার কেবল গোটাকতক ফাঁকা অভিনন্দনেই পর্য্যবসিত হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে মুক্তহস্ততারও পরিচয় পাওয়া যাইবে।

প্রদর্শনীর ভবিষ্যৎ সাফল্যের একটি শুভ লক্ষণ, ধনী সম্প্রদায় স্বদেশের এই চরম ও পরমশুভকর অনুষ্ঠানে আগ্রহের সহিত যোগ দান করিয়াছেন এবার তাঁহারা শুধু দূর হইতে বিন্দু বিন্দু অনুকম্পা বৃষ্টি করেন নাই। মাতৃভূমি সন্তানের সেবাই চাহেন—অনুগ্রহকে কৃপার চক্ষে দেখেন।

এ দেশে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে এক দিকে যেমন উদ্ভাবনী প্রতিভা এবং অক্লান্ত কর্ম্মিষ্ঠতার প্রয়োজন, অন্য দিকে ধনবলের তেমনি আবশ্যক। দেশের ধনিগণ হস্ত প্রসারণ করিলে স্বদেশী মৃতপ্রায় শিল্পের পুনর্জীবন সঞ্চার সহজসাধ্য হইয়া উঠে। তাই এবার তাঁহারা স্বদেশী শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সাধারণের আশা-আনন্দ শ্রদ্ধামিশ্রিত কৃতজ্ঞতার জয়মাল্যে ভূষিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের নিকট আর একটী অনুরোধ, তাঁহারা যেন স্বদেশী পাইতে বিদেশী দ্রব্য ক্রয় না করেন। এ কথা বিশেষ ভাবে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিবার কারণ এই যে, মূল্যের তারতম্যজনিত অসুবিধা তাঁহারা অনায়াসেই উপেক্ষা করিতে পারেন। বলা বাহুল্য, সর্ব্বসাধারণের নিকটেও আমাদের এই প্রার্থনা। অবস্থাভেদে অনেকে হয়ত কোন কোন স্বদেশী ও বিদেশী দ্রব্যের মূল্য তুলনা করিয়া পশ্চাৎপদ হইতে পারেন ; কিন্তু যথাসম্ভব স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিয়া দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধনে সহায়তা করিব, এই বৃহৎ লক্ষ্য ও মহৎ সঙ্কল্প তাঁহাদিগকে স্বার্থত্যাগে উৎসাহিত করিবে, এরূপ আশা করা যায়। আশু ত্যাগস্বীকারে আমরা পরিণামে লাভবানই হইব, এ কথা সকলেরই মনে রাখা উচিত।

আর একটা কথা বলিলেই এ প্রবন্ধের শেষ হয়। এই শিল্প প্রদর্শনী ব্যাপারে রাজপুরুষগণের সংমিশ্রণ না দেখিয়া অনেকে হয় ত বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছেন, কিন্তু এজন্য রাজপুরুষগণের প্রতি অভিমান করা চলে না। রাজনীতি-চর্চ্চা-বিরহিত অনুষ্ঠান মাত্রেই যে গবর্ণমেণ্ট যোগ দিবেন এরূপ কোন বাঁধাবাধি নাই। আমরা কথায় কথায় যখন তখন গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইয়া আবেদন ও নিবেদনের বাহুল্যে রাজপুরুষদিগকে যেরূপ বিব্রত করিয়া তুলি, তাহাতে অনেক সময় অনেক আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুতর অনুষ্ঠানগুলি, তাঁহাদের নিকট শুধু 'হুজুগ' বলিয়া পরিগণিত হওয়া বিচিত্র নহে। দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্য আপাততঃ গভর্ণমেণ্টকে তেমন ভাবে জোর করিয়া ধরিবার দাবী আমাদের এখনও জন্মে নাই। কারণ, এখনও আমাদের আত্মনির্ভরশীলতার অগ্নি পরীক্ষা হইয়া যায় নাই। আমাদিগকে আত্মবলেই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে। শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি আপাততঃ আমাদিগের নিজের উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করে। আমাদের কার্য্যতায় যদি গভর্ণমেণ্টের প্রতীতি জন্মাইতে পারি যে, আমরা কায়মনোবাক্যে ও স্থির সঙ্কল্পে দুষ্প্রাপ্য রাজনৈতিক অধিকারের আকাঙ্ক্ষা এবং শাসননীতির বিরোধীভাবমাত্র বৰ্জ্জিত এই আত্মোন্নতির পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি, তাহা হইলে কোন না কোনও দিন অবশ্যই প্রজাহিত-ব্রত চালিত গবর্ণমেণ্টের প্রীতি-আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইব। নহিলে ইংরাজের ন্যায় আত্মনির্ভর পরায়ণ, আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন জাতির গবর্ণমেণ্টকে বালকোচিত ক্ষুদ্র আবদারে ভুলাইতে যাওয়া অথবা আপনাদিগের লজ্জাকর অসহায় অবস্থার কথা জলদগর্জ্জনে শুনাইয়া দিয়া বিচলিত করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা ও ধৃষ্টতার কার্য্য। এরূপ করিয়া আমরা দিন দিন ঘরে পরে সকলের বিদ্রূপ ও অশ্রদ্ধার প্রশ্রয় দিতেছি মাত্র।

সর্ব্বশেষ বক্তব্য, এই মহানগরে যাঁহাদিগের উদ্যোগে এই সুবৃহৎ শিল্প প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল, তাঁহারা আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহাদিগের নিকট নিবেদন, যাহাতে বর্ষে বর্ষে অধিকতম প্রসার ও ব্যাপ্তির সহিত এই প্রদর্শনীর আয়োজন হয়, যথা সময়ে যেন তাঁহারা সে পক্ষে উদ্যোগী হয়েন। বর্ত্তমানের অবসাদে ম্রিয়মাণ কলিকাতা দেখিয়া মনে হয় না, এখানেই কিছু

দিন পূর্ব্বে বিপুল সমারোহে ঐ মহামেলা বসিয়াছিল। সেই হর্ষমুখর শত সহস্র দর্শকের চিত্তমুগ্ধকর শিল্প মণ্ডপ এখন সকল শোভা ও সমৃদ্ধি হইতে বঞ্চিত হইয়া নিশ্চল দাঁড়াইয়া আছে।• কিন্তু সেই অদূর অতীতের স্মৃতি এখনও প্রাণে প্রাণে জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে। মনে হয়, বিগত ইংরাজিবর্ষের শেষে ভারতবর্ষের যে নব ভাগ্য সূচনা হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যৎ ইতিহাসের একটি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া সগৌরবে রাজত্ব করিবে। তাই বলিতে হয়, ইংরাজি ১৯০১ সাল সমস্ত ভারতবাসীর পক্ষে স্মরণীয় ও বরণীয় বৎসর।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

গাজি মিয়ার বস্তানি।*

গাজি মিঁয়ার বস্তানি একখানি বিচিত্র, সমাজচিত্র সুশোভিত সুলিখিত উপন্যাস। ইহাতে নাই, এমন রস দুর্লভ। কটু, তিক্ত, কষায়,—অম্ল, অম্লমধুর,—মধুর, অতি মধুর,—যাহা চাও, তাহাই প্রচুর। অথচ সকল রসের উপর দিয়া কাতর করুণরস উছলিয়া পড়িতেছে।

গ্রন্থকার স্পষ্টবাদী হইলে শ্রুতিকটুদোষ পরিহার করিতে পারেন না, স্পষ্ট কথা সত্য হইতে পারে, সকল স্থলে সুমিষ্ট হয় না। সুতরাং গাজি মিঁয়ার কথা স্থানে স্থানে বড়ই কড়া হইয়াছে। তিনি দৃঢ় মুষ্টিতে কশা ধারণ করিয়া যেখানে যাহার পৃষ্ঠে আঘাত করিয়াছেন, সেখানেই যেন সপাসপ্ আঘাতধ্বনি ফুটিয়া উঠিয়াছে, কাতরক্রন্দনের সঙ্গে রক্তধারা ছুটিয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে। সে আঘাত কাহার পৃষ্ঠে বা পতিত হয় নাই? পাঠক! হয়ত তুমি আমি আর তাহারা কেহই বাদ যাই নাই! এরূপ গ্রন্থের পরিচয় লওয়া আবশ্যক।

বড় দপ্তরের নাম বস্তা; ছোট দপ্তরের নাম বস্তানি। ভাগ্যে গাজি মিঁয়া একটি ছোট খাট বস্তানির সৃষ্টি করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। এই বস্তানি নাকি ২৪ নথীতে সম্পূর্ণ, তন্মধ্যে ২০ নথী আপাততঃ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা হইয়াছে,—তাহাই যথেষ্ট! ঘটনাগুলি উপন্যাসের ন্যায় বিস্ময়জনক হইলেও, সত্যের ন্যায় সরল; লিপি-কৌশলগুণে পাত্র পাত্রীগণের চরিত্র এমন পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে,—যেন চিনি চিনি করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশের ক্ষমতা জন্মিতে পারে।

চৌকিদার, কনেষ্টবল, দারোগা, ইনেস্‌পেকটার বাবু,—সব রেজিষ্ট্রার, সব ডেপুটী, ডেপুটী, মুন্সেফ,—শিক্ষক, গোপন শিক্ষক,—উকিল, মোক্তার জেলখানার ওয়ারডার, ও সরকারী ডাক্তার বাবু,—ইঁহাদিগকে না চিনেন মফঃস্বলে এমন বাঙ্গালী দুর্ল্লভ। সুদখোর মহাজন, কলহলিপ্সু জমিদার, ফিকিরবাজ নায়েব গোমস্তা, খড়িবাজ অমাত্যবর্গ,—ইহাদিগের সহিত পরিচয় নাই, মফঃস্বলে এমন কে আছেন? ইঁহাদিগকে মানুষ করিবার জন্য পিতামাতাও বিদ্যালয় যথেষ্ট করিয়াছে; তথাপি এখনও ইঁহাদের মধ্যে মানুষের মত মানুষ দুর্ল্লভ,—শতকরা মেকির প্রভাবই বুঝি বেশী। রাজধানীতে বা রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানে নানা কারণে ইঁহাদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হইতে পারে না; মফঃস্বলে ইঁহারাই কুঞ্জবিহঙ্গ, সুখ দুঃখের নিয়ামক, দেশের দশজন, দশজনের মধ্যে এক জন,গণ্য মান্য বরাত্য লোকে দুই হাত তুলিয়া ধন্য ধন্য করে! কিন্তু ইঁহারা কি চরিত্রের লোক, তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। আইন আদালত আছে, মানহানি ও ঘানিগাছ আছে, অন্ধকার পল্লী-পথের তরুবল্লী সমাচ্ছন্ন নিভৃত সঙ্কেতভূমি হইতে অকস্মাৎ মাথার উপর লাঠিয়ালের লাঠি পড়িবার সম্ভাবনা আছে। গাজি মিঁয়া ফকির—বস্তানিটি গঙ্গাযমুনার সংযোগক্ষেত্র মহাতীর্থ প্রয়াগের অতল সলিলে বিসর্জ্জন করিবার উপদেশ দিয়া নিরুদ্দেশ হইবার পর, প্রকাশক আদেশ লঙ্ঘন করিয়া ইহাকে জনসমাজে প্রকাশিত করিয়াছেন। বঙ্গ-সাহিত্যের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে ভাল কাগজ, ভাল ছাপা এবং ভাল বান্ধা, কাপড়ের মলাটে স্বর্ণাক্ষর—এখন গ্রন্থগৌরবের পরিচয় স্থল। সুতরাং দরিদ্রের পক্ষে বাঙ্গালায় গ্রন্থ প্রকাশ করা, আর প্রয়াগসলিলে পাণ্ডুলিপি বিসর্জ্জন করা, প্রায় এক কথা বলিলেও চলে।

উপন্যাসের নায়ক নায়িকা কিছুতেই মরে না, মরিলেও নিস্তার পায় না; একজনের কলমে যে মরিয়া যায়, আর একজন তাহাকে বাঁচাইয়া আবার উপন্যাস জুড়িয়া বসে। ইহা এক শ্রেণীর উপন্যাস। আর এক শ্রেণীর উপন্যাস আছে, যাহার নায়ক নায়িকা আগাগোড়া কেবল মরিবার জন্যই পাগল, ঐ মরিল,ঐ ডুবিল, ঐ বুকে ছুরি বসাইল, ঐ বুঝি গলায় দড়ি ঝুলাইল, হায়! হায়! ঐ বুঝি ফুরাইল,—সকলই ফুরাইল! কেহ ইহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না। ইহারা মরে—কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে মরে না। মরিবার সময়েও মনে হয়,—উপন্যাসের খাতিরে দায়ে ঠেকিয়া মরিতেছে। গাজি মিঁয়ার নায়ক নায়িকা ইহার কোন শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। তাহারা রক্তমাংসের মানুষ; খায় শোয় ঘুমায়; সময়ে স্বাভাবিক ভাবে কেহ কেহ মরিয়াছে, কেহ বা মরিবার জন্য ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে বার্দ্ধক্যলাভ করিতেছে; আজি হউক কালি হউক, আর দশ দিন পরেই হউক,—সকলেই মরিবে, কেহ থাকিবে না। কেবল থাকিবে, তাহাদের সুকীর্ত্তি এবং কুকীর্ত্তি; তাহা লইয়াই গাজি মিঁয়া উপন্যাস সুসজ্জিত করিয়াছেন।

অধিকাংশ উপন্যাসের নায়ক নায়িকা লেখকের কল্পনাসম্ভূত সদ্গুণ গরিমাযুক্ত আদর্শ নর নারী, নিঃস্বার্থ প্রেম, প্রেমের প্রভাবে আত্মত্যাগ, এবং কোন স্থলে বিরহ, কোন স্থলে মিলন,—ইহাই বর্ণনার বিষয়। গাজিমিঁয়ার নায়িকা সুন্দরী—বড়ই সুন্দরী—কিন্তু মিছরীর ছুরী; মিষ্ট অথচ প্রাণনাশক! তাঁহার মন্ত্র—স্বার্থসিদ্ধি, অর্থাৎ কার্য্যোদ্ধার। তিনি কার্য্যোদ্ধারের জন্য কি না করিয়াছেন; কি না করিতে পারেন তাহাতে ধর্ম্মের ভাণ আছে, ধর্ম্মভাব নাই; প্রেমের ভাণ আছে, প্রেম নাই; সর্ব্বাঙ্গে সভ্যতার আবরণ আছে, অথচ চরিত্র নিতান্তই উলঙ্গ,—বীভৎস;—চাহিবামাত্র চক্ষু ফিরাইয়া লইতে হয়; কেবল দেশের খাতিরে, ভদ্রতার অনুরোধে, পদগৌরব-মাহাত্ম্যে সম্মুখে সেলাম না করিয়া সরিয়া দাঁড়াইবার উপায় নাই।

গাজি মিঁয়া যেমন কল্পিত নাম, গ্রন্থবর্ণিত সমস্ত পাত্র পাত্রীর নামও সেইরূপ কল্পিত। কল্পনা বাছিয়া বাছিয়া ভাল নাম বাহির করে নাই; খুঁজিয়া খুঁজিয়া অদ্ভুত নামের তালিকা তৈয়ারি করিয়াছে। তাহাতে যে একটু বাহাদুরী নাই, এমন নহে। যে নিতান্ত ভাল মানুষ, তাহার নাম ভেড়াকান্ত। শান্ত, শিষ্ট, ধর্ম্মভীরু অথচ স্পষ্টবাদী; ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে গিয়া কখন কখন শৃঙ্গাঘাতে জর্জ্জরিত;—দরিদ্র অথচ তেজস্বী। এমন মানুষ সংসারের হিসাবে ভেড়াকান্ত বলিয়াই পরিচিত, কেন না,—যে পরকালের প্রলোভনে ইহকালের সুখ পায়ে ঠেলিয়া চলিয়া যায়, সে মহামূখ ভেড়াকান্ত। তাহার নাম জ্ঞানেন্দ্রনাথ হইলেও, সে ভেড়াকান্ত। গাজি মিঁয়ার উপন্যাসে যাঁহার নাম ভেড়াকান্ত, তিনিও এই শ্রেণীর লোক। ভেড়াকান্ত শান্ত, সুবোধ, সুশীল বালকের ন্যায় একস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া জীবন কাটাই-

* মূল্য ১।০ টাকা। কুষ্টীয়া—লাহেনীপাড়া শ্রীযুক্ত মীর মশারফ হোসেনের নিকট প্রাপ্তব্য।

বার পাত্র নহে। সে পথের ফকীর—অথচ রাজা বাদশাহকে শিক্ষা দিবার জন্য সংবাদ পত্রে সমালোচনা লিখিয়া থাকে; হাকিমের হুকুমের ন্যায় অন্যায়ের বিচার করিতে চাহে; দেশের দশজনকে ডাকিয়া গোপনে সভা বসাইয়া মন্ত্রণা আঁটিয়া প্রয়োজন মতে "মূর্খস্য লাঠৌষধের" ব্যবস্থা করে। তাহার জ্বালায় মহকুমা, অর্থাৎ মহকুমার মালিক;—হাকিম ও জমিদার, পুলিশ ও পাষণ্ডদল ব্যতিব্যস্ত। কে একাদশীর দিনে ডুব দিয়া জল খাইল, ভেড়াকান্ত তাহারও সন্ধান রাখে। বড় উকীল বাবু গোপনে মক্কেলগৃহে পসার প্রতিপত্তির খাতিরে নিশাকালে একটু অখাদ্য গলাধঃকরণ করিবার সময়ে সুধারসে গলা ভিজাইয়া লইলে, পরদিন কাছারীতে তাহা লইয়া ঢি ঢি পড়িয়া যায়;—কে দেখিল, কে রটাইল, কেহ সহসা জানিতেও পারে না।

ভেড়াকান্তকে অনেকে ভাল বাসে, অল্প লোকেই দেখিতে পারে না। কিন্তু যাহারা ভাল বাসে তাহারা নগণ্য দরিদ্র,—স্কুলের বালক, অথবা বাজারের দোকানদার। আর তাহাকে দেখিতে পারেন না—দেশের জমিদার ও জমিদারের কর্ম্মচারী, মহমকুমার হাকিম ও হাকিমের অনুচরবর্গ। ভেড়াকান্তকে শিক্ষা দিবার জন্য গণ্য মান্য লোকে কত ষড়যন্ত্র করিয়া জেলে পাঠাইয়াছিল, সেই কাহিনী পরিস্ফুট করিবার জন্যই উপন্যাসের অবতারণা। ইহা উপন্যাস হইলেও মফঃস্বলের অনেক সত্য ঘটনা এইরূপ আকার ধারণ করিয়া থাকে। লেখকের লিপিকৌশল এই উপন্যাসকেও একটি সত্য ঘটনা মূলক মোকদ্দমার নথীর আকারে গুছাইয়া তুলিয়াছে।

জেলার নাম নিশ্চিন্তপুর, মহকুমার নাম অরাজকপুর, বোাম ভোলানাথ সেখানকার দণ্ডমুণ্ডের নিয়ামক ডেপুটী সাহেব অর্থাৎ সব ডিভিসনেল অফিসর। তিনি স্থানীয় জমিদার-রমণী বেগম ঠাকুরাণীর হাত-ধরা। বেগম ঠাকুরাণী নামটী দেবী চৌধুরাণীর মত মিষ্ট নহে, হিন্দু মুসলমানের সম্মিলনের কিম্ভূত কিমাকার বস্তু। হটু নটু নামক দুই মুসলমান ভ্রাতা শিক্ষার আলোক পাইয়া তাঁহাদের বিধবা ধনশালিনী ভগিনীকে কলিকাতায় রাখিয়া লেখা পড়া শিখাইয়া পর্দ্দার বাহির করিয়া স্বেচ্ছাচারিণী করিয়াছেন; তাঁহার সংসারে নির্ব্বিবাদে লেপাটা আসুটা চালাইয়া আটচালার কোণে কোনরূপে দিনচালাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন;—আর ভগিনী বেগম ঠাকুরাণী অন্দরকে বৈঠকখানায় পরিণত করিয়া দেশের হাকিম উকীল মাষ্টার ডাক্তারের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া অভিনব শিক্ষার পরীক্ষাদানে নিযুক্ত হইয়াছেন। বেগম ঠাকুরাণীর চাহনী বিশ্ববিজয়িনী। কার্য্যোদ্ধারের জন্য সে চাহনি বোম্ ভোলানাথের উপর ঘন ঘন নিপতিত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাকে যাদুমন্ত্রে বিমুগ্ধ করিয়া তুলিল। উত্তর সাধক পদে মুন্সেফ ঋতুরাজ বাবু সহাস্যে আরোহণ করিলেন, নবাগত সরকারী ডাক্তার বাবুও বেগম ঠাকুরাণীর সহায়তা করিবার জন্য সম্মত হইলেন। কথাবার্ত্তা কল কৌশল সমস্তই স্থির হইয়া গেল, ঠিক সেই সময়ে পুলিশের লোকেও ভেড়াকান্তকে জড়াইয়া মোকদ্দমা জুড়িয়া দিল, সোণায় সোহাগা হইল। বিচার বিভ্রাটে ভেড়াকান্তের দুই বৎসরের জেল হইল, উৎকোচ মহিমায় জেলে বসিয়া গৃহিণী-প্রেরিত সুখাদ্য ভোজন করিতে করিতে জজ সাহেবের আদেশে প্রথমে জামিন, পরে একেবারে খালাস পাইয়া ভেড়াকান্ত হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

মফঃস্বলের কথা মফঃস্বলের ভাষায় লিখিতে গিয়া গাজি মিঁয়া প্রসঙ্গক্রমে আবশ্যক অনাবশ্যক অনেক প্রকারের পল্লীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; তন্মধ্যে মফঃস্বলবাসী ভাল মন্দ সকল প্রকার লোকেরই ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন মনে হয়, বুঝি তোমাকে আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। কেবল পাত্রগণের নাম জয়ঢাক, বিন্তাখিলা, তেমাচেরা, দাগাদারী, তুড়ুক পাহাড় ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া যাহা কিছু রক্ষা। বস্তানির পল্লী-চিত্র ইংরাজরাজ্যের লজ্জার বিষয়; পড়িতে পড়িতে মনে হয় ইংরাজরাজ্যের বাহিরে বিলাতি বার্ণিস, ভিতরে টিনের পাতা; দেখিতে খুব জমকাল। আইন আছে, আদালত আছে। আপীলের উপর আপীল আছে. কিন্তু বিচার নাই! ছোট লোকের সঙ্গে ছোট লোকের মোকদ্দমায় সুবিচারের ব্যাঘাত ঘটে না; কিন্তু ছোট বড় ধনী দরিদ্র কলহে লিপ্ত হইলে দরিদ্রের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। বিচার প্রণালীর দোষে বহুব্যয় করিয়া মুক্তিলাভ করিতে দরিদ্রের প্রাণান্ত ঘটিয়া থাকে, কখন বা এত করিয়াও সুবিচার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই দোষ ইংরাজের নহে, দেশীয় কর্ম্মচারীর; গাজী মিঁয়া সেই কথা বুঝাইবার জন্য নানা কথার অবতারণা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে কি না, পাঠক তাহার বিচার করিবেন। আমরা উপন্যাসের বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিয়া রসভঙ্গ করিব না। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে,—রাজা প্রজা সকলের পক্ষেই এরূপ গ্রন্থ সবিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

গাজি মিঁয়া কে? কে এই কল্পিত নামের অন্তরালে থাকিয়া এরূপ সুতীব্র সমালোচনায় রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খের কার্য্য কলাপের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়াছেন? পুস্তক পড়িয়া এই কথা মনে হইবামাত্র দেখিলাম গাজি মিঁয়ার আত্মগোপনচেষ্টা সফল হয় নাই। পুস্তকের সর্ব্বত্র তাঁহার পরিচয় পরিস্ফুট। তিনি একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ স্বদেশভক্ত অনুরক্ত মুসলমান সাহিত্য-সেবক। মুসলমান সাহিত্য-সেবকের সংখ্যা অল্প, তন্মধ্যে "বিষাদসিন্ধু রচয়িতা" শ্রীযুক্ত মীর মসারফ হোসেন ভাই সাহেব বাঙ্গলা গদ্য রচনার জন্য সুপরিচিত। যে লেখনী হইতে "বিষাদ সিন্ধু" প্রসূত হইয়াছে, "গাজি মিঁয়ার বস্তানিও" যে সেই লেখনী হইতে প্রসূত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হয় না। এমন ভাষা, এমন ভাব, এমন কাহিনীবিন্যাস-কৌশল মুসলমান সাহিত্য সেবকদিগের মধ্যে এ পর্য্যন্তও কেবল "বিষাদসিন্ধুর রচয়িতাতেই" লক্ষিত হইয়াছে।

মীর সাহেবের পূর্ব্বে মুসলমানলিখিত বঙ্গ সাহিত্যে কবিতা ছিল, পড়িবার মত গদ্য ছিল না। এখন অনেকে সুখপাঠ্য গদ্য গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, মুসলমান গদ্য লেখক বর্গের মধ্যে এখন পর্য্যন্তও মীর সাহেব সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক বলিয়া পরিচিত। ইনি অদ্যাপি সাহিত্য সেবায় ব্যাপৃত আছেন। কুষ্টিয়া নিবাসী মীর মশারফ হোসেন বাল্যকাল হইতেই বঙ্গসাহিত্যে নিতান্ত অনুরক্ত। কাঙ্গাল হরিনাথ ইঁহার সাহিত্য-গুরু; প্রথমে "গ্রামবার্ত্তায়" পরে "প্রভাকরে" লিখিয়া লিখিয়া লেখা শিখিয়া, মীর সাহেব "আজিজন্ নেহার" নামক একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশিত করেন। মুসলমানসম্পাদিত পত্রিকার মধ্যে তাহাই সর্ব্ব প্রথম বলিয়া পরিচিত। তাহার পর বহু গ্রন্থ লিখিয়া বঙ্গীয় লেখক বর্গের মধ্যে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন। কুষ্টীয়া একদা নীল বিদ্রোহের প্রধান ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার যথার্থ কাহিনী মীর সাহেব "উদাসীন পথিকের মনের কথা" নামক এক বিচিত্র উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পল্লীনিবাসী মুসলমান লেখক কিরূপ ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া সাহিত্য সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা সবিশেষ কৌতূহল পূর্ণ। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে দেশে এত কাগজ ছিল না, এত গ্রন্থ ছিল না, এত মুদ্রা যন্ত্র ছিল না, ছিল গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বা দুই একটি বঙ্গ বিদ্যালয়, দুই চারিখানি কলেজ এবং দুই দশ খানা ভাল পুস্তক। তৎকালে একজন মুসলমানের পক্ষে ভাল বাঙ্গালা রচনা করিবার বহু বাধাবিঘ্ন বর্ত্তমান ছিল। তাহা অতিক্রম করিয়া মীর মশারফ হোসেন যে সাহিত্য-শক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে।*

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

* মীর সাহেবের একখানি প্রতিকৃতি এই সংখ্যায় প্রদত্ত হইল।

২৫।১নং স্কটস্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও ২০৮।২ কর্ণওয়ালিস্ [illegible] কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



[illegible]



পঞ্চম ভাগ। } মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩০৮ { ২য় ও ৩য় সংখ্যা।

জড় ও চৈতন্য।

জড় ও চৈতন্য এই দ্বিবিধ পদার্থ আমাদের উপলব্ধির বিষয়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আমরা সত্য অনুভব করিতেছি। বলা বাহুল্য জড়শব্দ প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করিতেছি। আমাদের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে উহার অর্থ অন্যরূপ।

মোটামুটি বলা যাইতে পারে, জড় পদার্থ আমাদের বাহিরে, এবং চিৎ পদার্থ আমাদের অন্তরে। যেমন ইট কাঠ হাতী ঘোড়া এমন কি আমার নিজের শরীর পর্য্যন্ত আমার বাহ্য প্রত্যক্ষ বিষয়। আর আমার সুখ দুঃখ শোক তাপ আমার অন্তরের প্রত্যক্ষ বিষয়। প্রত্যক্ষ বলিলে হয়ত ভুল হয়,—আমার উপলব্ধির বা অনুভবের বিষয় বলিলে বোধ করি ভুল হইবে না। আর একটা কথা, জড় পদার্থ দেশব্যাপী;—ইট, কাঠ হাতী ঘোড়া সমস্তই খানিকটা জায়গা লইয়া থাকে। কিন্তু সুখ দুঃখ শোক তাপের জন্য বাক্স বা সিন্দুকের দরকার হয় না। উহাদের দেশব্যাপিতা নাই।

আরও একটা কথা। আমার চৈতন্য স্পষ্টতঃ আমার অনুভবগম্য; আমার সুখ দুঃখ শোক তাপ আমি স্বয়ং অনুভব করি। কিন্তু তোমার চৈতন্য, তোমার সুখ দুঃখ শোক তাপের অস্তিত্ব আমার অনুমান মাত্র। তোমার আকার ইঙ্গিত দেখিয়া আমি উহাদের অস্তিত্ব কল্পনামাত্র করিয়া লই, উহা আমার নিজের উপলব্ধির বা প্রতীতির বিষয় হইতে পারে না।

এই জড়ের সহিত এই চৈতন্যের সম্বন্ধ কিরূপ? এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন—জড় আছে, চৈতন্য নাই বা চৈতন্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, ইহা নির্জ্জলা জড়বাদ; ইংরাজিতে বলে materialism। কেহ বলেন চৈতন্য আছে, কিন্তু জড়ের স্বাধীন অস্তিত্ব নাই, ইহা বিশুদ্ধ চৈতন্যবাদ—ইংরাজি নাম idealism বা এইরূপ একটা কিছু। অপরে বলেন, উভয়েই স্বতন্ত্র অস্তিত্বযুক্ত। জড়ও আছে, চৈতন্যও আছে; উভয়ের সম্বন্ধ নিরূপণই দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

প্রথম দুই মতকে আমরা অদ্বয়বাদ—ইংরাজি monism বলিব, কেন না উহাতে এক ভিন্ন দুই পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই:—*অদ্বয় জড়বাদ অথবা অদ্বয় চৈতন্যবাদ।* তৃতীয় মতকে দ্বয়বাদ—ইংরাজি dualism—বলিব; কেননা এইমতে উভয়ই স্বাধীন সত্তাবান্।

আবার প্রথম ও তৃতীয় এই দুইকে জড়বাদের পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। প্রথম মত বিশুদ্ধ জড়বাদ; তৃতীয় মত অর্থাৎ যে মতে জড় ও চৈতন্য উভয়েরই অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়, উহা বিশিষ্ট জড়বাদ—কেন না ইহাতেও ত জড়ের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতেছে।

আজি কালি অথবা কিছুদিন পূর্ব্বে, এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকের মধ্যে প্রথম মতের বা নির্জ্জলা জড়বাদের কিছু প্রাদুর্ভাব ছিল। বুকনারের মত জর্ম্মাণ পণ্ডিত এইমত লইয়া কোলাহল করিতেন। ইহার অর্থ, জড়ই স্বাধীন অস্তিত্ব-সম্পন্ন। চৈতন্য জড়ের ধর্ম্ম মাত্র, প্রক্রিয়াগুণে চিনিতে যেমন মাদকত্ব উৎপন্ন হয়, প্রক্রিয়াগুণে সেইরূপ জড়ে চৈতন্য জন্মে। অধ্যাপক টিণ্ডাল ও অধ্যাপক হেকেল সময়ে সময়ে এমন কথা কহিতেন, যাহাতে তাঁহাদিগকেও এই মতাবলম্বী বলিয়া সন্দেহ জন্মিত। আমাদের দেশে

প্রাচীন কালে বৃহস্পতি চার্ব্বাক প্রভৃতি হয় ত এই মতাবলম্বী ছিলেন; হয় ত,—কেন না তাঁহাদের নামে প্রচারিত যে দুই চারিটা বচন প্রচারিত আছে, তাহা হইতে এই কূটতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের কি মত ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝা কঠিন। ফলে এই বিশুদ্ধ জড়বাদের কোনকালে বিশেষ প্রতিপত্তি ঘটে নাই; সে কালেও ছিল না,—একালেও নাই। আর আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্র একরকম বিদ্রোহী হইয়া এই মতকে অবজ্ঞা সহকারে ত্যাগ করিতে উপস্থিত হইয়াছে।

সেকালের ও বোধ করি একালের অধিকাংশ পণ্ডিতই দ্বৈতবাদী; অর্থাৎ তাঁহারা জড় ও চৈতন্যের স্বাধীন সত্তা স্বীকার করেন। তবে উভয়ের স্বরূপ কি, ও সম্বন্ধ কি, ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ বর্ত্তমান আছে।

প্রথম স্বরূপের কথা। আমরা জড়ের যে মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখি, উহাই কি উহার স্বরূপ? বলা কঠিন। কেন না আমাদেরই মানসিক অবস্থা ভেদে, জড়ের মূর্ত্তি বিভিন্ন হয়। জাগরণে যে মূর্ত্তি থাকে, তন্দ্রার অবস্থায় সে মূর্ত্তি দেখি না; আমি যে রঙ্ দেখি, রঙ্‌কাণা লোকে সে মূর্ত্তি দেখে না। সুস্থ অবস্থায় যে মূর্ত্তি দেখি, রোগে বা নেশায় সে মূর্ত্তি দেখি না। সম্ভবতঃ আমি পূর্ণ স্বাস্থ্যে যে মূর্ত্তি দেখি, তুমি পূর্ণ স্বাস্থ্যে ঠিক্ সেই মূর্ত্তি দেখ না। আবার জড়জগৎ আমাদেরও প্রত্যক্ষ, কীট পতঙ্গেরও সেইরূপ প্রত্যক্ষ। কিন্তু ঘ্রাণ, শ্রবণ, দর্শন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় মানুষে ও কীটে এত তফাত, যে উভয় প্রাণীর নিকটে জগতের মূর্ত্তি এক রকম হওয়া সম্ভব নহে। আমার দুইটা চোখ, কোন কোন কীটের হাজার চোখ। আমার নিকট জড়জগতের যেরূপ মূর্ত্তি, সহস্রলোচন কীটের নিকট সে মূর্ত্তি হইতেই পারে না। কোন্ মূর্ত্তি, জড়ের প্রকৃত স্বরূপ?

কেহ হয়ত বলিবেন, পূর্ণাঙ্গ ও সুস্থ অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন মনুষ্যে যে মূর্ত্তি দেখে, তাহাই জড়ের প্রকৃত স্বরূপ। আপত্তি উঠিবে—কেন? মানুষের অপেক্ষা উন্নত পর্য্যায়ের কোন প্রাণী যদি থাকে বা কালে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার নিকট জড়ের মূর্ত্তি অন্যরূপ হইতে পারে; সে তোমার আমার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিকে প্রকৃত স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিবে কেন? আবার মানুষের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তি কে? তুমি? আমি মানি না। আমি? তুমি মানিবে না।

ফলে জড়ের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা জানিবার উপায় নাই, এই জন্য শেষ পর্য্যন্ত পণ্ডিতেরা হতাশ হইয়া স্বীকার করেন, জড়ের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা জানি না, বা জানিবার উপায়ও নাই। তবে একটা স্বরূপ আছে, উহা অনির্দ্দেশ্য, অজ্ঞেয়, উহা noumenon; আর যে মূর্ত্তি প্রত্যক্ষদৃষ্ট ও জ্ঞাত, উহা phenomenon. প্রত্যক্ষের পশ্চাতে, অন্তরালে, অভ্যন্তরে, এই অনির্দ্দেশ্য স্বরূপ আছে, ইহাই জড়ের প্রকৃত স্বরূপ উহাই, substance আসল জড়। আমরা যাহা দেখি তাহা আসল নহে—আসলের বিকৃতি মাত্র।

চৈতন্যের স্বরূপ সম্বন্ধেও সেইরূপ দ্বন্দ্ব উঠে, আমরা চৈতন্যের যে মূর্ত্তি দেখি, উহাই কি চৈতন্যের প্রকৃত স্বরূপ? না উহার ভিতরে কোন অনির্দ্দেশ্য অজ্ঞেয় প্রকৃত স্বরূপ—substance আছে—যাহা বাহিরে সুখদুঃখময় শোকতাপময় মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয়? অনেকেই বলেন চৈতন্যেরও স্বরূপ অজ্ঞেয়, উহারও ভিতর একটা অনির্দ্দেশ্য substance আছে, তাহাই noumenon, খাঁটি জিনিষ; যাহা আমরা দেখি তাহা phenomenon মাত্র।

এই গেল স্বরূপ লইয়া কথা। তারপর দ্বিতীয় কথা, সম্বন্ধ লইয়া। জড়ের সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ আছে। অনেকেই স্বীকার করেন—আছে। প্রমাণ—আফিম। আফিম খাইলেই যখন জগতের মূর্ত্তিটা বদলাইয়া যায়, তখন আর প্রমাণান্তরে দরকার কি? আফিম ঘোরতর জড় পদার্থ—উহা যখন মানসিক বিকার উৎপন্ন করিয়া চেতনাকে বিকৃত করে, এমন কি চেতনাকে লুপ্ত পর্য্যন্ত করে, তখন জড় পদার্থ চৈতন্যকে বিকৃত করিতে পারে, ইহাতে সংশয় কি? আবার আমরা যখন ইচ্ছা-প্রয়োগে খাই, শুই, নাচি, গাই, তখন আমাদের চৈতন্যও যে জড়ের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে, তাহাও স্বীকার্য্য।

স্বীকার্য্য হইলেও সকলে স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ আছে, উহা কেবল সমবায়সম্বন্ধ মাত্র। ইংরাজিতে যাহাকে বলে association;—অর্থাৎ জড়ে যখন এই এই বিকার উপস্থিত হয়, চৈতন্যে তখন এই এই বিকার উপস্থিত হয়। সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য বটে, কিন্তু কার্য্য-কারণসম্বন্ধ নহে। জড়ে কেবল জড়কেই বিকৃত করিতে পারে, চৈতন্যে কেবল চৈতন্যকেই বিকৃত করে। আফিমে মস্তিষ্কের বিকার হয়, মস্তিষ্ক জড় পদার্থ। চৈতন্যের বিকার

মস্তিষ্কের বিকারের আনুষঙ্গিক মাত্র। উহা মস্তিষ্কের বিকারের ফল বা কার্য্য নহে।

যাক্, সে সকল তর্ক এখানে তুলিয়া প্রয়োজন নাই। জড় ও চৈতন্য উভয়ই স্বতন্ত্ররূপে স্বাধীন ভাবে অস্তিত্ববান্ ; উহাদের স্বরূপ ও সম্বন্ধ যাহাই হউক না কেন। এই মতকে দ্বয়বাদ বলিয়াছি, অথবা ইহাকে বিশিষ্ট জড়বাদ বলা যাইতে পারে, কেন না জড়ের স্বাধীন অস্তিত্ব ইহাতে স্বীকৃত। জড়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, বলিলে এই মতের আচার্য্যেরা লাঠি লইয়া আসেন।

প্রাচীনের মধ্যে সাংখ্যাচার্য্যেরা এইরূপ দ্বয়বাদী ছিলেন। তাঁহারা জড় ও চৈতন্য উভয়েরই স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। তবে বলিতেন, উহাদের প্রকৃত স্বরূপ অজ্ঞেয় অনির্দ্দেশ্য। চৈতন্যের substance আছে ; উহা অজ্ঞেয় পুরুষ। জড়েরও substance আছে ; উহা অজ্ঞেয় প্রকৃতি। পুরুষ প্রকৃতির সম্মুখীন হইলে প্রত্যক্ষ phenomenonএর বিকাশ হয়।

এই পুরুষ ও প্রকৃতির তত্ত্ব আধুনিক প্রচলিত সাম্প্রদায়িক হিন্দু ধর্ম্মের অস্থিমজ্জায় মিশিয়াছে। বৈষ্ণবশাস্ত্র ও শাক্তশাস্ত্র পুরুষ ও প্রকৃতিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িয়া পিটিয়া তাঁহাদের উপাস্য দেব দেবীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহারা কখনও কখনও বৈদান্তিকের ভাষায় কথা কহিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সেখানে বৈদান্তিকের ভাষার আড়াল হইতে সাংখ্যভাব উঁকি মারিতে থাকে।

পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে এই দ্বয়বাদীর সংখ্যা কম নহে, বোধ হয় অধিকাংশই এই দলভুক্ত। বৈজ্ঞানিকদের সম্বন্ধেও সেইকথা। জড় ও চৈতন্য উভয়ই বর্ত্তমান; উভয়ের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা হয় ত জানিনা। উভয়ের সম্বন্ধ কি বলা কঠিন। কিন্তু উভয়ই স্বতন্ত্র অস্তিত্ববান্।

বলা বাহুল্য খ্রীষ্টান ধর্ম্ম এই দ্বয়বাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জড়জগৎ সত্তাবান্ ; নতুবা জড়জগতের সৃষ্টিকর্ত্তার আবশ্যকতা থাকে না। জড়-জগৎ আছে ; এমন দিন ছিল—তখন জড়জগৎ ছিল না, একদিন সহসা ইহার সৃষ্টি হইল ; যিনি সৃষ্টি করিলেন, তিনি জড় জগতের বহিঃস্থিত এক ব্যক্তি ; তিনি খোদা।

ইংরাজি God ও আমাদের 'ঈশ্বর' অভিধানের প্রমাণ সত্ত্বেও সমানার্থক নহে। সেই জন্য এস্থলে ঈশ্বর শব্দ ব্যবহার না করিয়া গডের বাঙ্গলায় খোদা শব্দ ব্যবহার করিলাম।

জড়জগৎ নিয়মবদ্ধ—সেই ব্যক্তি এই নিয়মের বিধান কর্ত্তা বা বিধাতা।

জড়জগতের মধ্যে একটা ব্যবস্থা দেখা যায়। ঘটিকা যন্ত্রে একটা যেমন বিশেষ উদ্দেশ্য অনুসারী একটা বিশেষ নির্ম্মাণের প্রণালী আছে, জগৎ-যন্ত্রেও সেইরূপ একটা বিশেষ উদ্দেশ্য অনুযায়ী একটা বিশেষ গঠন প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে। ইহাই জগৎ যন্ত্রের design, এই প্রণালী যাঁহার মন হইতে উদ্ভূত, তিনিই designer নির্ম্মাপক বা ব্যবস্থাপক - তিনি খোদা।

গঠন প্রণালী হইল design ; আর সেই design এর একটা উদ্দেশ্য আছে ; কি উদ্দেশ্য বলা কঠিন, কিন্তু উদ্দেশ্য একটা স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে—উহা purpose, একটা Great Purpose—বড় হাতের G ও বড় হাতের P যুক্ত ;—যাঁহার এই উদ্দেশ্য, তিনি খোদা।

এই উদ্দেশ্যের সহিত মানবের নৈতিক জীবনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। জড়জগতের অস্তিত্বের বোধ করি প্রধান উদ্দেশ্য—মনুষ্যের মধ্যে একটা নৈতিক ব্যবস্থার—moral orderএর—প্রতিষ্ঠা। সেই জন্য যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ও নিয়মবিধাতা খোদা, তিনিই মনুষ্যের পাপপুণ্যের বিচারক ও দণ্ডপুরস্কারের বিধাতা।

জড়জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে জড়জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও নিয়মবিধাতারও অস্তিত্বে টান পড়ে। সেই জন্য খ্রীষ্টান ধর্ম্ম জড়জগতের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকারে বাধ্য। খ্রীষ্টানেরা জড়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কাজেই ইঁহারা জড়বাদী, materialist

আমাদের হিন্দু সমাজের মধ্যে এক সম্প্রদায় খৃষ্টানদের নিকট হইতে এই খোদাকে ধার করিয়া আনিয়াছেন ; এবং বৈদিক মন্ত্রে তাহার শুদ্ধি বিধান করিয়া চৈতন্যবাচী ব্রহ্ম নামটী উপনিষৎ ও বেদান্ত হইতে আ—হরণ করিয়া সেই বিজাতীয় ম্লেচ্ছটির নূতন নামকরণ করিয়াছেন। কিন্তু নামে বর্ণ বদলায় না।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যেও এই দ্বয়-বাদেরই বোধ করি প্রাধান্য। তবে একালে জড়পদার্থের সহিত শক্তির সম্বন্ধ লইয়া কতকটা আলোচনা হইয়াছে। বহুদিন

হইল লর্ড কেলবিন্ একটা অনুমান বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সকলকে চমকাইয়া দিয়াছিলেন জড়পরমাণু আকাশে আবর্ত্ত মাত্র। আবর্ত্ত একরূপ গতির প্রকারভেদ; কাজেই জড়ের সমুদয় ধর্ম্ম কেবল আবর্ত্তের ধর্ম্ম অর্থাৎ গতিবিশেষের ধর্ম্ম মাত্র। ইহা সেই বিখ্যাত vortex theory. সোণারূপা কয়লা গন্ধক ইত্যাদি স্থূল জড়ের পরমাণু আকাশের আবর্ত্ত মাত্র। কিন্তু সেই আকাশও ত আবার জড়—না হয়—সূক্ষ্ম জড়—কিন্তু জড়। কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, আকাশ কোন সূক্ষ্মতর জড়ের কোনরূপ গতি বিশেষে উৎপন্ন—হয় হউক—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একটা জড়ের ভিত্তি পাওয়া যাইতেছে, সেই জড়ের স্বরূপ কি?

যাঁহারা মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে দেখেন, তাঁহারা বলেন, স্থূলই হউক আর সূক্ষ্মই হউক, জড়ের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি? আমাদের সম্বন্ধ গতির সহিত। ইন্দ্রিয় যোগে যাহা মস্তিষ্কে আসিয়া পৌঁছায়, তাহা জড় নহে, তাহা গতি; কোন রূপ ধাক্কা, কোনরূপ ঢেউ, কোনরূপ ক্রিয়া। সুতরাং যাহা আমরা মুখ্যভাবে অনুভব করি, তাহা জড় নহে, তাহা গতিমাত্র। গতি কাহার, গতি কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে এ প্রশ্ন নাই বা তুলিলাম। আর নিরবলম্ব নিরাশ্রয় গতিই কি একবারে অসম্ভব ব্যাপার? বিখ্যাত বস্কোবিচ্ ত জড়পরমাণুকে ক্ষেত্র-তত্ত্বের স্বীকৃত অংশহীন ও পরিমাণহীন বিন্দুতে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ক্লিফোর্ড ত একবার জড়কে জড়ত্ববর্জ্জিত শূন্য দেশের (spaceএর) বিকৃতিমাত্র কল্পনায় সাহসী হইয়া নূতন জড়বিজ্ঞান নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

ইহারা kinesis, এই একটি শব্দ তৈয়ার করিয়াছেন, উহার অর্থ গতিবস্তু। এই গতিবস্তুসকলের সমবায়ে ও পরম্পরায় জড়জগৎ নির্ম্মিত। আর একটি শব্দ psychosis অর্থাৎ চিদ্বস্তু—এই চিদ্বস্তু সকলের সমবায় ও পরম্পরায় চৈতন্যের কলেবর গঠিত। গতিবস্তু ও চিদ্বস্তুর মধ্যে একটা অনির্দ্দেশ্য অথচ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। যখন এই এই গতিবস্তু থাকে, তখনই এই এই চিদ্বস্তুর আবির্ভাব হয়। উভয়ই যুগপৎ বর্ত্তমান। বস্তু দ্বিবিধ—গতিবস্তু ও চিৎবস্তু—যাঁহারা এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেখিতে চাহেন, তাঁহারা লয়েড্ মর্গান প্রণীত *Animal Life and Intelligence* পুস্তক দেখিবেন।

এই দ্বয়বাদকে একটু রূপান্তরিত করিয়া অদ্বয়বাদে পরিণত করা না যায়, তাহা নহে। তাহা হইলে কতকটা হার্ব্বার্ট স্পেনসারের মত আইসে। বস্তু একটা, তাহা দুই বিভিন্ন রূপ ধরিয়া আমাদের সম্মুখে উপনীত হয়—এক দিক্ হইতে দেখিলে জড় বা গতি (kineses); অন্য দিক্ হইতে দেখিলে চিৎ (psychoses);—হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের ভাষায় ক ও খ;—উভয়েরই স্বরূপ অজ্ঞেয়।

অধ্যাপক ক্লিফোর্ড এই দুয়ের মধ্যে একটাকে বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। জড়ই বল আর গতিই বল, উহার স্বাধীন সত্তা নাই; উহাদের প্রতীতি মাত্র আছে; কিন্তু এই প্রতীতিটাই চিদ্বস্তু। সুতরাং ক্লিফোর্ড অদ্বয়বাদী—তাঁহার মতে চিদ্বস্তুময় চৈতন্য ছাড়া আর কিছু বর্ত্তমান থাকার প্রমাণ নাই। এই চিদ্বস্তুর তিনি ইংরাজিতে নাম দিয়াছিলেন mind-stuff.

পাশ্চাত্য অদ্বয়চৈতন্যবাদীদের মধ্যে বার্কলি ফিক্‌তে প্রভৃতির নাম করিতে হয়। বার্কলি যে যুক্তিবলে জড়-পদার্থকে প্রতীতিমাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, সে যুক্তির বোধ করি উত্তর নাই। যাঁহারা সঙ্গত উত্তর দিয়াছি মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, তাঁহাদিগকে সেই প্রসাদ লাভে বঞ্চিত করিবার পক্ষে কোন আইন নাই। কিন্তু সেই আত্মপ্রসাদের নাম আত্মপ্রতারণা।

যে আধুনিক দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তি বিজ্ঞানের উপর স্থাপিত, তাহাও ধীরে ধীরে এই চৈতন্যবাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। বোধ করি অচিরেই এই অদ্বয় চৈতন্য-বাদ ধ্রুব বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। কেন না, জড় পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে কেহই এপর্য্যন্ত সমর্থ হন নাই।

ফলে জগৎ যে চৈতন্যরূপী, কেবল চৈতন্যমাত্রই স্বাধীন অস্তিত্বযুক্ত, ইহাতে বিসংবাদের তত কারণ নাই, অথবা কিছুদিন পরে থাকিবে না। কিন্তু এই চৈতন্যের স্বরূপ লইয়া গণ্ডগোল চলিতে পারে।

চৈতন্য, কি না আমার চৈতন্য। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, অপরের চৈতন্য আমার কল্পনা মাত্র; সুতরাং উহার অস্তিত্ব জড়ের অস্তিত্বের মতই অমূলক। বেদান্তের ভাষায় উহাকে

চিৎ না বলিয়া চিদাভাস বলাই সঙ্গত। আমার চৈতন্য স্পষ্ট অস্তিত্বযুক্ত পদার্থ, কিন্তু ইহার স্বরূপ কি?

হিউম হয় ত বলিতেন যে সকল প্রতীতি, শব্দস্পর্শগন্ধ, সুখদুঃখশোকতাপ ভয়ক্রোধ প্রভৃতি স্পষ্টতঃ অনুভব করিতেছি, তাহার সমষ্টিই চৈতন্য। এই গুলিই ত প্রতীত পদার্থ, এই গুলিই সত্য, চৈতন্য এই সকলের সমষ্টিমাত্র। ইহার অভ্যন্তরে, ইহার অন্তরালে, কোন অজ্ঞেয় অনির্দ্দেশ্য substance এর কল্পনা অনাবশ্যক। প্রতীতিগুলি phenomenon মাত্র, কিন্তু এই phenomenonই সত্য, ইহার অন্তরালে noumenon এর কল্পনা নিরর্থক ও অযুক্ত। হক্সলীও কতকটা এই পথে গিয়াছেন। যাঁহারা হক্সলীকে জড়বাদী বলিয়া জানেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। বৌদ্ধেরাও কতকটা এই রূপ কথা বলিতেন। নাভি, নেমি, অর প্রভৃতি চক্রাঙ্গের সমবায়ে গাড়ীর চাকার উৎপত্তি; চাকা বলিয়া স্বতন্ত্র পদার্থ কিছু নাই, নাভি, নেমি, অর যদি না থাকে, চাকা থাকিবে না। চৈতন্যের অন্তরালে কোন খাঁটি বস্তু নাই, যদি কিছু থাকে—বৌদ্ধমতে তাহা শূন্য। যিনি ইহা বুঝিয়াছেন, তিনিই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত।

যাঁহারা substance এর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা হয়ত বলিবেন, নাভি, নেমি, অর না থাকিয়াও কাঠ ত থাকিতে পারে, সেই কাঠের বিকারে চাকা। সেইরূপ প্রতীয়মান চৈতন্য যাহার বিকার, তাহাই substance, তাহাই চৈতন্যের স্বরূপ।

এইমত বেদান্তের। বেদান্ত এইরূপ substance বা noumenon স্বীকার করেন। তাঁহার নাম দেন আত্মা বা আমি। তাহার স্বরূপ কি? তাহা অনির্দ্দেশ্য—উপনিষদের ভাষায় ইহা নহে, ইহা নহে, বলিয়া তাহার নির্দ্দেশ করিতে হয়। এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, আমি আছি অর্থাৎ আমি সৎ—আর আমি চিৎ—অর্থাৎ চৈতন্য স্বরূপ। বেদান্ত সময়ে সময়ে আর একটা বিশেষণ যোগ করেন—আমি আনন্দস্বরূপ, কেননা—আমি আছি ও থাকাই আমার আনন্দ, সেই আনন্দের উদ্দেশ্যেই আমি আছি। সেই আত্মা 'পরানন্দ' ও 'পরপ্রেমাস্পদ'।

স্বরূপ যাহাই হউক, বেদান্ত বলেন, সেই আমিই ঈশ্বর—সেই আমিই এই জগৎ রচনা করিয়াছি—সূর্য্যচন্দ্র হইতে অণুপরমাণু পর্য্যন্ত সকলই আমার প্রতীতি, আমারই কল্পিত আমারই সৃষ্ট। কেন এরূপ রচনা করিয়াছি, কেন এরূপ কল্পনা করিয়াছি, ইহার উত্তরে বলা হয়, ইহা আমার মায়া, আমার লীলাকৈবল্য, আমার খেয়াল, তদপেক্ষা সদুত্তর নাই। অন্ততঃ এইরূপ একটা বাহ্য জগৎ কল্পনা করিয়া আমাকেই আবার 'জীব' রূপে সেই জগতের মধ্যে স্থাপিত যদি না করিতাম, তাহা হইলেও জগৎও থাকিত না, আমিও হয়ত থাকিতাম না অথবা আমি থাকিলেও প্রত্যয়সিদ্ধ হইতাম না; বৌদ্ধদের মতানুরূপ সমস্তই অকল্প্য মহাশূন্যে পরিণত হইত।

উপনিষৎ সমূহ এই 'আমার' একটি নামকরণ করিয়াছিলেন 'ব্রহ্ম', এবং অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন 'অহং ব্রহ্মাস্মি', আমিই সেই ব্রহ্ম। উপনিষদের ভাষা অনেক সময় দুরূহ ও বৈচিত্র্যময়, কিন্তু পরবর্ত্তী বেদান্ত গ্রন্থসমূহ ভাষায় কোনরূপ অস্পষ্টতা রাখিয়াছেন, বোধ হয় না। তাঁহারা স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন—যদি কিছু থাকে, 'সোঽহম্' সেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া যদি তাহার নামকরণে ইচ্ছা হয় তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু সেই ব্রহ্ম শব্দে 'আমি' ভিন্ন আর কিছু বুঝিও না। যতক্ষণ বুঝিবে, ততক্ষণ তোমাকে অবিদ্যাচ্ছন্ন অর্থাৎ অজ্ঞ বলিব। যাঁহারা আপনাদিগকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী প্রভৃতি বিশেষণে পরিচিত করিতে চাহেন, তাহাদের অবিদ্যার ঘোর যায় নাই। যিনি বুঝিয়াছেন আমিই আছি, আর সমস্ত আমার কল্পনা, তিনিই মুক্ত।

এই ভাষা অতি স্পষ্ট, অথচ অবিদ্যার এমনই মোহ, যে কেহ বলেন বেদান্ত শাস্ত্র একটা pantheism, কেহ বা বলেন বেদান্তশাস্ত্র একটা theism বেদান্ত হাসিয়া বলিবেন, এই সকল উক্তি অবিদ্যার আস্ফালন মাত্র।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

অবস্থায় ব্যবস্থা।

অবস্থার মতই ব্যবস্থা হইয়া থাকে। আজ যে ফকীর হইয়া ভিক্ষান্নে উদরপূর্ত্তি করিতেছে, কাল সেই আমীর হইয়া, ভিক্ষা দিয়া শত শত লোকের উদরপূর্ত্তি করিয়া দিবে। আজ যে ভৃত্যভাবে তোমার পরিচর্য্যা করিয়া কৃতার্থ হইতেছে, দশ দিন পরে সেই আবার ভাগ্যবলে তোমার প্রভু হইয়া, তোমাকেই নিজের পরিচর্য্যায় বাধ্য করিয়া, স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিবে। সংসারে এরূপ বিপর্য্যয়

সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। প্রভু ভৃত্য হইতেছেন, ভৃত্য প্রভু হইতেছে ; রাজা প্রজা হইতেছেন, প্রজা রাজা হইতেছে ; জমিদার রাইয়ত হইতেছেন, রাইয়ত জমিদার হইতেছে ; কোচম্যান সহিস হইতেছেন, সহিস কোচম্যান হইতেছে ; রাণী চাকরাণী হইতেছেন, চাকরাণী রাণী হইতেছে ; বেগম বাঁদী হইতেছেন, বাঁদী বেগম হইতেছে।

যখন যেমন তখন তেমন।

যে যে অবস্থায় পড়িতেছে, সে সেই অবস্থায় জীবন-ধারণ করিতেছে। ভৃত্য প্রভু হইয়া প্রভুর উপর প্রভুত্ব করিবার সময়ে, স্বীয় প্রভুত্বযোগ্যতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না ; প্রজা রাজা হইয়া রাজাসনে বসিয়া বেশই রাজত্ব করিতে পারে ; চাকরাণীও রাণী হইয়া রাজার সাহচর্য্য করিবার সময়ে বেশইত যোগ্যতার পরিচয় দিয়া থাকে।

"কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ।" কিঞ্চিৎ বুদ্ধি থাকিলেই মানুষ অবস্থার মত ব্যবস্থা করিতে পারে। প্রবাদ আছে, যে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসিত, সেই বিক্রমাদিত্য হইত। জগতের যত সিংহাসনেইত এই সত্য প্রতিপন্ন হইতেছে। যিনি রাজা হইতেছেন, তিনিই রাজত্ব করিতেছেন, তিনিই রাজ্যশাসন করিতেছেন। যিনি বিচারক হইতেছেন, তিনিই শত শত লোকের দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা হইয়া সুখে কালযাপন করিতেছেন। ক্রতদাস কিংবা ক্রীতদাসই বা মুক্তিলাভে প্রভু হইয়া প্রভুত্ব করিতে না পারিবে কেন ? জগতে চিরদিন দেখা যাইতেছে, বিজিত বশীভূত জাতি সময়ে বিজেতা হইতেছে, আপনারাই বিজেতাকে বিজিত করিয়া নিজের বশীভূত করিতেছে। "নীচৈর্গচ্ছত্যুপরিচ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।"

জগতে দাস-রাজার দর্শন দুর্ল্লভ নহে। ভারতের চন্দ্রগুপ্তকে যদি নন্দবংশের দাসীপুত্র বলিতে সম্মত না হও, তাহা হইলেও ত মুসলমান নরপতিবংশের কুতব-উদ্দীনকে দাস-রাজা বলিয়া মানিতে হইবে।

আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে যাও ; সেখানকার লাইবিরীয়া রাজ্যে দাসের রাজত্ব দেখিতে পাইবে। যাহা এক স্থানে চলিতেছে,অবস্থার মত ব্যবস্থা হইলে, তাহা সকল স্থানেই চলিতে পারে। আমরিকায় পূর্ব্বে কৃষ্ণবর্ণ আফ্রিকদিগকে কেবল শ্বেত-প্রভুগণের দাসত্ব করিতেই দেখিয়াছিলে। এখন সেই আমরিকায় বুকার ওয়াশিংটনের মত দাসীতনয়কে সমাজপতি হইয়া প্রেসিডেণ্ট রূসভেল্টেরও একাসনে বসিয়া পানভোজন করিতে দেখিতেছ। কিছু দিন পরে যে, কোন দাসবংশজকে প্রেসিডেণ্ট পদে অভিষিক্ত হইয়া রাজত্ব করিতে দেখিবে না, তাহাই বা কিরূপে মনে করিব ? ৩৫ বৎসরের ভিতর আমরিকায় লক্ষ লক্ষ দাস স্বাধীন হইয়া স্বাধীনভাবে সংসারযাত্রার নির্ব্বাহ করিতেছে ; অনেকে ব্যবসায় বাণিজ্যে ধনপতি হইয়া, অনেক লোকের উপর প্রভুত্ব করিতেছে ; অনেকে শিল্প বিজ্ঞানে অধিকারী হইয়া, ধনে মানে শ্বেতপুরুষদিগের সমকক্ষতা করিতেছে, কেহ কেহ আবার শ্বেতপুরুষদিগকেও অধীনে রাখিয়া কারবার চালাইতেছে,—দাস প্রভু হইয়া প্রভুকে ভৃত্য করিয়াছে।

এই সব দেখিয়া শুনিয়াও যাঁহারা বলেন, "অমুক দেশের লোকে দাসত্ব করিতেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, অমুক জাতি কোন কালেই নিজের দেশে নিজে শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবে না"—যাঁহারা বলেন, "বিজিত কখনই বিজেতার সমাসনে বসিতে পারে না, প্রতিপাল্য কখনই প্রতিপালক হইতে পারে না ;" তাঁহারা প্রকৃতের অপলাপ করেন, ইতিহাসের মর্য্যাদাভঙ্গ করেন ; তাঁহারা মানব-প্রকৃতিরই ব্যতিক্রম ঘটাইতে চাহেন।

এক সময়ে বড় বড় দার্শনিক ও পণ্ডিতদিগেরও ধারণা ছিল, "মানবসমাজ দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগ প্রভুত্ব করিতে সৃষ্ট, অন্য ভাগ দাসত্ব করিতে অবতীর্ণ।" গ্রীসের সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মহাপণ্ডিত এরিষ্টটলও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন, এই কথা লিখিয়া গিয়াছেন ; এই বিশ্বাস ধারণাই চিরদিন নিজের হৃদয়ে বিরাজমান রাখিয়া লক্ষ লক্ষ শিষ্য অনুশিষ্যের হৃদয়েও বিরাজমান করিয়া গিয়াছিলেন !

বিলাতে উইলবারফোর্স, ক্লার্কসন, জ্যাকারি-মেকলে প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের জন্য যখন দাসব্যবসায় রহিত হয়, তখনও অনেক এরিষ্টটল-শিষ্য, এরিষ্টটলের মতকেই নজীর ধরিয়া, দাসব্যবসায় বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ! অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিমসময়ে যখন বিলাতে দাসব্যবসায়ের প্রতিবাদে সূত্রপাত হয়, যখন ডাক্তার জন্‌সনের মত মহাপণ্ডিতেরা দাসব্যবসায়ের প্রতিকূলতা করেন, তখনও জন্‌সনের অনুগত ভক্ত শিষ্য বসোয়েল দাসব্যবসায়ের

পক্ষসমর্থন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন; দাস-ব্যবসায়কে ধর্ম্মের অনুমোদিত, খৃষ্টধর্ম্মের আদিষ্ট বলিয়া, দাসব্যবসায়ের প্রতিপক্ষদিগকে অধার্ম্মিকসম্প্রদায়ে ভুক্ত করিয়াছিলেন। ১৮৬৩ অব্দে যখন মার্কিণ রাজ্যে দাস-মুক্তি উপলক্ষে ঘোর গৃহযুদ্ধ হয়, যখন মার্কিণ আর্য্যাবর্ত্তের দাসত্বমোচকদিগের সহিত মার্কিণ দাক্ষিণাত্যের দাসত্বপোষকেরা যুদ্ধ করিয়া দেশটাকে শ্বেত শোণিতে প্লাবিত করেন, তখনও মার্কিণ দাক্ষিণাত্যের অনেক পণ্ডিত এরিষ্টটলের নজীর ধরিয়া দাসত্ব বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের লিখিত প্রচারিত শত শত গ্রন্থে এবং সহস্র সহস্র প্রবন্ধে সভ্য জগৎ কলঙ্কিত হইয়াছিল। কেবল আমেরিকার নহে, ইউরোপেরও কোন কোন মহাপ্রভু দাসত্ব বজায় রাখিবার জন্য পাণ্ডিত্য-প্রকাশের একশেষ করিয়াছিলেন।

সেই সময়েই এক দল পণ্ডিত, মানবদেহের বহুজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিয়া, শারীরতত্ত্বে অগাধ পাণ্ডিত্য দেখাইয়া, সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, "ইউরোপ এশিয়া আমেরিকা প্রভৃতি দেশের সভ্য মানবের মেরুদণ্ডে যে কয়খানা গ্রন্থি আছে, আফ্রিকার নিগ্রো-প্রভৃতি জাতীয় নর নারীর মেরুদণ্ডে সে কয়খানা নাই, নিগ্রোর মেরুদণ্ডে একখানা গ্রন্থি কম আছে; সেই গ্রন্থিই বুদ্ধি-শক্তির আধার; নিগ্রো প্রভৃতি কাফ্রিদিগের ঐ বুদ্ধিগ্রন্থি নাই, তাই তাহারা স্বভাবতঃ নির্ব্বোধ। সুতরাং তাহারা অজগরাদি পশুর ন্যায় সভ্য মানবের দাসত্ব করিতেই সৃষ্ট। দাসত্ব রহিত হইলে ভগবানের সৃষ্টিতে ব্যতিক্রম ঘটিবে।"

তখন এই আজগবী কথায় অনেকে বিশ্বাসও করিয়াছিলেন। আমাদের ভারতেও দুই একটী মহাপুরুষকে এই আজগবী মতের পক্ষপাতী হইতে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু ফলে সত্যেরই জয় হইয়াছে। আমেরিকার মুক্তদাসেরা এখন সকল কার্য্যে—সকল বিদ্যায়—সকল জ্ঞানে—শ্বেতপুরুষদিগের সমকক্ষতা করিতেছেন। রাজ্যশাসনের উপযুক্ত রাজনীতি-জ্ঞানেও অনেকে ন্যায়সম্মত অধিকার সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি যোগ্যতা দেখিয়া বড় বড় শ্বেতপুরুষদিগকেও বিস্মিত হইতে হইয়াছে। পুরাতন বিদ্বেষ এখনও অনেক শ্বেতহৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে বটে, আমেরিকার সকল প্রদেশে এখনও মুক্ত দাস বা দাসবংশজেরা রাজনীতিকাদি অধিকারে শ্বেতপুরুষদিগের সমকক্ষতা করিতে পাইতেছে না বটে, অধিকারলাভে এখনও বঞ্চিত হইয়া থাকিতেছে বটে, কিন্তু এভাব আর অধিক দিন থাকিবে না।

দাসবংশজ পণ্ডিত ও পরার্থপর বুকার ওয়াশিংটন নবপ্রেসিডেণ্ট রুসভেল্টের সহিত একাসনে বসিয়া পান ভোজন করিয়াছেন, অভ্যাগতরূপে তাঁহার কাছে আদর পাইতেছেন, দেখিয়া আমেরিকার দাক্ষিণাত্য মহাশয়েরা তুমুল প্রতিবাদের সুর ধরিয়াছিলেন, প্রেসিডেণ্টের উপর মনের সাধে ঝাল ঝাড়িয়াছিলেন; কোন কোন দুরাশ আবার প্রেসিডেণ্টকে সমাজচ্যুত করিবারও ভয় দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু সবলহৃদয় প্রেসিডেণ্ট মহাশয় কোন কথায় কর্ণপাত করেন নাই, কাহারও দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই; তিনি অটল অচল; দাসবংশজ মহাপুরুষ বুকার ওয়াশিংটনকে তিনি মিত্র বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। মিত্রকে মিত্রের আসনেই বসাইয়া রাখিতেছেন। প্রতিবাদের সুরও ক্রমেই কমিয়া কমিয়া এখন একপ্রকার মিলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু কেবল বুকার ওয়াশিংটনের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াই, প্রেসিডেণ্ট রুসভেল্ট নিশ্চিন্ত হন নাই। তিনি দুইটী পণ্ডিত দাসীপুত্রকে রাজ্যের উচ্চপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। দাসীপুত্র ক্রসলীনকে লাইবিরীয়ার দূত করিয়াছেন; দাসীপুত্র ডানসিকে স্বরাজ্যের রেজিষ্টার-জেনারেল করিয়াছেন।

অবস্থায় ব্যবস্থা হয়। পৃথিবীর কোন জাতি বা কোন সম্প্রদায়েরই চিরদিনের মত হতাশ হইয়া থাকা উচিত নহে। জাতীয় উন্নতিই জাতীয় অধিকারের পথ সহজ করিয়া দেয়। ব্যক্তিগত যোগ্যতা বিস্তৃত হইলেই সমাজগত যোগ্যতা বিস্তৃত হইয়া থাকে। আফ্রিকার লাইবিরীয়া প্রদেশে দাসরাজ্য কিরূপ চলিতেছে, তাহা দেখিয়াই পাঠক অবস্থা ব্যবস্থা ভূত ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু লাইবিরীয়ার কথা কহিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে দাসকথার আভাস দিতে হইবে, বিচিত্র দাসবৃত্তান্তে পাঠকেরও তুষ্টি হইবে।

দাসত্ব প্রাচীন।

দাসত্ব পৃথিবীতে বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। আমাদের আর্য্যভূমি ভারতেও দাসের অভাব ছিল না। আমাদের সংস্কৃত কাব্য নাটকাদিতেও বিবিধ দাসের পরিচয়

সর্ব্বদা পাওয়া যায়। পঞ্চদশ দাসের মধ্যে দুই দাসই আভনয়ে প্রধান। এক কৃতদাস, অার এক ক্রীতদাস। যাহাকে মূল্য দিয়া কিনিয়া চিরদিনের জন্য দাস করা হইত, সেই ক্রীতদাস-পর্য্যায়ে পরিচিত হইত। যে অন্যরূপে দাস হইত, সেই কৃতদাস বলিয়া পরিচিত হইত। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা বলেন, আর্য্যেরা ভারতের বিদেশী প্রবাসী; শৌর্য্যবীর্য্য এবং বুদ্ধিকৌশলে ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া আদিম বর্ব্বরদিগকে দাস করিয়াছিলেন। দাসেরাই শূদ্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। এখনকার সিদ্ধান্তই হইতেছে "পূর্ব্বকালে পৃথিবীর সকল জাতিই যুদ্ধে পরাস্ত শত্রুদিগকে দাস করিতেন। এখনও আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের কোন কোন বর্ব্বরজাতি পলা যত শত্রুদিগের ভিতর সকলকে প্রাণে না মারিয়া কতকগুলাকে দাস করিয়া রাখে; শত্রুমহিলাদিগকে দাসী করিয়া রাখে। এই দৃষ্টান্তে এবং প্রাচীন ইতিবৃত্তে ও প্রবাদে নির্ভর করিয়াই ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন, অতিপূর্ব্বে সকল দেশের সভ্য অসভ্য সকল বিজয়ীই বিজিত শত্রু পুরুষদিগকে দাস করিত, শত্রু মহিলাদিগকে দাসী করিত।

আবার, অনেক লোকে দৈন্যদারিদ্র্য নিবন্ধন পুত্র কন্যাদিগকে বেচিয়া ফেলিত। দুরবস্থা অধিক হইলে, আপনাদিগকেও বিক্রয় করিত। কখনও কখনও লোকে পরের পুত্র কন্যা প্রভৃতিকে কাড়িয়া লইয়া বা চুরি করিয়া বেচিয়া ফেলিত। এইরূপেই দাসবংশের বৃদ্ধি হইত। অপিচ, দাসবংশের যত পুত্র কন্যাকেও দাস দাসী হইতে হইত।

দাস দাসী সুতরাং চিরদিন প্রধানতঃ দুই প্রকার। যাহারা মূল্য দিয়া ক্রীত হইত, তাহারাই হইত ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী, যাহারা বিনা মূল্যে দাসত্বে আবদ্ধ হইত, তাহারা হইত কৃতদাস বা কৃতদাসী। ভারতের কথা কহিবার পূর্ব্বে আমরা দুই এক কথায় অন্যান্য দেশে ইঙ্গিত করিব। সকল কথা সবিস্তর কহিতে গেলে বৃহদ্‌গ্রন্থেরই রচনা করিয়া বসিব! কিন্তু একখানা দাসায়ন বা দাসপুরাণ লেখা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, অতি সংক্ষেপে পূর্ব্ব কথার আমেজ দিয়া আধুনিক মার্কিণ দাসবংশের, দাসত্বমুক্তদাস-বংশজদিগের, বিদ্যা বুদ্ধি এবং যোগ্যতা সম্বন্ধে সংকিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া এবং একটু ইঙ্গিত করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। অবস্থান্তরে যে ব্যবস্থান্তর হয়, ইহা দেখাইয়া, রাজা প্রজা সকলকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়াই, আমাদের অভিপ্রেত।

য়িহুদির দাসত্ব।

আমাদের রাজা খৃষ্টান, বাইবেল তাঁহার বেদ। বাইবেলের প্রাচীন পত্র—ওল্ড টেষ্টামেণ্ট য়িহুদি মহাপুরুষদিগের সংকলিত, য়িহুদি ভাষায় লিখিত—য়িহুদীর ন্যায় খৃষ্টানদিগেরও পূজিত। তাই য়িহুদি দাসকথাই আমাদিগের প্রথম উল্লেখ্য। য়িহুদি দেশে ও—য়িহুদি যুগে—কৃতদাস কৃত-দাসীর ন্যায় ক্রীতদাস ক্রীতদাসীর অস্তিত্ব ছিল। যাহাদিগকে মূল্য দিয়া কেনা হইত, তাহারাই ক্রীতদাস ক্রীতদাসী হইত। যাহারা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দাস দাসী হইত, কিংবা বিনা মূল্যে অন্যরূপে দাসত্বে আবদ্ধ হইত, তাহারা কৃতদাস কৃতদাসী হইত। দ্বিবিধ দাস দাসীর বংশজ বংশজাদিগকেই দাস দাসী হইতে হইত। প্রকৃত প্রস্তাবে ক্রীতদাস ক্রীতদাসীর বংশজ বংশজাদিগকে ক্রীতদাস ক্রীতদাসী হইতে হইত না, তাহারা কৃতদাস কৃতদাসী হইত।

য়িহুদি সমাজেও স্বদেশীয় বিদেশীয় দ্বিবিধ দাস দাসীই দেখিতে পাওয়া যাইত। বিদেশীয় দাস দাসীদিগের ভিতর যুদ্ধে পরাস্ত শত্রু এবং তাঁহাদিগের পুত্রকলত্রাদিদিগেরই সংখ্যা অধিক ছিল। অপহৃত, লুণ্ঠিত এবং পরে বিক্রীত বৈদেশিক দাস দাসীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল। স্বদেশের দাস-দাসী-পর্য্যায়ে কৃত অপেক্ষা ক্রীতেরই সংখ্যা অধিক ছিল। দৈন্যনিবন্ধন পিতা মাতা কর্ত্তৃক বিক্রীত, স্বেচ্ছায় স্ববিক্রীত হইয়া স্বদেশের অনেকে দাস দাসী হইত; আর অধমর্ণ ঋণশোধে অসমর্থ হইয়া উত্তমর্ণের আরও বশীভূত হইলেও ক্রীতদাসত্বেই আবদ্ধ হইত। কেন না, ঋণশোধে অক্ষম হইলে অধমর্ণকে একপ্রকার আত্মবিক্রয়ই করিতে হইত।

আর এক প্রকার ক্রীতদাস হইত, যত দস্যুতস্কর, য়িহুদি সমাজে দস্যুতস্করদিগকে ধরা পড়িলে অপহৃত ধন সম্পত্তির প্রত্যর্পণ করিতে হইত; তাহা ছাড়া কিছু কিছু জরিমানাও দিতে হইত। যাহারা প্রত্যর্পণে ও অর্থদণ্ডে অসমর্থ হইত, তাহাদিগকেও দাসত্বে আবদ্ধ হইতে হইত।

এইরূপ দাস দাসীরাও ক্রীত-পর্য্যায়েই পরিগণিত হইত। যেখানে দাসত্বে অর্থসম্বন্ধ, সেই খানেই ক্রীতদাসত্ব।

য়িহুদিসমাজে কিন্তু দুই পথে সুব্যবস্থা ছিল। ক্রীত দাস দাসীরাও, প্রভুদিগকে উচিতরূপ মূল্য দিতে পারিলে. স্বাধীন হইত; আবার মূল্য দিতে না পারিলেও, ৭ বৎসর পরে মুক্তিলাভ করিত। সাত বৎসর ভোগদখল করিলেই প্রভুর স্বত্ব ফুরাইয়া যাইত। এ ব্যবস্থা কিন্তু কেবল স্বদেশের দাস দাসীর উপরই বর্ত্তিত। দাস দাসীর মূল্য স্থির করা কঠিন হইত না; যথোচিত মূল্যের সংগ্রহ করাও অনেকের পক্ষে সহজ হইত। সুতরাং স্বদেশের ক্রীতদাস ক্রীত দাসীর ন্যায় স্বদেশের কৃতদাস কৃতদাসীরাও মূল্য দিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারিত। আবার সাত বৎসরের পর সকলেই বিনা মূল্যেও স্বাধীন হইত। কিন্তু বৈদেশিক দাস দাসীরা এরূপে মুক্তিলাভ করিতে পাইত না। তবে রাজ্যের ব্যবস্থা অনুসারে ৫০ বৎসর অন্তর যখন সার্ব্বজনিক দাসত্বমুক্তির আদেশ হইত, তখন সকলেই মুক্তিলাভ করিবার অধিকার পাইত।

গ্রীসের দাসত্ব।

গ্রীসেও স্বদেশীয় বিদেশীয় এবং ক্রীত ও কৃত দাস দাসী অনেক ছিল। যে যে কারণে য়িহুদিসমাজে দাসত্ব ঘটিত, গ্রীক সমাজেও সেই সেই কারণেই দাসত্ব ঘটিত। গ্রীসের সকল রাজ্যেই ক্রীতদাস ক্রীতদাসীর ন্যায় কৃতদাস কৃতদাসী ছিল। দাস দাসীর ক্রয় বিক্রয় উপলক্ষে একটা রীতিমত দাসবাণিজ্যই চলিত। আর দাসব্যবসায়ের জন্যই মানুষ-চুরীর ভয়ঙ্কর প্রাদুর্ভাব ছিল। গ্রীসের বিখ্যাত জ্ঞানী—গ্রীসের বৃহস্পতি—ইউলিসীসকেই একবার আর একটু হইলে অপহৃত হইয়া দাসত্বে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল! গ্রীসের স্বদেশীয় দাসবংশজেরা কিন্তু ক্রমে কতকটা মুক্তসম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল। ইহারা কৃষক ও শ্রমজীবীর কার্য্য করিয়া কিছু কিছু অর্থোর্জ্জনও করিতে পারিত। দাসত্বসম্বন্ধে গ্রীসের সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ বৃহস্পতি-কল্প এরিষ্টটল যে মতের প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকের পূর্ব্বেই বিদিত হইয়াছে। তিনি মানবজাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন; অসভ্য বর্ব্বর নির্ব্বোধ ভাগকে তিনি দাসপর্য্যায়ে ফেলিয়াছিলেন, সভ্য বুদ্ধিমানের ভাগকে প্রভু-পর্য্যায়ে পরিগণিত করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ দার্শনিক প্লেটো বলিতেন, নিজ গ্রীসের কোন ব্যক্তিই দাসত্ব বন্ধনের বাধ্য নহে। গ্রীসের যে স্বল্প-স্বাধীন দাস-বংশজদিগের কথা কহিয়াছি, তাহারা প্রদেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইত। স্পার্টায় তাহারা ছিল হেলট, থেসেলি-প্রদেশে ছিল পেনেস্তী, বাইজান্তিয়মে হইয়াছিল বিথিনীয়ান। ইহারাই শেষে মধ্যযুগের খৃষ্টান ইউরোপে সার্ফ-পর্য্যায়ে পরিণত হইয়াছিল। এই সকল স্বল্পস্বাধীন দাস ও দাসবংশজ স্বদেশেই থাকিত; কোন প্রভুই নিজের এরূপ দাস দাসীকে বিদেশে চালান দিতে পাইতেন না। বৈদেশিক দাস-বাণিজ্যে এরূপ দাস দাসী পণ্য হইতে পারিত না। এরূপ কোন দাস বা দাসীকে কেহই পরিবারচ্যুত করিতে পাইত না, কোন দাস বা দাসীই স্বপরিবার হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হইত না।

এইরূপ দাস দাসাদিগের অবস্থা যেরূপ ছিল, অর্থে লব্ধ ক্রীত দাস দাসীদিগের অবস্থা সেরূপ ছিল না। অর্থলব্ধ দাস দাসীরা প্রভুর গো-মহিষাদির ন্যায় সম্পত্তিমধ্যেই পরিগণিত ছিল; ইহাদিগকে প্রভু যদৃচ্ছ দান বিক্রয় করিতে পারিতেন। এথেন্স এবং করিন্থ প্রভৃতি কোন কোন বাণিজ্যপ্রধান রাজ্যে দাস দাসীর বাণিজ্যটা খুবই চলিত। অসভ্য বর্ব্বর ভিন্নজাতীয় ভিন্নদেশীয় লোকেই এইরূপ ক্রীতদাসত্বের অধীন ছিল; সংখ্যাও তাহাদের কম ছিল না। দাসবাণিজ্যের জন্য নানা স্থানে স্বতন্ত্র হাট বাজার প্রতিষ্ঠিত ছিল। করীন্থের দাসহট্টে দাসবাণিজ্যের ধুম লাগিয়া যাইত। এই সকল দাস দাসীকে গৃহস্থ প্রভুর সকল কার্য্যই করিতে হইত। ছোকরা গোছের দাস দাসীরা প্রভুর পুত্র কন্যাদিকে স্কুলে লইয়া যাইত। বয়ঃস্থ ও বয়ঃস্থাদিগকে তুন্দুলে রুটি করিতে হইত, পাকশালায় পাককার্য্য করিতে হইত, দরজির কাজ করিতে হইত, খনির কাজ করিতে হইত, শিল্পশালায় শিল্পের কাজ করিতে হইত, আর খেত খোলায় কৃষাণের কাজও করিতে হইত, আবার নাবিক হইয়া নৌকা জাহাজেও খাটিতে যইত। দাস দাসীরা গতর খাটাইয়া যাহা রোজগার করিত, তাহা প্রভুর হস্তে পড়িত। ক্রীত দাস দাসীদের ত কথাই নাই, তাহাদের বংশজ বংশজাদিগকেও এই দলে পড়িতে হইত। এথেন্সরাজ্যের পুলীসে, পল্টনে, জেলে, সরকারী নীলামে এবং অন্যান্য

সরকারী কার্য্যেও এইরূপ দাসদিগকে নিযুক্ত করা হইত। এশিয়ামাইনরের যত গ্রীক উপনিবেশেই দাসব্যবসায়ের বড় ধূম ছিল। চারিদিকের বর্ব্বরদিগকেই এইরূপ দাস-বাণিজ্যের পণ্য হইতে হইত। থ্রেস প্রভৃতি স্থানের পিতা মাতারাও পুত্রকন্যাদিগকে বেচিয়া ফেলিত। কিন্তু সমগ্র গ্রীকরাজ্যে—বিশেষতঃ এথেন্স-রাজ্যে—সর্ব্ববিধ দাস দাসীদিগের প্রতিই প্রভুদিগকে অনেকটা সদ্ব্যবহার করিতে হইত। বিখ্যাত বাগ্মী ডিমস্থিনীশ বলিতেন, "অন্য স্থানের স্বাধীন অপেক্ষা এথেন্সের দাস দাসীরও সুখ স্বচ্ছন্দ অধিক"। দাসমুক্তিও গ্রীসে সর্ব্বদা হইত। কাহারও দাস দাসীর প্রতি যদি অন্য কেহ দুর্ব্ব্যবহার করিত, তাহা হইলে উক্ত দাস দাসীর অধিকারী এই ব্যক্তির কাছে যথোচিত খেসারত লইতে পারিতেন। এই জন্যও দাস দাসীর অবস্থা গ্রীসে অনেকটা ভাল ছিল। দাস কিন্তু স্বাধীন পুরুষের ন্যায় লম্বা চুল রাখিতে পাইত না, কোন সমিতি সভায় বা সাধারণ উৎসবগৃহে বা ক্রীড়াগারে প্রবেশ করিতে পাইত না; তবে ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার সকলেরই ছিল। দক্ষিণ আফরিকার নেটাল রাজ্যে ভারতসন্তানেরাও ত শ্বেতপুরুষদিগের সমিতিসভায় যাইতে পারে না; পথে ঘাটেও তাহাদিগকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়া যাওয়া আসা করিতে হয়। গ্রীসে দাস দাসী ছিল অসংখ্য। ক্রীত দাস দাসী এক এথেন্স রাজ্যেই ছিল এক সময়ে ২ লক্ষ; স্বাধীন নর নারীর প্রায় তিন গুণ!

রোমের দাসত্ব।

রোমরাজ্যের আইনে অনেকটা আধুনিক ঔদার্য্য বিরাজ করিত; কিন্তু দাস দাসী রোমরাজ্যেও ছিল। সুতরাং ব্যবহারশাস্ত্রবিশারদ উকিল কৌঁসুলিরা স্থির করিয়াছিলেন, "দাসত্ব ভাগবত আইনে নিষিদ্ধ হইলেও, লৌকিক বা জাতীয় আইনে নিষিদ্ধ নহে। আর যুদ্ধে বিজিত বন্দীভূত শত্রুকে প্রাণে না মারিয়া, দাসত্বে আবদ্ধ করা ধর্ম্মসঙ্গত। অপিচ, যে ব্যক্তি স্বয়ং বিক্রীত হয়, তাহাকে দাসত্বে বাধ্য করাও নীতিবিরুদ্ধ নহে।"

প্রথমে কিন্তু রোমরাজ্যেও দাস দাসীর প্রতি বড়ই উৎপীড়ন অত্যাচার হইত; প্রভু নিজের দাস দাসীকে ক্রুসে চড়াইয়া মারিয়া ফেলিতেও পারিতেন। শেষে এতটা অত্যাচার ছিল না বটে, কিন্তু দাস দাসীর প্রতি কঠোর ব্যবহার রোম রাজ্যের সর্ব্বত্রই চলিত। রোমরাজ্যের যে সকল দাসকে সম্ভ্রান্তসমাজের নিষ্ঠুর আমোদ চরিতার্থ করিবার জন্য, ক্রীড়াক্ষেত্রে অন্যান্য দাস বা সিংহ ব্যাঘ্রাদির সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়া, প্রাণ দিতে হইত, তাহারাই গ্লাডিয়েটর বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত। গ্রীসেও এইরূপ নিষ্ঠুরতা ছিল; রোম গ্রীসের কাছেই শিক্ষা করিয়াছিল। রোমের ছোট বড় সকলেই এই নিষ্ঠুর আমোদের পক্ষপাতী ছিলেন; রাজা ও সম্রাটেরা ইহাতে উৎসাহ দিতেন। জগদ্বিখ্যাত জুলীয়স সীজরও উৎসাহ দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সম্রাটদিগের ভিতর কনষ্টাণ্টাইনই প্রথমে এই পৈশাচিক উৎসবে বাধা দেন। ইতিহাসে দেখিতে পাই,

"২৬৪ খৃঃ পূর্ব্বে মার্কস ব্রুটস এবং ডিশস ব্রুটস পিতৃশ্রাদ্ধে এই আমোদের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। সাধারণতন্ত্রের শেষাবস্থায় এই প্রথার খুবই পসার বাড়িয়া উঠে। মাজিষ্টর কলেক্টর প্রভৃতি সরকারী কর্ম্মচারীদিগেরত কথাই ছিল না, যাঁহারা মহাসভায় নির্ব্বাচিত হইবার জন্য উমেদার হইতেন, তাঁহারাও এই নিষ্ঠুর ক্রীড়ার অনুষ্ঠান করিয়া ভোটসংগ্রহের পথ মুক্ত করিতেন। সাধারণতন্ত্রের অবসানে সম্রাটদিগের আমলেই নিষ্ঠুর আমোদের ভয়ঙ্কর স্রোত বহিতে থাকে জুলীয়স সীজরই ৩২০ যোড়া দাসকে নিষ্ঠুর আমোদে বধ্য করেন। সম্রাট টাইটস একবার শত দিবস ধরিয়া সিংহ ব্যাঘ্রাদির সহিত দাসদিগের প্রাণান্তক যুদ্ধ করাইয়াছিলেন। সম্রাট ত্রেজানের আদেশে ১২৩ দিন নিষ্ঠুরতা চলিয়াছিল। তাহাতে ১০ হাজার দাসকে, হয় পরস্পর কাটাকাটি না হয় সিংহ ব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধ, করিতে হইয়াছিল। এই নিষ্ঠুর প্রথায় অনেক মহাত্মা বরাবরই আপত্তি করিতেন, কিন্তু প্রথা একেবারে রহিত করা সহজ ছিলনা। বিখ্যাত রাজনৈতিক ও বাগ্মী কাইকেরো বলিয়াছিলেন, "সরকারী কার্য্যে উমেদার হইবার পূর্ব্বে দুই বৎসরের মধ্যে কেহই এই আমোদের আয়োজন করিতে পারিবেন না।" কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবিত নববিধান বাহাল হয় নাই। করুণাময় সম্রাট অগষ্টস ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, "যাহার চারিলক্ষ মুদ্রার সম্পত্তি নাই, সে এরূপ আমোদের আয়োজন করিতে পাইবে না। আর, কোন ব্যক্তিই বৎসরে দুই বারের অধিক আয়োজন করিতে পাইবে না।" অব-

শেষে ৩২৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট কনষ্টান্টাইনই এই আমোদ রহিত করিবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু রাজকীয় নিষেধেও চিরন্তন আমোদের একেবারে তিরোভাব হয় নাই। শেষে যখন এশিয়ার সন্ন্যাসী টেলিমেকস রোমরাজ্যে গিয়া এই নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদ করিয়া লোকের মনে বিরাগ বিদ্বেষ উৎপাদিত করেন, তখনই — ৪০৪ খৃষ্টাব্দে—নির্দ্দয়তার নিবৃত্তি হয়। কিন্তু সন্ন্যাসীও কেবল কথার প্রতিবাদে নিষ্ঠুরতার নিবৃত্তি করিতে পান নাই। একদা এক ক্রীড়াক্ষেত্রে দুইটী দাস, সম্ভ্রান্ত দর্শক দর্শিকাদিগের সন্তোষের জন্য, প্রাণদান করিতে উদ্যত হইয়াছে, দেখিয়া টেলিমেকস ছুটিয়া গিয়া তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দিলেন; কিন্তু দর্শকদিগের লোষ্ট্রনিক্ষেপে তাঁহাকেই হত হইতে হইল। এই ঘটনার পরেই সম্রাট অনোরীয়স নিষ্ঠুর আমোদ একেবারেই রহিত করিয়া দেন। এই সৎকার্য্যের জন্যই তাঁহার অনোরীয়স নাম সার্থক। প্রথম প্রথম যুদ্ধের বন্দী এবং দস্যুদিগকেই গ্লাডিয়েটর হইয়া আত্মবলি দিতে হইত। শেষে যখন আমোদের স্রোত প্রবল হইয়াছিল, তখন সকল দাসকেই বধ্যমধ্যে পরিগণিত হইতে হইত। সম্রাটেরা উৎসাহ দিতেন। কমোডসের মত অধম সম্রাটেরা ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রবেশপূর্ব্বক স্বহস্তে দাসহত্যা করিয়া গর্ব্ব করিতেন। যে সকল দাসকে গ্লাডিয়েটর করা হইত, তাঁহাদিগের কাটাকাটি শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র স্কুল ছিল। কিন্তু কোন কোন সময়ে কোন কোন গ্লাডিয়েটর-দাসও আত্মবলিদানে বা সহদাসহত্যায় অসম্মত হইয়া গোলযোগ ঘটাইত। গ্লাডিয়েটর স্পার্টাকস নিজে প্রতিকূল হইয়া, আর সকল দাসকেই প্রতিকূল করিয়াছিলেন। রোমরাজ্যে এই জন্য ঘোরতর দাস-বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। ভবিষ্যৎ নিষ্ঠুরতানিবৃত্তি পক্ষে এটা একটা হেতু হইয়াছিল।"

কিন্তু যখন গ্লাডিয়েটরদিগকে কষাইখানার বধ্য-পর্য্যায়ে পরিণত হইতে হইত, তখনই রোম সভ্যতার চরমে উঠিয়াছিল!

রোমের দাস দাসীরা যে মিলনে আবদ্ধ হইত, তাহা দাম্পত্যবিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইত। এরূপ বিবাহও আইনের চক্ষে অগ্রাহ্য ছিল না। দাসীর সন্তানদিগকে কিন্তু মাতার সঙ্গেই থাকিতে হইত, মাতার প্রভুকেই প্রভু বলিয়া মানিতে হইত। বাছুরও ত ষাঁড়ের হয় না, গাইয়ের হয়। গ্রীসের মত রোমেও দাসমুক্তির ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কাহারও দাস দাসীকে কেহ আশ্রয় দিতে পারিত না। আমেরিকার দাস-পোষক শ্বেতপুরুষেরা ঐ নজীর শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন। রোম রাজ্যেও দাস দাসীর সংখ্যা করা সহজ ছিল না। এক এক ধনপতি দুইশত দাস দাসী লইয়া সংসার করিতেন। শ্রমের কার্য্যে গ্রীসের দাস দাসীদিগের যেরূপ অবস্থা ব্যবস্থা ছিল, রোমেরও সেইরূপ হইয়াছিল।

খৃষ্টান ইউরোপে।

ইউরোপ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পরও দাসত্ব কলঙ্কে মুক্ত হয় নাই; দাস-পীড়নের কিঞ্চিৎ খর্ব্বতা হইয়াছিল বটে, কিন্তু দাসত্ব-প্রথা সহজে তিরোহিত হয় নাই। রোমক সম্রাট কনষ্টান্টাইন, গ্লাডিয়েটর-হত্যায় বাধা দিয়া স্বীয় দয়াল নাম সার্থক করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনিই আবার দয়া-প্রণোদিত হইয়াই, দীনহীন পিতামাতাকে সন্তানবিক্রয়ে অধিকার দিয়াছিলেন। ৫২৯ খৃষ্টাব্দে জষ্টিনীয়ান দাসমুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু একেবারে দাস-মুক্তির ব্যবস্থা তিনিও করিতে পান নাই। খৃষ্টধর্ম্মের প্রধান প্রচারক ও পাদরি মহাশয়েরা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, "যে প্রভু আদালতের আদেশ বিনা নিজের দাস দাসীর বধ করিবে, সেই সমাজচ্যুত এবং পতিত হইবে।" এ ব্যবস্থায় নিষ্ঠুরতা কিঞ্চিৎ কমিয়াছিল, কিন্তু দাসত্ব তিরোহিত হয় নাই। অখৃষ্টান রোম-রাজ্যে দাস দাসীদিগের যে বিবাহ আইনের গ্রাহ্য ছিল, খৃষ্টান রোমরাজ্যে সেই বিবাহ সহজে ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্গত হইতে পায় নাই। সম্রাট বেশিল ৮৬৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, ৮৮৬ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। দাস দাসীর বিবাহ তাঁহারই সময়ে এবং তাঁহারই চেষ্টায় ধর্ম্ম-সঙ্গত হইয়া ধর্ম্মযাজকদিগের গ্রাহ্য হয়। খৃষ্টান রোমক-রাজ্যেও যুদ্ধে বন্দীভূত বর্ব্বরদিগকেই দাস দাসীর সংখ্যা-বৃদ্ধি করিতে হইয়াছিল; নবাধিকৃত অসভ্য রাজ্যের অনেক নর নারীকেই দাসত্বে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল।

সুদূর ব্রিটেনেও।

সুদূর ব্রিটেন-দ্বীপেও দাসত্বপ্রথা প্রচলিত ছিল। বিজেতা এংলোসেক্‌সন জাতি বিজিত আইরিষ নরনারী-দিগকে দাসত্বে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। দাস দাসীর ব্যবসায় বাণিজ্যেও তাঁহারা উদাসীন ছিলেন না। সুন্দর সুন্দরী আইরিষ নর নারীদিগের, দাস-বাজারে দর বড় চড়া ছিল।

ইউরোপের অনেক লোকেই ইংলণ্ডের হাট হইতে আইরিষ দাস দাসী কিনিয়া আনিতেন। ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল সহরেই সর্ব্বপ্রধান দাসহট্ট প্রতিষ্ঠিত ছিল। আইরিষদিগের প্রতি অত্যাচার খুবই অধিক ছিল। কিন্তু শেষে বিজেতা এংলোসেক্‌সনদিগকেও নর্ম্মাণ বিজেতা উইলিয়ম এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের হস্তে বিজিত হইতে হইয়াছিল। তখন তাহাদিগকেও আইরিষদিগের সমান আসনে বসিতে হইয়াছিল!

নর্ম্মাণদিগের আধিপত্যকালে অনেক এংলোসেক্‌সনকে দাসত্বের অধীন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তখন অন্যান্য ইউরোপীয় প্রদেশের ন্যায় ব্রিটেন দ্বীপেও সেভ-সম্প্রদায় সার্ফ সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল; পূর্ব্বতন পণ্য দাস দাসীদিগকে নর্ম্মাণদিগের ভৌম দাস দাসী হইতে হইয়াছিল। মধ্যযুগে খৃষ্টান ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই সার্ফ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। নিজ ইউরোপের দাস-ব্যবসায় মধ্যযুগে প্রশমিত হইয়াছিল, সার্ফদিগকে স্বদেশে ও স্বপরিবারে থাকিয়াই প্রভুদিগের দাসত্ব করিতে হইত। ক্রমে সার্ফ সম্প্রদায়েরও তিরোভাব হইয়াছে। কিন্তু সে কথা এখন কহিব না; এখন মুসলমান রাজ্য ও মুসলমান জাতির কথাই কহিব।

দাসত্বে মুসলমান।

দাস দাসীর প্রতি মুসলমানদিগের চিরন্তন অনুরাগ। মুসলমান দাস-ব্যবসায়ীরা ইউরোপ হইতে খৃষ্টান নর নারীদিগকে আনিয়া দাস্যে আবদ্ধ করিবার জন্য লালায়িত ছিলেন। খৃষ্টান দাস দাসীর বাণিজ্যে এশিয়া এবং উত্তর আফরিকার মুসলমানেরা কুবের হইয়া উঠিতেন। শেষে আফরিকার নর নারীই খৃষ্টান আমেরিকার প্রধান পণ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল বটে, প্রথমে কিন্তু ইউরোপের খৃষ্টানই আফরিকার পণ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। ভিনীশের বণিকদিগের দাসবাণিজ্য ছিল মুখ্য বাণিজ্য, দ্রব্য সামগ্রীর বাণিজ্য ছিল গৌণ বাণিজ্য। উত্তর আফরিকার বার্ব্বরি রাজ্য পাঠকের পরিচিত। বার্ব্বরির কর্সেয়ার বা জলদস্যুদিগের সহিতও কবিবর বায়রণ প্রভৃতির কল্যাণে পাঠকের পরিচয় হইয়াছে।

বার্ব্বরির মুসলমান জলদস্যু কর্সেয়ারদিগের জ্বালায় ইউরোপকে অস্থির হইতে হইয়াছিল। ডন্‌কুইক্‌সোর লেখক সার্ভেন্টীশকে পর্যান্ত স্বদেশ স্পেন হইতে নীত হইয়া উত্তর আফরিকার অলজীয়র্স নগরের দাসাগারে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। দাসাগারে তাঁহাকে থাকিতে হইয়াছিল পঁচিশ হাজার দাস দাসীর ভিতর, পাঁচ বৎসর অবশেষে তাঁহার আত্মীয়েরা ১৫০০ টাকা জানখালাসী দিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন। দাস দাসীর বাজারদর ছিল তখন ৪৫০ হইতে ৬০০ টাকা পর্য্যন্ত। কিন্তু বড় লোকের মূল্য অধিক ছিল। তাই সার্ভেন্টীশকে ১৫০০ টাকায় মুক্তিলাভ করিতে হইয়াছিল। দাসব্যবসায়ী মুসলমানেরা উচিত মূল্য পাইলেই দাস দাসীকে মুক্তি দিত। এজন্য ইউরোপের খৃষ্টানেরা নানা স্থানে দাসমুক্তির ফণ্ড প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। খৃষ্টান নর নারীর দাসত্বমুক্তির জন্য চারিদিকের মঠে অর্থ সংগৃহীত হইত। বিলাতের মঠে মন্দিরে গির্জ্জা চাপেলেও অর্থ সংগ্রহের ক্রটি হইত না। কর্সেয়ার বা সাগরিক দস্যুদিগের উৎপাত ভূমধ্য সাগরে এবং পার্শ্ববর্ত্তী সাগর-ভাগে অনেক দিন ছিল, শেষে ইংরেজ ফরাসী ও মার্কিণের চেষ্টায় সেই অত্যাচার নিবৃত্ত হয়, এপক্ষে মার্কিণই অধিক প্রশংসনীয়।

ইউরোপের সার্ফ।

ইউরোপের সর্ব্ববিধ দাস দাসীই ক্রমে সার্ফ সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল। বিজিত অধিবাসীদিগকে প্রায়ই এইরূপ দাসত্বে আবদ্ধ হইতে হইত। আবার দুর্ভিক্ষাদি মহাসাসনে অনেক স্বাধীন দীন হীনও আত্মবিক্রয় করিয়া পরাধীন হইত। অনেক দীন ভক্ত আবার মঠ মন্দিরের কৃতদাস হইয়া ধর্ম্মসঞ্চয় করিত। পাদরিরা ভজনা দ্বারা ইহাদিগের মুক্তিপথ প্রশস্ত করিতেন, ইহারাও তাঁহাদিগের দাসত্ব করিয়া শান্তিলাভ করিত। এরূপ ধর্ম্মদাস না থাকিলেও ত ভারতে নবযুগে এরূপ ধর্ম্মদাসীর অভাব ছিল না। মাদ্রাজের দেবনর্ত্তকীরা যে, পুরাতন ধর্ম্মদাসীদিগেরই স্থান পূর্ণ করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সার্ফ বা মাধ্যযুগীন দাস দাসীদিগের অবস্থা পূর্ব্বতন দাস দাসীদিগের অপেক্ষা কিছু ভাল ছিল। অনেক প্রদেশেরই সার্ফেরা বিনা পীড়নে কালযাপন করিতে পাইত। ইংলণ্ডের পূর্ব্বতন দাস দাসীদিগের ন্যায় অনেক এংলোসেক্‌সনকেও

যে, নর্ম্মাণ রাজাদের আমলে সার্ফ হইতে হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইংলণ্ডের সার্ফ প্রকৃতই ভৌম দাস বলিয়াই পরিচিত ছিল; তাহাদিগকে স্বভূমিচ্যুত হইতে হইত না। কিন্তু শেষে সার্ফ সম্প্রদায়েও দুইটা উপসম্প্রদায় হইয়া পড়িয়াছিল। কতকগুলি নানারূপ অধিকারভোগ করিতে পাইত, কতকগুলি পাইত না। যাহারা পাইত না, তাহারা পূর্ব্বতন দাস্যভাবেই আবদ্ধ ছিল। ইহাদিগকে ভূমিচ্যুতও হইতে হইত। সুতরাং ইহারা ভৌমদাস বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য ছিল না। কিন্তু ভৌম অভৌম সকল সার্ফই প্রভুর অতি নিষ্ঠুরতা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য রাজার আশ্রয় লইতে পাইত, এই জন্যে প্রভুদের নিষ্ঠুরতা অনেকটা প্রশমিত থাকিত। ইংলণ্ডের সার্ফসন্তানকে পিতারই অধীন হইতে হইত। জারজ সার্ফ সন্তানেরা সুতরাং স্বচ্ছন্দে স্বাধীনতালাভ করিত। সার্ফ সম্প্রদায়ে এই জন্যই গুপ্ত প্রেম ও ব্যভিচারের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ইতিহাসের ন্যায় কাব্য নাটক এবং নবন্যাসেও ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

সার্ফসম্প্রদায়ের তিরোভাব।

তিরোভাব ক্রমে ক্রমে—অতিবিলম্বে হইয়াছিল। ইংলণ্ডে রাজ্ঞী এলিজেবেথের সময়েও সার্ফপ্রথার তিরোভাব হয় নাই; রাজা প্রথম চার্লসের সময়েও সার্ফসম্প্রদায়ের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়াছিল। যে ভীষণ গৃহযুদ্ধে রাজা প্রথম চার্লসের হত্যা হয়, যাহার জন্য ইংলণ্ডে কিছুদিন সাধারণ-তন্ত্রের নাম করিয়া ক্রমোয়েল একাধিপত্য করেন, যাহার জন্য শেষে পার্লেমেণ্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, সেই গৃহযুদ্ধ ইংলণ্ডের লৌকিক স্বাধীনতার পথ যে, বিলক্ষণ মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, তাহা ইতিহাসবিৎ পাঠকের অবিদিত নহে। সার্ফদিগের দাস্যভাবও সেই সূত্রেই তিরোহিত হইয়াছিল। কিন্তু খনির ভিতর যাহাদিগকে মজুরী করিতে হইত, তাহাদের দাসত্ব অনেক দিন ছিল; রাজা তৃতীয় জর্জ্জের সময়েই তাহাদিগের দাসত্ব ঘুচাইবার আইন বাহাল হইয়াছিল। ফরাসিরাজ্যে সার্ফ-প্রথা বহুকাল বজায় থাকিয়া প্রথম বিপ্লবের স্বাধীনতা-পূজার সময়ে তিরোহিত হয়। যেখানে কৃষি-কার্য্যের আধিপত্য ছিল, সার্ফ বা ভৌম দাসদিগের সেই-খানে উপযোগিতা ছিল। ইতালিরাজ্যে অতিপূর্ব্বেই বাণিজ্যের আধিপত্য হইয়াছিল। তাই পঞ্চদশশতাব্দীতেই ইতালির সার্ফ বা ভৌমদাসেরা মুক্তিলাভ করিয়াছিল। জর্ম্মণীর প্রুষিয়া রাজ্যে সার্ফ প্রথার তিরোভাব হইয়াছিল উনবিংশশতাব্দীতে। মহাত্মা বন ষ্টীনের কল্যাণেই প্রুষিয়ার কলঙ্ক-মোচন হইয়াছে। রুষকে সর্ব্বশেষে কলঙ্কমুক্ত হইতে হইয়াছে, সম্রাট দ্বিতীয় এলেকজন্দরই ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে স্বীয় সাম্রাজ্যের অসংখ্য সার্ফ বা ভূস্বামিগতপ্রাণ ভৌম দাসকে সপরিবারে মুক্তি দিয়া ধন্য ধন্য হইয়াছিলেন।

ভারতের কথা।

দাস ভারতে ছিল পনর প্রকার। নারদই বলিতেছেন,

"গৃহজাতস্তথা ক্রীতো লব্ধোদায়াদুপাগতঃ।
অন্নাকালভৃতস্তদ্বদাহিতঃ স্বামিনা চ যঃ॥
মোক্ষিতো মহতশ্চর্ণাৎ যুদ্ধে প্রাপ্তঃ পণেজিতঃ।
তবাহামত্যুপগতঃ প্রব্রজ্যাবসিতঃ কৃতঃ॥
ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়স্তথৈব বড়বাকৃতঃ।
বিক্রেতাচাত্মনঃ শাস্ত্রে দাসাঃ পঞ্চদশস্মৃতাঃ"॥

গৃহজাত অর্থাৎ দাসীতে উৎপন্ন, দায়াৎ উপাগতঃ অর্থাৎ উত্তরাধিকারসূত্রে অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় প্রাপ্ত, অন্নাকালভৃতঃ অর্থাৎ দুর্ভিক্ষে পোষিত, ঋণ-মুক্ত, যুদ্ধে জিত, পণে বা দ্যূতক্রীড়ায় নল শ্রীবৎস প্রভৃতির ন্যায় জিত, "আমি তোমার দাস হইলাম," এই বলিয়া স্বয়ং উপগত, প্রব্রজ্যাবসিত অর্থাৎ সন্ন্যাস হইতে ভ্রষ্ট এবং দাসরূপে পরিণত, কৃত অর্থাৎ এই কারণে এত কালের মিয়াদে আমি তোমার দাসত্ব করিব, এইরূপ সর্ত্তে আবদ্ধ, ভক্ত দাস অর্থাৎ সুভিক্ষেও ভাতের জন্য দাসীভূত, বড়বাকৃত অর্থাৎ বড়বা বা দাসীর লোভে স্বেচ্ছায় দাসত্বে আবদ্ধ, এইরূপে দাস ভারতে ছিল, পঞ্চদশবিধ। কিন্তু বস্তুগত্যা—অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও এই পঞ্চদশবিধ দাসই দুই পর্য্যায়ে পরিগণিত হইতে পারিত। যে মূল্য সহযোগে ক্রীত হইত, সেই ছিল ক্রীত দাস, আর যাহারা এইরূপ ক্রীত না হইয়াও দাস হইত, তাহারা—সেই চৌদ্দ দাসই—কৃত দাস ছিল। দাস্যভেদে কর্ম্মভেদ ছিল। কোন কোন দাস দাসীকে নীচকর্ম্ম করিতে হইত; সকলকে করিতে হইত না।

দাসত্বপ্রথা মুসলমানদিগের সময়েও ভারতে প্রবল ছিল। মুসলমান নরপতিরা দাস দাসী—বান্দা বান্দী—রাখিবার

জন্য লালায়িত ছিলেন। কিন্তু তাহাদিগের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার খুব কমই হইত। কোন কোন বাঁদী বেগম হইত। প্রকৃত বেগমত্ব-লাভ সকলের ভাগ্যে ঘটিত না, কিন্তু কার্য্যে বেগমত্ব অনেকেই করিতে পারিত। দাসদিগের ভাগ্যও সময়ে সময়ে সুপ্রসন্ন হইত, বাদশাহ নবাবের সংসারে থাকিলে ভাগ্যপ্রসাদ একান্ত দুর্লভ হইত না। মুসলমান ধনপতিরাও দাস দাসীর পোষণে উদাসীন ছিলেন না। ধনপতি না হইয়াও অনেকে দাস দাসী রাখিতেন। ভারতের কোন কোন মুসলমান সংসারে এখনও গুপ্ত দাস্যপ্রথা প্রচলিত আছে কি না, আজ আমরা ঠিক করিয়া হলপ লইয়া বলিতে পারি না; কিন্তু বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যে, কোন কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান্ সংসারে বাঁদী ছিল, তাহা আমরা জানি। পূর্ব্ববঙ্গের কোন জেলার কোন প্রধান সহরের কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান ধনপতির অন্দরের বাঁদী, কোন সুযোগে পলাইয়া আসিয়া, কোন কোন রাজপুরুষের আশ্রয় লইয়াছিল, তাহা বোধ হয় আমাদের ন্যায় আরও অনেকে জানেন। পঞ্চাশ বৎসরের খবর আমরা দিতে পারি, সে সময়ে ঢাকা অঞ্চলের কোন কোন হিন্দুসংসারেও ক্রীতদাসী রাখিবার নিয়ম ছিল। একটী সদ্গোপজাতীয়া যুবতী কোনরূপে কোন সংসারে ধৃত হইয়া, সেই সংসারেই প্রবীণা হইয়া, আবার কোন উপায়ে মুক্তিলাভ করিয়া, কলিকাতায় আসিয়াছিল; কলিকাতা হইতে স্বগ্রামে গিয়া বদ্ধ হইয়াছিল; ইহা আমাদিগের শোনা নহে, দেখা। বাঁদীপুত্রকে নবাবপুত্র হইতে আমরাও দেখিয়াছি। হিন্দু সংসারের হিন্দু দাসবংশজদিগকে যে, এখনও নফরবংশজ বলিয়া পরিচিত হইতে হয়, ইহা বোধ হয় ঢাকা অঞ্চলের অনেক মহাশয়ই আমাদিগকে বলিয়া দিবেন।

দাসে কোম্পানি।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি যে, অন্যান্য অনেক দ্রব্যের ন্যায় এদেশে দাস দাসীর ব্যবসায়ও করিতে অপ্রস্তুত ছিলেন না, তাহা ইতিহাসবিৎ পাঠকের নিশ্চিতই বিদিত আছে। নোলানের ভারতীয় ইতিহাসে দেখিবেন, "১৬৮৩ অব্দের জুলাই মাসে এবং ১৬৮৪ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে, বোম্বাই সুরাটের অধ্যক্ষ কোম্পানির প্রধান কর্ম্মচারী, বিলাতের অধ্যক্ষসভা হইতে যে আদেশপত্র পাইয়াছিলেন, তাহাতে দাস ব্যবসায়ের কথাই কথিত হইয়াছিল। দেখা গিয়াছে, ঐ সময়ে অন্যান্য মালের ন্যায় সুরাটের কুঠী হইতে দাস দাসীরও রপ্তানি হইত। ঐ সময়েই সেণ্টহেলীনা দ্বীপটাও ইংলণ্ডেশ্বর ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দিয়াছিলেন। সেই দ্বীপের জন্য দাস দাসী আবশ্যক হইত; আর সেই দ্বীপের জন্য কোম্পানির অধ্যক্ষেরা সুরাটের কুঠীর অধ্যক্ষকে ক্রমাগত দাস দাসী পাঠাইতে বলিয়াছিলেন। আদেশপত্রে লেখা ছিল, সেণ্টহেলীনার আবাদের জন্য প্রচুর দাস আবশ্যক; কিন্তু দাসেরা দাসী না হইলে স্থির থাকে না, মধ্যে মধ্যে ক্ষেপিয়া উঠে। অতএব দাস দাসী দুই পাঠাইতে হইবে।" হুকুম যে, তামিল হইত না, তাহাত আর মনে করিবার হেতু নাই।

লম্পটশিরোমণি দ্বিতীয় চার্লস ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসিয়া, ১৬৮৫ পর্য্যন্ত বিরাজ করিয়াছিলেন। ১৬৮৫ সালেই দ্বিতীয় জেমস রাজা হন। ১৬৮৩।৮৪ অব্দে দ্বিতীয় চার্লসই ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন; রাজা দ্বিতীয় চার্লস নিজে দাস দাসী ভাল বাসিতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহারই সময়ে দাস ব্যবসায়ে মন দিয়াছিলেন। ১৬৮৩ অব্দের মে মাসে রাজা দ্বিতীয় চার্লসের অনুরোধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ত্তারা সুরাটের কর্ত্তাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মে পাঠককে মুগ্ধ হইতে হইবে। পত্রখানির অবিকল অনুবাদ করিয়া দিই।

রাজার জন্য দাস দাসী।

কোম্পানির অধ্যক্ষেরা সুরাটের অধ্যক্ষকে লিখিয়াছিলেন, "ইংলণ্ডেশ্বর আমাদিগকে ভারতে পত্র লিখিতে আদেশ করিয়াছেন। আপনি তাঁহার জন্য একটী দাস ও দুইটী দাসী পাঠাইয়া দিবেন। দাস দাসীদিগের খর্ব্বাকৃতি হওয়া আবশ্যক। দাসের বয়স হইবে জোর ১৭ বৎসর, দাসী দুইটীর ১৪ বৎসর করিয়া। যাহারা খর্ব্বাকৃতি হইয়াও দেখিতে সুশ্রী, তাহাদিগকেই পাঠাইবেন। কোম্পানির নিজের জাহাজেই যেন উহাদিগকে পাঠান হয়। জাহাজের অধ্যক্ষকে বলিয়া দিবেন, যেন দাসটীকে ও দাসী দুইটীকে খুবই যত্নপূর্ব্বক লইয়া আসেন। অধ্যক্ষকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিবেন, যেন সাগরপথে জাহাজের নাবিকগণ কোন দাসীর সহিত কোনরূপ কুব্যবহার না করিতে পায়; নাবিক

দিগকে বিশ্বাস নাই। পথের আবশ্যক সমস্ত দ্রব্যই আপনি জাহাজে তুলিয়া দিবেন। দাসী দুইটীর যেন কানে মাকড়ী কর্ণফুল প্রভৃতি থাকে, নাকেও যেন নথের অভাব না হয়, পায়েও যেন মলের অভাব না হয়, অলঙ্কার তাহাদিগকে জাহাজে পরিতে হইবে না, বিলাতে আসিয়া পরিতে হইবে।"

রাজার হুকুম অবশ্যই তামিল হইয়াছিল। কোম্পানির প্রথম আমলে ভারতে দাস দাসীর ধূম লাগিয়াছিল। কলিকাতার সাহেব বিবীরাও দাস দাসী রাখিতেন। অনেক দিন পরে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অনেক পরেও, কলিকাতায় বালক যুবক দাস এবং বালিকা যুবতী দাসীর সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। তখনও কলিকাতায় "কলিকতা গেজেট ও দৈনিক বার্ত্তাবহ" নামে একখানি ইংরেজি সংবাদপত্র চলিত। সেই পত্রে প্রায়ই দাস দাসীর জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইত। কোন দিন কোন সাহেব বা বিবী দাস বা দাসী কিনিবার জন্য বিজ্ঞাপন দিতেন, কোন দিন বা কোন সাহেব কোন পলায়িত দাসীর সন্ধান পাইবার জন্য পুরস্কারের ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞাপন দিতেন, কোন দিন বা কোন বিবী পলায়িত ছোকরা দাসের পুনঃপ্রাপ্তি আশায় ঐরূপ বিজ্ঞাপনের প্রচার করিতেন। কোম্পানির ভারতেও দাস-ব্যবসায় অনেক দিন চলিয়াছিল। শেষে যখন নিজ বিলাতে ব্যবসায় রহিত হয়, তখনই ভারতেও রহিত হইয়াছিল। কিন্তু অগ্রে কৃষ্ণদাস নিগ্রোদিগের পূর্ব্বকথা কহিয়া পরে দাসমুক্তির কথা কহিব। কৃষ্ণদাসের কথা শীঘ্র সাঙ্গ হইবে না। দাসমুক্তির কথায়ও অনেক কথা আসিয়া পড়িবে। শেষে এখনকার অবস্থায়ও ইঙ্গিত করিতে হইবে। সুতরাং এ প্রবন্ধের এইখানেই উপসংহার করিয়া, অন্যান্য কথা আমরা অন্য প্রবন্ধের জন্য রাখিয়া দিতে বাধ্য হইলাম।

রায় রামানন্দ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব স্বকৃত শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

> তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
> অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদাহরিঃ॥

তৃণ অপেক্ষাও অত্যন্ত নীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু একান্ত অভিমানশূন্য অন্যকে সম্মান দানে তৎপর ব্যক্তি দ্বারাই হরিনাম কীর্ত্তনীয়।

মহাপ্রভু নিজের জীবনদ্বারা এই সকল ধর্ম্মের আচরণ করিয়া লোক শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

কাশীধামে প্রকাশানন্দ প্রমুখ বৈদিক পণ্ডিত মণ্ডলীর সমক্ষে আপনাকে তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ দেখাইয়াছেন, সার্ব্বভৌমের মুখে বেদান্তব্যাখ্যা শ্রবণ কালে তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছেন, মধ্য ও অন্ত্যলীলার সমস্ত কার্য্যে আপনাকে অমানী দেখাইয়াছেন এবং নিত্যানন্দ, হরিদাস ও রূপসনাতন ও রামানন্দের প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করিয়া আপনাকে মানদ দেখাইয়াছেন। নিত্যানন্দ অবধূত এবং স্বেচ্ছাবিহারী, তিনি বিধিমার্গ অবলম্বন করিয়া চলেন নাই, তৎকালের সাধারণ লোকের চক্ষে তিনি আচারভ্রষ্ট বলিয়া নিন্দিত ছিলেন, হরিদাস যবন বলিয়াই পরিচিত, অন্ততঃ যবনগৃহে প্রতিপালিত ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত, মহাপ্রভু এই দুইজনকেই ধর্ম্মপ্রচারক করিলেন। রূপসনাতন যখন সংসর্গে সমাজের চক্ষে জাতিভ্রষ্ট এবং নিন্দনীয় ছিলেন, মহাপ্রভু তাঁহাদের উপরেই ভক্তিগ্রন্থ এবং বৈষ্ণবস্মৃতি প্রণয়নের ভার অর্পণ করিলেন, রায় রামানন্দ জাতিতে শূদ্র, গৃহী এবং রাজসেবক, মানদ দয়ার ঠাকুর তাঁহার নিকট অবনত মস্তক হইয়া তাহার মুখ হইতে অনুপম ভক্তিতত্ত্ব শ্রবণ করিলেন, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য রামানন্দের মুখে যে সকল অপূর্ব্ব মধুময় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন এই প্রবন্ধে তাহারই উল্লেখ করিব।

মহাপ্রভু রামানন্দকে অতুল সম্মান প্রদান করিয়া শিক্ষার্থী শিষ্যের ন্যায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেছেন, রামানন্দ ভাবকণ্টকিত গাত্রে আত্মবিস্মৃত ও বিহ্বল হইয়া দেবাবিষ্টের ন্যায় উত্তর দিতেছেন।

> প্রভু কহে কহ কিছু সাধ্যের নির্ণয়,
> রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে কৃষ্ণভক্তি হয়।

প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, সাধ্য কি তাহা বল। রায় বলিলেন, স্বধর্ম্মাচরণই সাধ্য, উহাদ্বারাই কৃষ্ণভক্তি উৎপন্ন হয়। মনুষ্য-জীবন গঠন করিবার জন্য প্রথম শিক্ষণীয় বিষয় (Discipline) অর্থাৎ শৃঙ্খলা। যে ব্যক্তি প্রথম হইতে কোন বিধিমার্গে চলে না তাহার জীবন উশৃঙ্খল হয়,

সে স্বেচ্ছাচারী হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। স্বেচ্ছাচারিতা মনুষ্য জীবনের পরম শত্রু, স্বেচ্ছাচারিতা মানুষকে সর্ব্ব-প্রকার সংযম হইতে দূরে রাখে, এই জন্য পুণ্যপ্রাসাদারোহণের প্রথম স্তর বিধিপালন। কোন বিধিই সর্ব্বতোভাবে কাহারও আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ বা মতের অনুকূল হয় না, কিন্তু তাহা ভাবিয়া বিধি-মার্গ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। নিয়ম যাহাই হউক এবং তাহার মধ্যে দোষ গুণ যাহা থাকুক, কিন্তু নিয়ম যে নিয়ম তাহার ত আর ভুল নাই; নিয়মান্তর্গত কার্য্যগুলির কোন কোনটী তোমার রুচিসঙ্গত না হইতে পারে, কিন্তু নিয়ম রক্ষা করিতে যাইয়া একটা শাসনের মধ্যে থাকিয়া নিয়ম পালনের, আত্ম সংযমের, একটা শক্তি ত তোমার জন্মিবে। সে শক্তি নহে, বলিতে গেলে উহাই তোমার সমস্ত উন্নতির মূল। তুমি স্বেচ্ছাচারী হইয়া সদসৎ যে কার্য্য করিবে তাহাতেই তোমার স্বেচ্ছাচারীতা বাড়িবে বই কমিবে না। খামখেয়ালী কোনও নবাবপুত্র রাজ পথে পরিভ্রমণ করিতে যাইয়া যদি দরিদ্র-পল্লীতে অগ্নিপ্রদান করিয়া সমস্ত পল্লী ভস্মীভূত করে, এবং পর মুহূর্ত্তেই যদি দরিদ্রদিগকে অযুত স্বর্ণমুদ্রা পথি-মধ্যে ছড়াইয়া দেয়, তবে এই সদসৎ উভয় কার্য্য দ্বারা তাহার উশৃঙ্খলতারই বৃদ্ধি হইবে। তুমি যদি কোন বিধি দ্বারা বদ্ধ না হও, কোন আইন দ্বারা শাসিত না হও, তোমার জীবন নিশ্চয়ই উশৃঙ্খল হইবে এবং তুমি কখনও চিত্তসংযম ও আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। এই জন্য রামানন্দ বলিলেন, স্বধর্ম্মাচরণে অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট বিধিমার্গের অনুসরণে কৃষ্ণভক্তি হয়। পণ্ডিত হইতে হইলে প্রথমেই যেমন অ আ শিখিতে হয়, অ আ না শিখিলে কিছুতেই পণ্ডিত হওয়া যায় না, সেইরূপ স্বধর্ম্মাচরণ অর্থাৎ যাহার জন্য সমাজে যে সকল বিধি প্রচলিত আছে তাহা পালন না করিলে নির্দ্দিষ্ট শাসনে শাসিত না হইলে, নির্দ্দিষ্ট বিধির অনুগত না হইলে, কৃষ্ণভক্তি হয় না। তাদৃশ ব্যক্তির চিত্ত ভগবানে নিবিষ্ট হয় না, বাতবিক্ষোভিত সমুদ্র বক্ষে শুষ্ক কাষ্টখণ্ডের ন্যায় সর্ব্বদাই চঞ্চল ভাবে ভাসিয়া বেড়ায়। পরন্তু বিধি মার্গে না চলিলে আত্মাভিমান খর্ব্ব হয় না; অভিমান চিত্তকে সর্ব্বদাই বহির্মুখ করিয়া রাখে, বহির্মুখব্যক্তি কখনই ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত হইতে পারে না। এই জন্য প্রথমে স্বধর্ম্মাচরণ প্রয়োজনীয়। কিন্তু অ আ শিখিলেই যে পণ্ডিত হইলে তাহা নহে, এই জন্য

"এহ বাহ্য প্রভু কহে আগে কহ আর,"

মহাপ্রভু বলিলেন, ইহা বাহিরের কথা হইল, আরও কিছু অগ্রসর হইয়া বল,

"রায় কহে কৃষ্ণেকর্ম্মার্পণ সাধ্যসার।"

বিধিমার্গে চলিয়া মানুষ যখন সংযম অভ্যাস করিল, কিছু অভিমানশূন্য হইল, আপনাকে ছোট বুঝিল, নিয়মের কাছে অবনত হইয়া আত্মনিবেদন করিতে শিখিল, বিধি-পালন দ্বারা তাহার চিত্তচাঞ্চল্য দূর হইল, সৎকার্য্যে অভ্যাস জন্মিল, সে অসৎ কার্য্য হইতে বিরত হইল, তখন তাহার ভগবানে কর্ম্মার্পণ করার অধিকার জন্মিল।

ভগবানকে কর্ম্মার্পণ করিতে হইলে অসৎকার্য্য করা যায় না এবং দিন দিন নির্ভয়ের ভাব প্রবল হইতে থাকে। সমস্ত সংসার মধুময় হইয়া যায়। প্রহ্লাদের বিষখণ্ড যেমন অমৃতখণ্ড হইয়াছিল, সেইরূপ শত্রুও মিত্র হইয়া উঠে। তখন আর সে ব্যক্তি কাহারও দ্বারা ব্যথিত হয় না, কাহাকেও ব্যথিত করে না। তখন অবৈধ কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ও অসাধ্য হইয়া পড়ে।

রায় রামানন্দের উত্তর শুনিয়া,

"প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর,"

প্রভু বলিলেন, ইহাও বাহিরের কথা হইল, আরও ভিতরের কথা বল।

"রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ সর্ব্বসাধ্য সার,"

প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন "স্বধর্ম্মাচরণে কৃষ্ণভক্তি হয়।" তৃতীয় শ্লোকে বলিতেছেন—"স্বধর্ম্মত্যাগ সর্ব্বসাধ্যসার"! যাঁহারা কোনও প্রণালীর অনুসরণ না করিয়া কোনও সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করেন, এইরূপ স্থানে তাঁহাদের বড়ই ধাঁধা লাগিয়া যায়। হিন্দু শাস্ত্রের প্রণালী এই যে, অধিকারী ভেদে এবং স্তরে স্তরে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। বালককে একাকী ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না, তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে গুটি গুটি পা ফেলিতে শিখাইতে হইবে, যখন হাটিতে শিখিল তখন হাত ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে স্বাধীনতা দিতে হইবে। পূর্ব্বে তাহার হাত ছাড়িয়া দিলে বিপদ ঘটিত, এখন তাহার হাত ধরিয়া রাখা অবৈধ হইবে। পূর্ব্বে ধরিয়া না রাখিলে সে পড়িয়া যাইত, এখন ধরিতে গেলে সে বিরক্ত হইবে। রামানন্দ রায় সেইরূপ প্রথমে

স্বধর্ম্মাচরণের দৃঢ়মুষ্টিতে শিশুধর্ম্মজীবনকে ধরিয়া রাখিলেন, তাহার পরে তাহাকে গুটি গুটি পা ফেলাইয়া কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ শিখাইলেন। এখন ত আর ভয় নাই, শিশু হাটিতে শিখিয়াছে, এখন তাহার জীবন বিধিময় এবং কর্ম্ম কৃষ্ণে অর্পিত হইয়া বিশুদ্ধ হইয়াছে, এখন আর তাহার দ্বারা সমাজভঙ্গের আশঙ্কা নাই, এখন আর তাহার পড়িয়া মরিবার ভয় নাই। এখন স্বতন্ত্রতায়ই তাহার উন্নতি, এখন তাহাকে ধরিয়া রাখিলে সে দুর্ব্বল হইবে; সুতরাং রায় বলিলেন, এতটা যখন হইয়াছে এখন ইহার পক্ষে "স্বধর্ম্মত্যাগ সর্ব্বসাধ্য সার।" রামানন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া,—

"প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর"

প্রভু বলিলেন ইহাও বাহিরের কথা, আরও ভিতরের কথা বল।

"রায় কহে জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার।"

রামানন্দ কহিলেন, জ্ঞান মিশ্রা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রাদি বিচার দ্বারা, নিত্যানিত্য বিবেক দ্বারা, জগতের সৃষ্টি কৌশল দ্বারা ভগবান্‌কে আশ্রয় ও অবলম্বন স্বরূপ জানিয়া তাঁহার প্রতি যে আসক্তি তাহাই জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি। এই ভক্তিতে স্তুতি থাকে, স্তব থাকে, আরাধনা উপাসনা প্রার্থনা থাকে। ইহাই ভক্তির প্রথম স্তর। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা শুনিয়া

"প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর"

প্রভু বলিলেন ইহাও বাহিরের কথা, আরও ভিতরের কথা বল।

"রায় কহে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার।"

শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিয়াছেন "জ্ঞান ও ভক্তি, স্বামী ও স্ত্রী। ইহারা উভয় মিলিয়া ভগবানের বাড়ী যায়, জ্ঞান পুরুষ মানুষ—বাহির বাড়ীর বৈঠকখানায় বসিয়া থাকে, ভক্তি স্ত্রীলোক সে অবাধে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে।"

যতক্ষণ জ্ঞান থাকে ততক্ষণ বিচার থাকে, ততক্ষণ স্বার্থ চিন্তা থাকে, ততক্ষণ উদ্দেশ্য থাকে। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, আধা "আমি আধা তুমি, জ্ঞান শূন্যা, অর্থাৎ বিশুদ্ধাভক্তি ষোল আনাই তুমি। জ্ঞানমিশ্রাভক্তি কখন ভাবে, কখনও কাঁদে; বিশুদ্ধাভক্তি কেবলই কাঁদে; সে আর কিছুই ভাবিতে জানে না। জ্ঞান-ভক্তি, ধবলগিরির শেখর সঞ্চিত তুষার-রাশির ন্যায়, সে কখনও গলে, কখনও জমাট বাঁধে; বিশুদ্ধাভক্তি গিরিগাত্রবাহিণী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী, তাহার প্রাণ গলিয়া গিয়াছে আর জমাট বাঁধিতে পারে না; তাহার প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে, আর ফিরাইতে পারে না। কুলু কুলু কুলু অস্ফুট অব্যক্ত ভাষায় ব্যাকুলতাময়ী প্রেম গীতি গাহিয়া নির্জ্জন গিরিকন্দরের নিকুঞ্জ বিধৌত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলখণ্ডকে উপেক্ষা করিয়া, কত কাকুতি মিনতিতে সুবৃহৎ প্রস্তর স্তূপের পাশ কাটিয়া, বালুকা রাশি ভেদ করিয়া, কত আকুবাকু করিয়া এক স্রোতে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার আর দিগ্‌বিদিক জ্ঞান নাই। আত্মসম্বরণের শক্তি নাই, সে তাহার ঢালা প্রাণকে আর ফিরাইতে পারে না। সে কেবল ছুটিয়াছে, আর কুলু কুলু রবে গাহিতেছে—"কোথায় তুমি, কোথায় তুমি, আমার পিপাসার জল কোথায় তুমি? আমি তোমার রূপ জানি না, রস জানি না, গন্ধ জানি না, স্পর্শ জানি না। তুমি সুরূপ হও কুরূপ হও, সদয় হও নিদয় হও, তোমাতে আমার সুখ থাকুক বা দুঃখ থাকুক, শান্তি থাকুক কি অশান্তি থাকুক, তাহা আমি ভাবিতে চাহি না, ভাবিতে পারি না, এই দেখ গিরিবরের উচ্চ শৃঙ্গ হইতে আমার প্রাণ গলিয়া তোমার দিকে ঢালিয়া পড়িয়াছে, কোন বাধাই মানিতেছে না। কোথায় তুমি, কোথায় তুমি তোমাতেই আমি মজিব।

ভক্তির যখন এই অবস্থা হয়, তখন সে জ্ঞানের বন্ধন সহ্য করিতে পারে না, সাগর তরঙ্গাকুলিত বালুকা স্তূপের মতন আপনা আপনি ধসিয়া পড়ে, কাহারও মুখাপেক্ষা করিতে পারে না। অন্য মুখাপেক্ষিণী হইলে ভক্তির বিশুদ্ধতা থাকে না।

বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্র বলেন,

"অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।"

অন্য অভিলাষ শূন্য হইয়া জ্ঞান এবং কর্ম্মদ্বারা অনাবৃত প্রেমভাবে ভগবদনুশীলনের নাম উত্তমাভক্তি।

অন্য অভিলাষ থাকিলে ভক্তি বিশুদ্ধা হইল না, জ্ঞান কিম্বা কর্ম্মের আনুগত্য থাকিলেও ভক্তি বিশুদ্ধা হইল না, কেবল প্রেমবিহ্বলা ভক্তিই বিশুদ্ধা ভক্তি। আমি যাহাকে ভালবাসি সে সৎ কি অসৎ যদি আমার এরূপ বিচার বুদ্ধি থাকে, অথবা কি কি কারণে তাহাকে আমি ভালবাসি,

আমার যদি সেই সকল সংস্কার থাকে তবে আমার ভালবাসা খাঁটি ভালবাসা নহে। ভাগবৎ বলেন,

"আত্মারামশ্চ মুনয়োনির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থং ভূত গুণোহরিঃ॥"

যাঁহারা আত্মারাম অর্থাৎ যাহাদের সমস্ত দুঃখের শান্তি হইয়া আত্মাতেই তৃপ্তি লাভ হয়, এবং যাঁহারা নির্গ্রন্থা অর্থাৎ যাঁহাদের হৃদয়গ্রন্থী ছিন্ন হইয়াছে, পাপ-তাপের নিবৃত্তি হইয়াছে, হরির এমনই গুণ যে সেই সকল মুনিগণও তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। সাধকের একটী অবস্থা আছে এবং শ্রীহরির একটি গুণ আছে, সাধক যখন সেই অবস্থায় উপস্থিত হন, হরির সেই গুণটী তখন আপনা হইতে তাঁহাকে টানিয়া লয়। দিক্‌যন্ত্রের কাঁটাটি যেমন উত্তর দিকেই ফিরিয়া থাকে, ভক্তের প্রাণটীও তেমনি ভগবানের দিকেই চাহিয়া থাকে, অন্য কার্য্যকারণের কিছু সম্বন্ধ থাকে না।

যদি কেহ মনে করেন যে, ভক্তি, জ্ঞানসঙ্গরহিতা হইলে বিপথগামিনী হইতে পারে, তাঁহাকে একটি কথা মনে রাখিতে অনুরোধ করি। বিশুদ্ধা ভক্তির উৎপত্তি হইলে সাধক বিধিকে পরিহার করিতে যত্ন করেন না এবং লঙ্ঘনও করিতে পারেন না। ধর্ম্ম তখন শ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় তাঁহার স্বাভাবিক ক্রিয়ার মধ্যে গণ্য হয়, উহার রক্ষার জন্য তাঁহাকে যত্ন করিতে হয় না; সুতরাং বিশুদ্ধা ভক্তি যেমন জ্ঞানবিরহিতা, তেমনি অনাবিলা। প্রিয়া সম্ভাষণে কেহ প্রহরী সঙ্গে লইয়া যায় না, সেইরূপ গেলে বড়ই রসভঙ্গ হয়। সেইরূপ ভক্তিদেবী ভগবৎ সমক্ষে জ্ঞান প্রহরীকে সঙ্গে লইয়া যান না, যাঁহার কাছে যাইতেছেন তাঁহার প্রতি ষোল আনা বিশ্বাস, ষোল আনা নির্ভর, ষোল আনা টান। অন্যকে সঙ্গে লইলে সম্বন্ধ শিথিল হয় এবং রসভঙ্গ ঘটে। এই স্থান হইতেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম আরম্ভ, রামানন্দ রায়ের এই প্রত্যুত্তর শুনিয়া,—

"প্রভু কহে এহ হয় আগে কহ আর।"

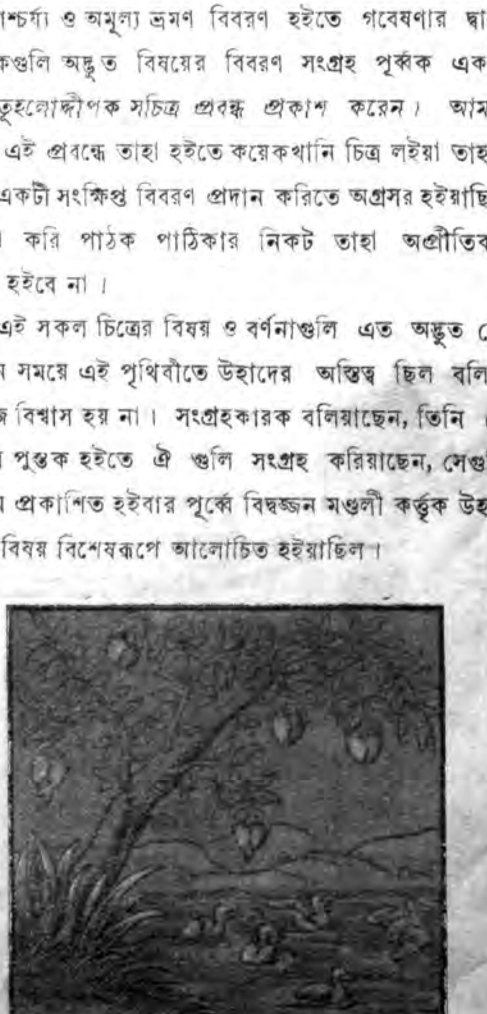
ততক্ষণ কিন্তু "এহ বাহ্য" বলিতেছিলেন, এই বারে বলিলেন "এহ হয়", রসিক পাঠক এই শব্দ পরিবর্ত্তনের তাৎপর্য্য ও মাধুর্য্য নিজের মনে অনুভব করিবেন। অতঃপর মহাপ্রভুর প্রশ্ন এবং রামানন্দের প্রত্যুত্তর এত গভীর যে, তাহা বুঝা এবং বুঝান উভয়ই সুকঠিন; তথাপি ক্ষীর সমুদ্রের তীরস্থিত ক্ষুদ্রপ্রাণ পিপীলিকার মতন সে রসের যতটুকু পারি তাহাই গ্রহণ করিতে যত্ন করিব।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।

সেকালের অদ্ভুত কাহিনী।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক খানি প্রসিদ্ধ বিলাতী মাসিক পত্রে মিঃ ফ্রেমলে ষ্টীল ক্রফ্‌ট (Mr. Framley Stelcroft) বহু পরিশ্রম সহকারে ইউরোপের নানা স্থানের পুস্তকাগার হইতে অতি প্রাচীন কালের পর্য্যটকগণের অত্যাশ্চর্য্য ও অমূল্য ভ্রমণ বিবরণ হইতে গবেষণার দ্বারা কতকগুলি অদ্ভুত বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক একটী *কৌতূহলোদ্দীপক সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।* আমরা অদ্য এই প্রবন্ধে তাহা হইতে কয়েকখানি চিত্র লইয়া তাহাদের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়াছি। আশা করি পাঠক পাঠিকার নিকট তাহা অপ্রীতিকর বোধ হইবে না।

এই সকল চিত্রের বিষয় ও বর্ণনাগুলি এত অদ্ভুত যে, কোন সময়ে এই পৃথিবীতে উহাদের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া সহজে বিশ্বাস হয় না। সংগ্রহকারক বলিয়াছেন, তিনি যে সকল পুস্তক হইতে ঐ গুলি সংগ্রহ করিয়াছেন, সেগুলি প্রথম প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে বিদ্বজ্জন মণ্ডলী কর্ত্তৃক উহাদের বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছিল।



প্রথম চিত্রখানি "Munster's monumental Geography" নামক একখানি ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত

ভূগোল হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই প্রাচীন গ্রন্থ বিলাতের রয়েল সোসাইটীতে রক্ষিত আছে। এই চিত্রে কোন নদী বা জলাশয়ের ধারে একটী বৃক্ষ রহিয়াছে; তাহার দুটী ফলের ভিতর হইতে যেন পক্ষীশাবকের ন্যায় কি বাহির হইতেছে মনে হয়। আর জলের উপরিভাগে কয়েকটী হংসশাবক যেন বিশেষ ব্যস্ততার সহিত সাঁতরিয়া যাইতেছে। এই সকল ক্ষুদ্র শাবকের আকার অবয়ব এবং ভাব ভঙ্গী দেখিয়া যেন মনে হয়, উহারা এইমাত্র পার্শ্বস্থিত বৃক্ষের ফলের ভিতর হইতে পতিত হইয়াছে। এই বৃক্ষ ভূমণ্ডলের কোন্ অংশে জন্মগ্রহণ করিত প্রবন্ধ মধ্যে তাহার উল্লেখ নাই।

জগতের যাবতীয় নবাবিষ্কৃত আশ্চর্য্য সামগ্রীর মধ্যে অধিকাংশই কোন না কোন ব্যক্তি বিশেষের ভ্রমণের ফলে মানবগোচরীভূত হইয়াছে। প্রবন্ধ মধ্যে আর একটী বৃক্ষের সচিত্র বর্ণনা আছে, তাহার নাম মেষোৎপাদক বৃক্ষ।



মধ্য এসিয়া ভ্রমণকালে কোন পরিব্রাজক টারটারি প্রদেশে এই বৃক্ষ দেখিয়াছিলেন। দ্বিতীয় চিত্রখানিতে উহাই অঙ্কিত হইয়াছে। কোন রাজার হস্তে ঐ বৃক্ষের একটী ফল রহিয়াছে এবং উহার মধ্য হইতে একটী ক্ষুদ্র মেষশাবক বহির্গত হইবার উপক্রম করিতেছে। এই চিত্রের বামপার্শ্বে এক ব্যক্তি একটী বৃক্ষশাখা ধারণ করিয়াছেন, যে বৃক্ষ হইতে পক্ষী উৎপন্ন হয় উহা তাহারাই একটী শাখা। লেখক মহোদয় এই চিত্রবর্ণিত বিষয়টী হিন্দুদিগের ইন্দ্রজাল অপেক্ষাও অধিকতর বিস্ময়জনক বলিয়াছেন।

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পুরাকালের বিস্তৃত মহারণ্যানী মধ্যে যেমন আশ্চর্য্য বৃক্ষাদির উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ জীবরাজ্যেও অনেক আশ্চর্য্য প্রাণীর উল্লেখ দেখিতে



পাওয়া যায়। তৃতীয় চিত্রখানিতে কয়েকটী অতি অদ্ভুত জাতীয় মানুষের মূর্ত্তি চিত্রিত আছে। এই ছবিখানি বড়ই ভীষণ, দেখিলে প্রথমেই অবিশ্বাসের সহিত প্রাণের ভিতর কৌতূহল ও ভয়ের সঞ্চার হয়। আরব্য ও পারস্য উপন্যাসের কবিও রাক্ষসের বর্ণনায় এরূপ অবয়বের কল্পনা করিতে পারেন নাই, বা সুপ্রসিদ্ধ গলিভার সাহেব তাঁহার আজগুবি ভ্রমণ কাহিনীতেও এরূপ প্রাণীর কথা বলিতে পারেন নাই। এই চিত্রের বামপার্শ্বে চিত্রিত জীবটীর কেবল একটী মাত্র পদ এবং এই পদ এত বৃহদাকারের যে উহারা প্রয়োজন হইলে চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া উহা উর্দ্ধদিকে উত্তোলন পূর্ব্বক বৃষ্টিবারি, শীলা ও তুষারাদি হইতে নিজ দেহ রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। এই জাতীয় নরনারী মাত্রেরই একটী করিয়া পদ। উহার ঠিক পার্শ্বের মুর্ত্তির কেবল মাত্র একটী চক্ষু, তাহাও কপালের ঠিক মধ্যভাগে বিরাজিত! তারপর একটী দুই আনন বিশিষ্ট বামনের ছবি। যাহা হউক এই যে তিনটী অদ্ভুত জীবের কথা বলা হইল, ইহাদিগকে মনুষ্য নামে অভিহিত করিলেও দক্ষিণ পার্শ্বের অত্যন্ত অদ্ভুতদৃশ্য প্রাণী দুটীকে মানুষ বলা যাইতে পারে কি না বিবেচ্য। যদ্যপি বনমানুষ এবং হনুমান মনুষ্যপদবাচ্য না হয়, তাহা হইলে, ইহারা কখনই মানুষ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। একটীকে যদি বা কেহ শৃগালমুখো

মানুষ বলেন, কিন্তু মস্তকহীন অপর জীবটীকে কি বলা উচিত জানি না। ইহার হস্ত পদ ঠিক মানুষের ন্যায়, কিন্তু মস্তক শূন্য মুখ, চোক, নাসিকা বক্ষঃস্থলে বিরাজিত। শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। সেক্সপিয়রের গ্রন্থে-লোতে এই আশ্চর্য্য জীবের উল্লেখ আছে। এক চক্ষু, দুই মস্তক এবং এক পদবিশিষ্ট মনুষ্য প্রকৃতির একরূপ কল্পনা করিয়া লইতে পারা যাইলেও মস্তকহীন জীবের কল্পনা করা সুকঠিন। লেখক বলেন, এই সকল অদ্ভুত জাতি সম্ভবতঃ আফ্রিকা দেশের কোন কোন স্থানে পূর্ব্বকালে দেখিতে পাওয়া যাইত।

পরবর্ত্তী চিত্রখানিতে আর একটী বিচিত্র জাতীয় দীর্ঘকর্ণ মনুষ্যের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করা হইয়াছে। ইহাদের কর্ণদ্বয় এরূপ দীর্ঘাকারের যে ইহারা শয়নকালে অন্য শয্যার ব্যবহার না করিয়া একটী কর্ণের উপর বিনা আয়াসে শয়ন করিয়া অপরটীর দ্বারা নিজদেহ আবৃত রাখিয়া শীতাতপ নিবারণ করিত। প্রাচীন গ্রীকগণ ভারতবর্ষে এই জাতির অস্তিত্ব ছিল বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।



মধ্যযুগে আফ্রিকায় এক প্রকার কুকুরমুখো মানুষের অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল। তৎকালে ইহারা এত প্রসিদ্ধ ছিল যে, যদি কোন পর্য্যটক আফ্রিকা ভ্রমণ করিয়া ঐ জাতীয় মানুষ না দেখিয়া প্রত্যাগমন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে লোকে বিদ্রূপ করিত। কথিত আছে, কোন সময়ে মহাবীর সেকে-



ন্দর শার এক দল সৈন্য উক্ত জাতীয় কেবল একটী মাত্র প্রাণীর দ্বারা পরাজিত হইয়াছিল। ৫ম চিত্রে একটি কুকুর মুখো মানুষ এক গ্রীক বীরের সহিত যুদ্ধ করিতেছে।



পূর্ব্বকালে যেমন পশুমুণ্ড বিশিষ্ট মানুষ জগতে বিরাজ করিত, ঐরূপ নরমুণ্ডবিশিষ্ট পশুর কথাও মিঃ ষ্টিলক্রফ্ট তাঁহার প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম আবিষ্কার হইবার অব্যবহিত পরেই যে সকল গ্রন্থ মুদ্রিত হয়, তাহার মধ্যে কোন একখানি পুস্তকে গ্রন্থকার তাঁহার রাক্ষস রাজ্যের ভয়াবহ ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। চিত্রখানি সেইগ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। চিত্রিত জন্তুটীর মুখমণ্ডল কোনও গুম্ফ দাড়িযুক্ত মনুষ্যের মুখের মত হইলেও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কোনও লাঙ্গুলযুক্ত চতুষ্পদের ন্যায়। লেখক মহোদয় রহস্যচ্ছলে বলিয়াছেন, এই মুখ খানিতে কোন খ্যাতনামা রাজনীতিক পুরুষের মুখের সাদৃশ্য আছে।



পূর্ব্ববর্ত্তী চিত্রখানিতে আরও কতিপয় নরমুণ্ড বিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি চতুষ্পদের মূর্ত্তি আছে। অডেরিক্ (oderic) নামক এক উদাসীন সন্ন্যাসী চীনদেশে ভ্রমণ কালে কোন মঠে উপস্থিত হইয়া স্বচক্ষে সেই মঠবাসী সন্ন্যাসীকে পাহাড়ের গহ্বর হইতে বহির্গত ছোট ছোট মনুষ্য-পশুগুলিকে আহার দিতে দেখিয়াছিলেন। তিনি এই জীব গুলিকে পবিত্র মনুষ্য-পশু বলিয়াছিলেন।



উল্লিখিত সন্ন্যাসী অডেরিক্ মধ্য এসিয়ায় ভ্রমণ কালে অকস্মাৎ কোন নির্জ্জন স্থানে পাতালের উপদেবতা বা দেহচ্যুত আত্মাদিগের যে আবাস স্থান নিজচক্ষে অবলোকন



করিয়া ছিলেন, এই চিত্রখানির অঙ্কিত বিষয় তাহাই। বহুকাল পূর্ব্বে এই গুপ্ত স্থান হইতে অদ্ভুত শব্দ, অপার্থিব ক্রন্দনধ্বনি, এবং দীর্ঘ নিশ্বাসের মর্ম্মস্পর্শী শব্দ প্রভৃতি সময়ে সময়ে পার্শ্বস্থিত পথের পথিকবর্গের কর্ণগোচর হইত। এই কারণে কিম্বদন্তী ছিল যে, নিকটের কোন স্থানে পাপীদিগের দেহত্যাগান্তর পাপস্খলনের স্থান আছে। অডেরিক্ এই স্থান দর্শন করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার পর হইতে কাল্পনিক জনশ্রুতি সত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইতে লাগিল।

সে কালে এই সকল অত্যন্ত অদ্ভুত প্রাণী ভিন্ন অনেক ভীমকায় জন্তুও পৃথিবীর বক্ষে বর্ত্তমান ছিল। ভূমণ্ডলের সভ্যদেশ সমূহের অনেক প্রসিদ্ধ আশ্চর্য্য-দ্রব্য-ভাণ্ডারে (museum) সযত্নে রক্ষিত বৃহৎ অস্থি কঙ্কাল গুলিই তাহার প্রমাণ।

অতি প্রাচীনকালের মানচিত্রাদির চারিপার্শ্বে অনেক অদ্ভুত জীব জন্তুর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ১৫০০ শতাব্দীতে ওলান্স ম্যাগনস (olans magnus) নামক এক স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াবাসী ভৌগলিক একখানি মানচিত্রের পার্শ্বদেশে এক বৃহৎকায় সামুদ্রিক জন্তুর প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। এই চিত্রের ভীষণ জন্তুটী পূর্ণ নরদেহ অক্লেশে উদরস্থ করিতেছে বলিয়া মনে হয়।

পুরাকালের কত শত ভীতিপ্রদ জীব জন্তুর বংশ যে একেবারে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করা সুকঠিন। পৃথিবীর অতি পুরাতন ইতিহাস আলোচনা করিলে এমন অনেক আশ্চর্য্য জীব জন্তুর কথা জানিতে পারা যায়, যাহাদের জীবন কালে মনুষ্যের নাম পর্য্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। পৃথিবীর বয়সের তুলনায় মানবজাতির বয়স অতি সামান্য। তাঁহারা ঐ সকল লুপ্ত জীবের কোন না কোন চিহ্ন দেখিয়া অনেক সময় অনুমান দ্বারা অবয়বাদি নির্ণয় করিয়াছেন, কিন্তু মনুষ্য জন্মিবার লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে জগৎ কিরূপ স্থান ছিল, তখন কোন্ ঋতুর প্রাবল্য অধিক ছিল, আর কোন্ কোন্ মহাকায় প্রাণীর ইহা ক্রীড়াভূমি ছিল, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। যে সকল স্থান বর্ত্তমান সময়ে মনুষ্যের লীলাক্ষেত্ররূপে পরিগণিত, অধিক দিনের কথা নহে, দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে উহাই অতি ভয়াবহ স্থান ছিল।



সময়ের অনেক অদ্ভুত প্রথা সকলেরও কোন কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

অপরাধী সন্দেহ করিয়া আসামীর অপরাধের কাহিনী বাহির করিবার জন্য অধুনা সময়ে সময়ে পুলিষের লোকেরা যেরূপ অমানুষী অত্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা মনে করিলেই শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কিন্তু অতি প্রাচীন কালে জগতের কোন কোন অংশে উক্ত কার্য্যের জন্য যে উপায় অবলম্বন করিত, তাহা অধিকতর রোমাঞ্চকারী। "De Boy's Travels" নামক পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত একখানি বহুমূল্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত সেই সময়ে দক্ষিণ আমেরিকার কৃতাপরাধী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে তাহার পাপ কাহিনী বাহির করিবার জন্য যে পন্থা গ্রহণ করা হইত তাহার একখানি চিত্র আছে, নিম্নের ছবিখানি তাহার প্রতিলিপি। ইহা নিসদের সময়ের দক্ষিণ আমেরিকার কোন স্থানের চিত্র, কোন স্পেন দেশীয় আবিষ্কারক ইহার বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন।

অধুনা বৎসরে কত ব্যক্তি প্রকৃতি দেবীর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য উপভোগবাসনায় ইউরোপের ক্রীড়াক্ষেত্র, বিলাসীদিগের প্রিয়স্থান, সুইজারল্যাণ্ডের অন্তঃপাতী আল্প পর্ব্বতে গমন করিয়া থাকেন, কিন্তু কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে এই পর্ব্বতের মধ্যে যে সকল পক্ষ বা নরমুণ্ড বিশিষ্ট ভয়ানক সর্পের (Dragon) আবাস ছিল তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। "Routes in theswiss Alps made in 1702-1" নামক একখানি পুস্তকে গ্রন্থকর্ত্তা নিম্ন আল্প পর্ব্বতে যে ভীষণ দৃশ্য ড্রাগন দেখিয়াছিলেন এই চিত্র খানিতে তাহারই একখানি প্রতিচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। অন্যান্য শত শত জন্তুর ন্যায় এই ভয়ঙ্কর জীবের অস্তিত্ব বোধ হয় একেবারে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে।



কালের নিয়ম, জগতের পরিবর্ত্তন সাধন করা। পূর্ব্বে যাহা ছিল এখন আর তাহা নাই, পূর্ব্বে যাহা সভ্যতা ছিল, এক্ষণে তাহা অসভ্যতায় পরিণত হইয়াছে, তখন যাহা অসম্ভব বলিয়া লোকের ধারণা ছিল, এক্ষণে তাহা জলন্ত সত্য। তখনকার ভ্রমণকারীদিগের গ্রন্থাদিতে যেমন নানাবিধ, জীবজন্তু উদ্ভিদাদির বর্ণনা আছে, সেইরূপ তৎ-

একে একে অনেকগুলি অদ্ভুত বিষয়ের কথা বলা হইল, এই বিচিত্র সংগ্রহ মধ্যে আরও কতকগুলি আশ্চর্য্য বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে আমরা তাহাদের বিষয় বলিতে বিরত হইলাম।

শ্রীহরিহর শেঠ।

অভিভাবকতা।

আমি যখন ঢাকা কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলাম, সেই সময় শ্রীযুক্ত বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে তাৎকালিক জগন্নাথ স্কুলগৃহে "বাল্য বিবাহ নিবারিণী" সভার সূত্রপাত হয়। নবকান্ত বাবু ঐ সভার সভাপতি এবং আমি তাঁহার সহকারীরূপে বরিত হইয়াছিলাম। ঐ সভার একটীমাত্র অধিবেশনে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং উহাই তাহার শেষ অধিবেশন ছিল। নবকান্ত বাবু কিয়ৎক্ষণ সভাতে থাকিয়া উঠিয়া গেলে পর, আমি সভাপতির আসন গ্রহণ করি। তখন একজন সভ্য এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন যে, বালকদিগের অভিভাবকেরা তাহাদিগকে বিবাহ করিতে আদেশ করিলে সেই আদেশ পালন করা বালকদিগের কর্ত্তব্য কিনা? কিছুক্ষণ তর্কবিতর্কের পর আমি সভাপতির আসন হইতে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, 'যে কার্য্য অন্যায় বলিয়া ধারণা হইবে তাহা অভিভাবকের আদেশে করিতে বাধ্য হইবে না।" (স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমার বয়স তখন ১৬ বৎসর ছিল)।

যে শনিবারের অধিবেশনে আমি এই মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম, তাহার পর এক সপ্তাহের ভিতর ঢাকার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে ইহা প্রচারিত হইয়া পড়িল যে, জগন্নাথ স্কুল গৃহে আমি এক নুতন সভা স্থাপন করিয়াছি, তাহার নাম অভিভাবক নিবারিণী" সভা, এবং আমি ঐ সভার সভাপতি।

উপরোক্ত মতটি প্রকাশ করিবার সময় আমি যেমন অভিভাবকতা বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম, তেমন আবার ইহাও ভাবিবার অবসর পাই নাই যে, একটি বৃহৎ নগরীর ছাত্র মণ্ডলীর ভিতরে আমি এত সহজে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিব। আমি যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলাম, তাহা একটি ঐতিহাসিক সত্য;—আমার সমকালে যাঁহারা ঢাকায় ছিলেন, তাঁহারা আমার খ্যাতি (বা অখ্যাতি) লাভের মূল ইতিহাস না জানিলেও আমার প্রসিদ্ধিলাভের সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। এক্ষণে অভিভাবকতা সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা দূর হইয়াছে কিনা এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

উপরোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনার ছয় বৎসর পরে আমি ইংলণ্ড-প্রবাসে গমন করি এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ প্রবেশ করি। তথায় "Littlego" নামক, আমাদের First artsএর অনুরূপ একটি পরীক্ষা দিতে হয়। "অনার" প্রার্থী ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াই ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। তাহাতে যে সকল বিষয় শিক্ষা করা প্রয়োজন, Paley's Evidence of christianity তাহার অন্যতম, কিন্তু অখৃষ্টবিশ্বাসীদের জন্য তাহার পরিবর্ত্তে Logic বিষয়ে পরীক্ষা হইয়া থাকে। আমি অখৃষ্টবিশ্বাসী বলিয়া আমার প্রতি Logicএর ব্যবস্থা হইল। কিন্তু আমার কলেজে অপর কোন ছাত্র এ বিষয় না নেওয়াতে সে বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য কোন ক্লাশ ছিল না।

আমি মনে করিয়াছিলাম অন্ততঃ একটী বিষয়ের শিক্ষার জন্য একজন শিক্ষকের অধীনতা হইতে নিস্তার পাওয়া গেল। কিন্তু মানুষের ইচ্ছায় জগৎ চলে না। আমার কলেজের 'টিউটর' মহাশয় আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন "Logic শিক্ষার জন্য কোন ক্লাশ নাই; একারণ প্রতি শনিবার তোমাকে আসিয়া আমার কাছে দু ঘণ্টা করিয়া ঐ বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা দিতে হইবে।" কি সর্ব্বনাশ! কোথায় ক্লাশে পড়িতে যাইতে হইবে না বলিয়া আনন্দে নাচিব মনে করিয়াছিলাম, তাহার পরিবর্ত্তে কি না সাপ্তাহিক পরীক্ষা দিতে হইবে! আমি কত তর্ক বিতর্ক করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে Logic আমার বেশ জানা আছে, আমি অনায়াসে দুই মাস পর পরীক্ষা দিয়া পাশ হইতে পারিব। কিন্তু বৃথা বলা! তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন যে 'টিউটর' বলিতে 'অভিভাবক' বুঝায়। তাঁহার কর্ত্তব্য কেবল শিক্ষা দেওয়া নহে;—যাহাতে ছাত্রের কল্যাণ হয় তাহা চিন্তা করা, এবং ছাত্রকে কোন্ পথে চালাইতে হইবে তাহার ব্যবস্থা করা তাঁহার কার্য্য। আমি কোন্ বিষয় কতখানি জানি এবং কিরূপ শিক্ষা আমার প্রয়োজন, সে সব ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি দায়ী। তিনি ইহাও আমাকে বুঝাইলেন যে, ক্লাশে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন 'শিক্ষক' নিযুক্ত আছেন; 'টিউটর' অর্থ 'শিক্ষক' নহে,—'টিউটর' বলিতে 'বেতনভোগী অভিভাবক' বুঝায়। আমার দৈনিক কার্য্যের হিসাব

রাখা, এবং আমি কোন দোকান হইতে জিনিস কিনিলে তাহার পর্য্যন্ত হিসাব নিকাশ করা 'টিউটরের' কার্য্য। (এই শেষোক্ত দায়িত্ব আমার সমকালেই কেম্ব্রিজ হইতে অনেকটা উঠিয়া যাইতেছিল। ইতি পূর্ব্বে দোকানের 'বিল' ছাত্রের বাড়ী না পাঠাইয়া 'টিউটরের' কাছে পাঠাইতে হইত।)

এইরূপ একটী দায়িত্বপূর্ণ বেতনভোগী টিউটরের বা অভিভাবকের হাতে পড়িয়া আমারও চক্ষু স্থির। তখন উপরোক্ত 'বাল্য বিবাহ নিবারিণী' সভার সভ্যের ন্যায় আমার মনে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে "আমার যে কার্য্যে অনিচ্ছা জন্মাইবে তাহা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াও উক্ত 'বেতনভোগী অভিভাবকের' মতানুসারে আমি সেই কার্য্য করিতে বাধ্য কি না?" ভারতবর্ষে থাকিতে আজন্মকাল স্কুলকলেজে অর্থ দিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছি, কিন্তু ঘরের অর্থ দিয়া পরের অভিভাবকতার দায়িত্বে নিষ্পেষিত হওয়া এ আর্য্যসন্তানের পক্ষে কি অসহনীয় নহে? তখন আমার মনে হইল যে, কি কুক্ষণে আমি একটী সভা স্থলে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলাম যে নিজের ন্যায় বুদ্ধির অনভিমতে অভিভাবকের আদেশ পালনীয় নহে! এই সুদূর প্রবাসে আজ একজন বেতনভোগী অভিভাবক (যিনি আমার অমতে আমারই অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিয়াছেন,) আমাকে তাঁহার দায়িত্বের করালচক্রে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন!

আমার তখন Indian majority act জানা ছিল না, নতুবা টিউটর মহাশয়কে বলিতে পারিতাম যে, আমার অভিভাবকের অধীনতা স্বীকারের বয়স চলিয়া গিয়াছে। অজ্ঞাত বশতঃ তাহা আর বলা হইল না; আমাকে নিজে কার্য্য দ্বারাই নিজের সগর্ব্বোক্তির প্রতিবাদ করিতে হইল। পাঠকগণ মনে করিতে পারেন যে, ইহা বয়সের ধর্ম্ম!

ইংরাজীতে একটী জনশ্রুতি আছে যে, দশ বৎসর বয়সে পুত্র মনে করে তাহার পিতা সর্ব্বজ্ঞ, যাহা জিজ্ঞাসা করা যায় তাহারই উত্তর দিতে সক্ষম; পনর বৎসর বয়সে মনে করে তাহার পিতার জ্ঞান তাহার নিজের জ্ঞানাপেক্ষা অধিক নহে; বিশ বৎসর বয়সে মনে করে তাহার পিতা সেকালের লোক, বর্ত্তমানের উন্নত জ্ঞান বুদ্ধি তাঁহার আয়ত্ত নহে; অর্থাৎ এক কথায়, পিতা কিছু জানেন না; ত্রিশ বৎসর বয়সে মনে করে মাঝে মাঝে পিতার মত জানাতে কোন দোষ নাই, হাজার হউক পিতা পুত্রাপেক্ষা বেশী দিন পৃথিবীতে রহিয়াছেন, অতএব জগৎটা তাঁহার কিছু দেখা আছে, চল্লিশ বৎসর বয়সে মনে করে পিতার আর কিছু না থাকুক অভিজ্ঞতাটুকু যথেষ্ট আছে; পঞ্চাশ বৎসর বয়সে মনে করে পিতার পরামর্শ নিয়া কাজ করাতে অনেক লাভ আছে; এবং ষাট বৎসর বয়সে মনে করে তাহার পিতার ন্যায় জ্ঞানী জগতে আর কেহ জন্মিয়াছে কিনা সন্দেহ! এই জনশ্রুতি কতদূর সত্য তাহা অনেক পাঠকই আপন আপন জীবনের সহিত মিলাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

উপরোক্ত প্রবচনকে সত্য মানিয়া লইলে তদ্দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হয় যে, মানুষের দশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইলে জ্ঞান বা অহঙ্কার জন্মাইতে আরম্ভ করে; এবং বিশ হইতে ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া চরমে উপনীত হয়।

এই জ্ঞানান্ধতা বা অহঙ্কার বিদূরণ করিয়া মনুষ্যত্ব বিকশিত করা যাহার কার্য্য তাঁহাকে 'অভিভাবক' কহা যায়। যে প্রণালী দ্বারা মনুষ্যত্ব বিকশিত করা হয় তাহাকে অভিভাবকতা কহে।

এস্থলে 'জ্ঞানান্ধতা' একটী নূতন শব্দ ব্যবহৃত হইল। সাধারণ ভাষার 'অজ্ঞানান্ধতা' শব্দেরই প্রচলন দেখা যায়; তাহার অর্থ জ্ঞানের অভাব জনিত অন্ধতা। কিন্তু আলোকের অভাবে যেমন চক্ষে দেখা যায় না, তেমন আবার অন্ধকার হইতে হঠাৎ প্রখর আলোকে আসিলেও ক্ষণিক অন্ধতা জন্মায়। জ্ঞানালোক সম্পর্কেও সেই কথা খাটে। জ্ঞানের অভাব জনিত অন্ধতাকে 'অজ্ঞানান্ধতা' বলা যায়। কিন্তু অজ্ঞান মানসে হঠাৎ জ্ঞানালোক ফুটিয়া উঠিলেও এক প্রকার গর্ব্বান্ধতা জন্মায়, তাহাকে এস্থলে 'জ্ঞানান্ধতা' বলা হইল। প্রখরালোক জনিত ক্ষণিক অন্ধতা আপনি সারিয়া যায়, প্রাকৃতিক নিয়মে চক্ষু আপনিই আলোক সহাইয়া লয়, একারণ সেই অন্ধতা দূর করিবার জন্য কোন আয়াসের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু জ্ঞানালোক কোন প্রাকৃতিক নিয়মে আপনি আসে না; তাহা চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা উপার্জ্জন করিতে হয়। একারণ জ্ঞানান্ধতা আপনি সারিতে পারে না, তাহার জন্য আয়াস প্রয়োজন হয়। নিজের অন্ধতা নিজে দূর করিতে পারা সহজ সাধ্য নহে,

তাহাতে আলোকবিভ্রম জন্মাইয়া উপচ্ছায়াকে সত্য বলিয়া ধারণা করাইতে পারে। এই হেতু জ্ঞানান্ধতা দূরকরিবার জন্য জ্ঞানীর সহায়তা প্রয়োজন। যাহার সাহায্যে জ্ঞানান্ধতা দূর করা যাইতে পারে, তিনিই 'অভিভাবক'।

অজ্ঞানান্ধতা দূর করিবার জন্য শিক্ষা প্রয়োজন, ও জ্ঞানান্ধতা দূর করিবার জন্য চালনা প্রয়োজন। যিনি অজ্ঞানান্ধতা দূর করিবার সহায়তা করেন, তাঁহাকে 'শিক্ষক' বলা যায়, এবং যিনি জ্ঞানান্ধতা দূর করিবার সহায়তা করেন, তাঁহাকে 'অভিভাবক' বলা যায়। শিক্ষকের কার্য্য, মনোবৃত্তি গুলিকে ফুটাইয়া দেওয়া, অভিভাবকের কার্য্য, সে গুলিকে কার্য্যে নিয়োজিত করা।

এস্থলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, শিক্ষকতা এবং অভিভাবকতা দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। যে স্থলে অভিভাবকতা বিদ্যমান নাই, সে স্থলে শিক্ষা সম্পূর্ণ অকার্য্যকারী প্রতিপন্ন হইবে। অভিভাবকতা না থাকিলে অর্থাৎ প্রদত্ত জ্ঞান সন্তানের জীবনে ও প্রত্যেক কার্য্যে ফুটাইতে না পারিলে, ঐ জ্ঞান ব্যর্থ হয়, তাহার ফল জ্ঞানান্ধতা অথবা অহঙ্কার ভিন্ন আর কিছু হয় না। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে অভিভাবকতা একপ্রকার লুপ্তপ্রায়। একারণ দেখা যায় যে, আমাদের শিক্ষিত সমাজে কেবল ইয়ুরোপীয় অথবা প্রাচীন আর্য্য মনীষীবর্গের চিন্তা সমুদ্ভূত গ্রন্থাবলীর এক একটী সজীব সংস্করণ মাত্র। বাস্তবিক তাহাদের ভিতরে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ অভাব। তাহাদের শিক্ষা তাহাদের জীবনে কি কার্য্য করিতেছে, তাহাদের চরিত্রের উৎকর্ষতা কি পরিমাণে সাধন করিতেছে, তাহা নিরাকরণ করা কঠিন। ভারতে গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান রাজস্ব সচিব ফুলার সাহেব যখন জব্বলপুরের কমিশনর ছিলেন, তখন একদিন কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, বিলাত-প্রত্যাগত ভারতবাসীদের চরিত্রে তাহাদের বিলাতী শিক্ষা কি পরিমাণে কার্য্য করিতেছে তাহা সহজে বুঝা যায় না। প্রকৃতপক্ষে অনেক স্থলে যে আমাদের চরিত্রবিকাশে শিক্ষা কার্য্যকরী হয় নাই, তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য। আমি যতখানি বুঝি তাহাতে মনে হয় যে, ইহার একমাত্র কারণ,—অভিভাবকতার অভাব।

আমাদের দেশে নামতঃ অভিভাবক ঘরে ঘরে দেখা যায়, কিন্তু কার্য্যতঃ অভিভাবক কয় জন আছেন জানি না; বালক দুবেলা বই লইয়া পড়িতে বসিয়াছে কিনা এবং নিয়মিত সময়ে আহার করিয়া স্কুলে গেল কিনা, এ সব দেখিলেই অভিভাবকতার পরাকাষ্ঠা হইল। তাহার উপর অর্থব্যয় করিতে পারিলে ঘরে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিয়া প্রচুর কর্ত্তব্য সাধন করা হইল। কিন্তু বালকের শিক্ষার সহিত চরিত্রের সামঞ্জস্যসাধন কোথায় হইতেছে তাহা কেহই দেখিতে পান না। শিক্ষক আপন কর্ত্তব্য সাধন করিয়া নিশ্চিন্ত, কিন্তু স্বনামখ্যাত অভিভাবকের মনে বিশ্বাস বালকের চরিত্রের জন্য শিক্ষক দায়ী। শিক্ষকতা এবং অভিভাবকতার পার্থক্য কোথায় এবং চরিত্রের শিক্ষার ফল প্রকটিত করা কাহার কার্য্য,তাহা আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, এক্ষণে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী বালকদিগের চরিত্র শোধনে কার্য্যকরী না হওয়ার প্রধান কারণ অভিভাবকদিগের ভিতরে অভিভাবকতার অভাব।

বালকদিগের কর্ত্তব্য জ্ঞান জ্ঞানান্ধতায় সমাচ্ছন্ন থাকে। একারণ তাহাদের উপর অভিভাবকতা নিয়োগ করা প্রয়োজন। কিন্তু অভিভাবকগণ অভিভাবকতা বিহীন হইলে উভয় পক্ষেই কর্ত্তব্যবোধ উপচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন হইয়া যায়। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল বর্ত্তমান শিক্ষার চরিত্রহীনতা, যাহার জন্য আমি শিক্ষাপ্রণালীকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ মনে করি।

গত এপ্রিলের Twentieth centuryতে উপমন্যুর আখ্যান বিষয়ে লিখিতে গিয়া প্রবন্ধকার এক স্থলে বলিয়াছেন 'In England, France and Germany students have to submit to school and college discipline for a certain number of hours, but for the rest of the day and night they are free &c .." অর্থাৎ ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মেনিতে ছাত্রগণ কেবল মাত্র দিবসের কয়েক ঘণ্টার জন্য স্কুল কিম্বা কলেজের শাসনধীনে থাকে, কিন্তু দিবসের অবশিষ্ট ভাগ ও রজনীতে তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে ইত্যাদি। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, প্রবন্ধ-লেখক কখনও কোন Boarding school কিম্বা college দেখেন নাই। ইংলণ্ডে কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল কলেজই Boarding college; তথায় কোন কলেজে, বোর্ডার ভিন্ন অন্য ছাত্র শিক্ষা পায় না। আমি সেইরূপ এক

কলেজে শিক্ষা পাইয়াছি। আমাকে-ডিনারের সময় নিয়মিত উপস্থিত না থাকিলে টিউটারের কাছে জবাব দিতে হইত; তিনজনের বেশী বন্ধুকে আমার ঘরে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে টিউটরের অনুমতি নিতে হইত; রাত্রি দশটার পর আমার নির্দ্দিষ্ট ঘরের বাহিরে থাকিলে তাহার জন্য জরিমানা দিতে হইত; অন্যান্য দিন সন্ধ্যার পর এবং রবিবার সমস্ত অহোরাত্র স্ব স্ব কলেজের নির্দিষ্ট পোষাক না পরিয়া বাহিরে গেলে জরিমানা দিতে হইত; ঐ পোষাক পরিয়া চুরুট খাইলে জরিমানা দিতে হইত ইত্যাদি। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত প্রবন্ধকার যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভুল। বস্তুতঃ ইউরোপীয় বোর্ডিং স্কুল ও কলেজে অভিভাবকতা যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে, একারণ আমাদের দেশীয় শিক্ষা হইতে বিলাতী শিক্ষার এত উৎকর্ষ।

এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, 'তবে বিলাত প্রত্যাগত যুবকদিগের মধ্যে, ফুলার সাহেবের মতন বিচক্ষণ ব্যক্তি শিক্ষা ও চরিত্রের সমঞ্জস্য দেখিতে পান না কেন?' তাহার একমাত্র উত্তর 'আমরা বিলাত গিয়া অভিভাবকতার বন্ধন হইতে যথাসাধ্য দূরে থাকিতে, এবং টিউটরের উপদেশে জীবন গঠন করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে একটী middle-some quantity মনে করিয়া তাঁহার শাসনকালে পতিত না হইবার জন্য, যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকি।' আমরা বিদেশী বিজাতীয় বলিয়া টিউটরেরা আমাদিগকে অনেক বিষয়ে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন, ইহাই আমাদের সর্ব্বনাশের হেতু হইয়া দাঁড়ায়।

কেম্ব্রিজ এবং অক্সফোর্ডে প্রত্যেক কলেজের ছাত্রেরা একত্রে 'ডিনার' করিতে বাধ্য। আমি একজন ভারতবাসী, আমি গিয়া টিউটরকে বলিলাম মহাশয়, আমি সকলকে ছুঁইয়া খাইব না,' কিম্বা 'আপনাদের খাদ্য আমার পোষায় না'। টিউটর মহাশয় আমাকে বিজাতীয় জানিয়া একত্র ভোজন হইতে অব্যাহতি দিলেন। কিন্তু ফল এই হইল যে, আমি ইউরোপীয় সামাজিকতার গণ্ডীর বাহিরে রহিয়া গেলাম। এই কারণে অনেক ভারতবাসী ইংলণ্ডে বহুদিন বাস করিয়াও ভাল ইংরাজি টুকু বলিতে শিখে না। এই কারণেই আমরা অনেকে বিলাত গিয়া বাঙ্গালা টুকু ভুলিয়া যাই, অথচ ইংরাজিটুকু শিখি না। এ সব বিষয়ে আমাদিগের কি কর্ত্তব্য তাহা আমরা নিজেরাই নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করি। কখনও টিউটরের উপদেশ গ্রহণ করি না; এবং টিউটরও আমাদের রীতি নীতি না জানাতে আমাদিগকে চালাইতে পারেন না। এইরূপ অবস্থায় আমরা অভিভাবকতাবিহীন হইয়া বাস করিয়া থাকি।

বিলাত প্রবাসীদিগকে ছাড়িয়া দিয়া দেশীয় ছাত্রদিগকে দেখিতে গেলেও অভিভাবকতার নিদর্শন পাওয়া কঠিন। সমস্ত ভারতবর্ষ যুড়িয়া এই কলরব শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, আমাদের শিক্ষা প্রণালীর দোষে বালকগণ চরিত্রহীন হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু শিক্ষা প্রণালীর কোন্ অঙ্গে দোষ লিপ্ত আছে তাহা কি কেহ বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছেন? আমাদের দেশে শিক্ষকতার অপর প্রত্যঙ্গ অভিভাবকতা কোথায়? শিক্ষক যদি আপন কর্ত্তব্যের গণ্ডী ছাড়াইয়া অভিভাবকতার গণ্ডীতে পদার্পণ করেন, অমনি স্বনাম-খ্যাত স্বাভাবিক অভিভাবক বলিলেন 'ছেলেকে নষ্ট করিতেছে' ছেলে শিক্ষকের কাছে শুনিল 'বাল্য বিবাহ দূষণীয়'। বাড়ীতে পিতা বলিলেন 'বাছা তোমাকে এবার বিবাহ করিতে হইবে।' ছেলে যদি পিতাকে বলে 'বাবা, বাল্যবিবাহ দূষণীয়', অমনি তাহার গণ্ডে চপেটাঘাত নামক অব্যর্থতার মহৌষধি প্রয়োগ করা হইবে, ও সেই সঙ্গে শিক্ষকের অনধিকার চর্চ্চা করা অপরাধে মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা হইবে। ছেলে যদি দুইদিক বজায় রেখে বলে 'বাবা, আমার এখন বিবাহে অনিচ্ছা' অমনি পিতা বলিলেন "বেটা, তোর চৌদ্দ পুরুষ বিবাহ করিতে পারিয়াছে, আর তুই পারিবি না? তোর আবার ইচ্ছা কি? আমি তোর অভিভাবক, আমার ইচ্ছাকেই তোর ইচ্ছা করিয়া লইতে হইবে।' এরূপ যে দেশে প্রতিদিন ঘটিতেছে, সে দেশে শিক্ষকতা ও অভিভাবকতার সাম্য ঘটিতে পারে না, অথচ বালকগণ অভিভাবক বর্ত্তমানেও অভিভাবকতা প্রাপ্ত হয় না। এই দোষ শিক্ষা প্রণালীর নহে; ইহা সর্ব্বতোভাবে অভিভাবকদিগের দোষ।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, অন্য জাতির অভিভাবকেরা সকলেই কি কর্ত্তব্য পরায়ণ? তাহা নহে, তবে ইউরোপীয় দেশ সমূহে স্বাভাবিক অভিভাবক নিজে অভিভাবকতা করিতে না পারিলে সন্তানকে বোর্ডিং স্কুলে দিয়া থাকেন। সেখানে শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকতারও বন্দোবস্ত থাকে; একারণ আমাদের দেশের ন্যায় সে সব

দেশে শিক্ষা এত বিফল হয় না। আমাদের দেশে যেমন ঘরে অভিভাবকতা নাই, সেরূপ বোর্ডিং স্কুলও একেবারে নাই বলিলেই চলে। ইউরোপে প্রায় সর্ব্বত্রই বোর্ডিং স্কুল স্থাপিত আছে।

চরিত্রের সামঞ্জস্যেই জাতীয় চরিত্র প্রস্ফুটিত হয়। এই সামঞ্জস্য বোর্ডিং স্কুল ভিন্ন হইতে পারে না। এ কারণ বোর্ডিং স্কুলের অভাবে আমাদের জাতীয় চরিত্র জন্মাইতেছে না। মুসলমানদের ভিতরে যে কিঞ্চিৎ জাতীয় চরিত্র ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহার বর্ত্তমান মূল আলিগড়ের কলেজ। যে পর্য্যন্ত আমাদের দেশে সেইরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর যতই সংস্কার হউক না কেন, আমাদের শিক্ষা চিরকাল চরিত্রবিহীন থাকিবে। ঘরে ঘরে অভিভাবকতা প্রচারের সময় ও উপায় নাই বলিয়াই এক্ষণে আমাদের দেশে বিলাতী Public schoolএর ছাঁচে গড়া বোর্ডিং স্কুলের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশে এক্ষণে ভাল শিক্ষকের যত না অভাব, ভাল অভিভাবকের তাহাপেক্ষা শতগুণ অভাব হইয়া পড়িয়াছে।

পাঠকগণের নিকট এক্ষণে এই বিচার প্রার্থনা করি যে, অভিভাবক নিবারিণী সভার প্রয়োজন না থাকিলেও আমাদের দেশে 'অভিভাবকতা সঞ্চারিণী' সভা প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে কি না? বয়স ধর্ম্মে সভার নাম পরিবর্ত্তন হইল মাত্র।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

হাস্য রসের রচনা।

১ম প্রবন্ধ।

১। 'হাসির গান। (Comic Songs)
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত।
২। ছাইভস্ম। (পরিহাস কবিতাদি)
শ্রীরসময় লাহা প্রণীত।
৩। খিচুড়ী। শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী প্রণীত।
৪। Poems Grave and Gay, By Tom Hood
৫। Legends of Marth and Marvels.
By Thomas Ingoldsby, Esq
৬। An Evening with "Punch"
(Selections from "punch'' of the first fifty years
1841—1891)
৭। আরব্য উদ্ধার। শ্রীরামদাস শর্ম্মণ বিরচিত।

বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন আমলে নিছক হাস্য রসের রচনা, পৃথক ভাবে লইয়া একমাত্র ইন্দ্রনাথ বাবু ভিন্ন সর্ব্ব প্রথম বোধ হয়, মিষ্টার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ই উপস্থিত। ইঁহার পশ্চাতে বা সঙ্গে সঙ্গে আরও কেহ কেহও উপস্থিত। ইঁহাদের অব্যবহিত পূর্ব্বে, আমাদের 'ইঙ্গবঙ্গ' সাহিত্যের অভিব্যক্তির ঐ অভিনব অধ্যায়েই, ঠিক এরূপ রচনা না হউক, এই রসের রচনা অবশ্যই ছিল। ছিল না, কে বলিতে পারে? হাসি তামাসা, নষ্টি নষ্টি নহিলে মানুষ কখন বাঁচে,—কতক্ষণ থাকিতে পারে? কাব্য কবিতা ও কোমল সাহিত্যের রচয়িতা মাত্রেই,—নূতন পুরাতন যে যুগেই, তাঁদের যিনি জন্মান, স্থল বিশেষে ও সময়-বিশেষে রঙ্গতামাসার তুফান তুলিতে, প্রায় কেহই কখনও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। 'রসিকতা বুলিখানা' কিঞ্চিৎ রসাল ও বোসনিদার হইলে ত রক্ষাই নাই,—রঙ্গতামাসার তুবড়ি চরকি হাউই, ছুটিয়াই চলিয়াছে;—রস-সিন্ধুর উপর্য্যুপরি উত্তাল তরঙ্গে তুমি 'তো। পাড়'। পক্ষান্তরে, সে পদার্থটী কিনা রচকের রসিকতাটী, নীরস, কষা, রশ্মিহীন ও নেহাত ভোঁতা হইলেও, সেটীকে রগড়ারগড়ি করিয়া, ছানিয়া চটকাইয়া, ধুনিয়া ছানিয়া, নিঙড়াইয়া, দু' চারি বুদ্ 'রস'? —না হয় কস ক্লেদ-কলতানি বা তদ্বৎ কোনও তরল বা তরলাতরল সদৃশ বা বিসদৃশ বস্তু বাহির করিয়া, বাহারার বাজারে ছাড়িয়া দেন। হাস নিজে যেমন আসল ও 'জাল' নানা জাতীয়ই হয়, হাস ফোটাইবার ফিকির-ফন্দি, মন্ত্রতন্ত্র-যন্ত্র,—উপায়-উপাদান, ঔষধ ও মুষ্টিযোগ, ভিন্ন ভিন্ন ভেয়ানের ও রকম রকম ছাঁচের ছন্দের, কৌশলের ও "রকালের" হয়। উহা যেমন—এক দিকে সহজ স্বাভাবিক সঙ্গত, অতএব উপাদেয় ও ভোগ্য হয়, আবার তেমনি কৃত্রিম, ক্লিষ্ট, কষ্ট-কল্পিত, পিয়াদা মৌশিল দয়া আনীত,—হরেক হেকমতের ও' হইতে দেখা যায়,—হইয়া যাহা হয়, তাহা হয়ই। রস হউক বা না হউক, রস থাকুক বা না থাকুক, রসিকতা ঢালোয়া ঢালিয়া দিবার ইচ্ছা; অন্তত উহা একটু ছিটাইবার সাধ প্রায় সকলেরই হয়। রসিকতার ভাণ্ডটী নেহাত শুষ্ক ও শূন্য হইলেও, চাই কি, সে ভাণ্ডটী একেবারে না থাকিলেও চাহিয়া চিন্তিয়া ভিক্ষা শিক্ষা করিয়া, বা লুকাইয়া চোরাইয়া, কাহারও পুরাণ বা নূতন রসভাণ্ড হইতে পচা, সড়া, নোংরা বা আধ পচা বা অত্যন্ত তাজা,

তপ্ত, আনকোরা, যেমনই হউক,—সাবধানে গোপন সম্ভাব্য বা হাতে-হাতে গ্রেপ্তারযোগ্যই হউক,—অল্প বিস্তর ঐ জলীয় জিনিসটা, ঢালিয়া, নিঙড়াইয়া ছাকিয়া লইয়া, "খোদ সরবরাহকার" বা "মুদাফতি মারফতদার" স্বরূপ যে হিস্যা বা হিসাবেই হউক, যৎকিঞ্চিৎ "রসিক" হইবার বাসনা অনেকেরই মনে অল্প বিস্তর বলিষ্ট। হাসি আসে না, তবুও যেমন তোমাকে আমাকে খাতিরে পড়িয়া বা দায়ে ঠেকিয়া কত সময়ে, কত স্থলে 'কাষ্ট হাসি' হাসিতেই হয়, তেমনি কত লোকে ও লেখকে হাসাইতে পারেন না, তবুও তাহার প্রাণপণ তদ্বির করিতেও ছাড়েন না। ফলতঃ নিরসতাতেও রসোদ্গার এবং রসিকতার অত্যন্তাভাব সত্বেও তাহার পুনঃ পুনঃ প্রচার, লোকের, বিশেষতঃ রসহীন রসরচয়িতাদের কেমন একটা রোগেরই মধ্যে রসিকতা-রোগটা নিজে হাস্যোদ্দীপক বটে কিন্তু রোগীর রোগ ভোগ দেখিয়া হাস্য করা নিষ্ঠুরতা।

হাল ও সাবেক সাহিত্যে, হাস্য-রস-রচয়িতা অনেকের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হয়। হাল সাহিত্যে বঙ্কিম বাবু হইতে আরম্ভ করিয়া, হাত নাগাত নলীন্, পুলীন, অলীন্ বাবু অনেকেই পদ্য ও গদ্য ছন্দে হাস্য রস রচিয়াছেন। তাহা ভিন্ন, সাহিত্য-ক্ষেত্রের নাতিদূরে, নাট্য মঞ্চে হাস্য রসের ছড়াছড়ি,—নিছক হাস্য রসের হাউই ছুটাইবার জন্যেই প্রহসন; হাল সাহিত্যে প্রহসন পদে-কাহনে জন্মিতেছে; "পাঞ্চ" পঞ্চানন্দও অপ্রচুর নয়।

রস-রচয়িতা মাত্রেই প্রায় হাস্য রসের "রচক"। এবং হাস্য রস অপরাপর রসের সহগামী। হাস্য সর্ব্বত্রই 'হাস্য' বটে, ক্রন্দন কোথায়ও নয়; কোথায়ও কোথায়ও উহা কার্য্যতঃ ক্রন্দন বা ক্রন্দনের কারণ হইলেও হাস্য নামটা নিশ্চয়ই কোন স্থলে হারায় না। তবে, যে সব স্থলে, হাস্য রস অপরাপর রসের অনুগামী ও সহগামী, সে সব স্থলে, উহাকে নিছক বা একক হাস্যরস না বলা যাইতে পারে। কাব্যে সাহিত্যে হাস্যরস; হাল সাবেক সকল সময়েই, অপরাপর রসের সহিত একত্রে অবস্থিত থাকা দেখা যায়। এক মাত্র নাট্য মঞ্চের প্রহসনকার ভিন্ন কোনও কবি স্বতন্ত্র ভাবে কেবল মাত্র এক হাস্যরসের পসরা লইয়া সাহিত্যের হাটে কদাচিৎ উপস্থিত হইতেন।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত যুগে, বিদূষকগণ হাস্য ভাণ্ড বহন করিতেন। নিছক হাস্য এবং নিন্দা এবং ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা বিদূষকদের ব্যবসা ছিল। সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে, বিশেষতঃ নাটকে প্রহসনেই, বিদূষকদের সঙ্গে দেখা হয়। কাব্য বা নাট্য প্রসঙ্গের যত কিছু হাস্য কৌতুক, নিন্দা কুৎসা ও ব্যঙ্গ তাহার প্রায় সবই প্রধানতঃ অভিব্যক্ত ও অভিনয় করেন বিদূষক। এ অধিকার এবং কার্য্য আর কাহারও নয়, কেবল মাত্র তাঁহারই। নাটককার কবি নিজে এই অধিকারের কার্য্য করা বা অপর কোনও নায়ক নায়িকা বা কাব্যোল্লিখিত ব্যক্তি দ্বারা করান অনুপযোগী ও অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়াই যেন উহার জন্যে বিদূষক নিযুক্ত করিয়াছেন। তত্তৎ কালের সামাজিক ব্যবহারের বিধি নিষেধে সম্ভবতঃ ঐরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল।

বিদূষকগণ, রাজসংসারে ও রাজসভায় থাকিতেন। রাজ সভার এক শ্রেণীর সদস্য মধ্যেও পরিগণিত ছিলেন। বিদূষক নহিলে রাজ দরবার কেবল বেমানান ও "বেমশগুল" নয়, অঙ্গহীন ও অপূর্ণই থাকত। বিদূষকগণ রাজসভার অপরিহার্য্য উপাঙ্গস্বরূপ ছিলেন এবং সভায় ও সমাজে স্বপদ ও অধিকারোচিত অনুগ্রহ ও আদর প্রাপ্ত হইতেন। অধিকারাধীন কার্য্যে বিশেষত্ব ও প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিলে, যশস্বী হইয়া প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভও করিতেন। এতাদৃশ অবস্থায় সে কালে হাস্যরস উপজীবী ও বিদূষকবৃত্তি-অবলম্বী বিশেষ এক শ্রেণীর লোক স্বতন্ত্র ভাবে উত্থিত হইবার অবসর পাইয়াছিল এবং চিত্তরঞ্জক সম্প্রদায়স্থ অপরাপর শ্রেণীর শিল্পী ও গুণীদের মত, স্বকীয় সাম্প্রদায়ীক ব্যবসায়ে ও স্ব স্ব করণীয় কার্য্যে গৌরব জ্ঞান করিয়া সমাজে বিচরণ করিত, এমন অনুমান করা অসঙ্গত না হইতে পারে। পরন্তু ইহাও খুব সম্ভব যে, লাভকর নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-ক্ষেত্র পাওয়াতে রাজসভায় রাজানুগ্রহ ও উৎসাহ এবং সম্ভ্রান্ত জন সমাজে সমাদর ও সুখ্যাতি পাওয়াতে ঐ শ্রেণীতে উপযুক্ত লোক সকল আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং উহাদের হাস্যরসোদ্দীপক শক্তি ও তদানুষঙ্গিক কল্পনা, রচনা কৌশল ও বাকপটুতা প্রভৃতি ক্ষমতা সবিশেষ বিকাশ লাভ করিতে পারিয়াছিল;

বিদূষকগণ রাজ-বয়স্য, সঙ্গী ও মোশাহেব স্বরূপ রাজা, রাজবাড়া ও উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ধনী লোকদের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা ফিরিতেন। ও তাঁহাদের চিত্ত-রঞ্জন ও দরবারের



"দেবীযুদ্ধ" রচয়িতা
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ, ।



শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত ।

গৌরব গরিমার বর্দ্ধন করিতেন। হাসি, তামাসা ও ঠাট্টা বিদ্রূপ উপলক্ষে অনেক সময়ে সকলকেই, এমন কি প্রতিপালক প্রভুকেও মুখের উপর কৌশলক্রমে, খুব 'উচিত কথা' ও অপরের অনুচ্চারণীয় ও অবাচ্য কথা শুনাইয়া দিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। রাজকীয় অনুগ্রহে তাঁহারা এইরূপ 'উচিত বলা'র ও শ্লেষ ও বিদ্রূপ করার অধিকার পাইয়াছিলেন এবং সমাজও অবশ্য তাহা অনুমোদন করিয়াছিল। নহিলে এমন ব্যঙ্গ ও "বে-আদপী"র অধিকার বিদূষক ব্যতীত আর কাহারও তখন ছিল না। হইতে পারে, সে কাল অপেক্ষা একালে, সময় ও সভ্যতার উন্নতি ভেদে, রুচি সূক্ষ্ম ও মার্জ্জিত হইয়াছে। কিন্তু, বিদূষকদের এই 'অধিকার' অপরাপর আরও অনেক ব্যাপারের ন্যায়, তখনকার রাজা, রাজবাড়ী ও সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তিগণের উদারতা ও সরলতার বিশেষ পরিচায়ক বলিতে হইবে। একালে এটা কিন্তু, একবারেই উল্টাইয়া গিয়া বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখনও রাজা মহারাজাদের 'মসনদের' চারিপার্শ্বে ও বড় লোকদের মজলিসে, বিদূষক গোছের মোসাহেব দেখা গিয়া থাকে। এখন মহারাজামোসাহেবী বা বাবু-বিদূষকী সম্বন্ধ কিন্তু স্বতন্ত্র। এখনকার বিদূষক কেবল পরকুৎসাকারী নীচ প্রকৃতির নিন্দুক নয়, প্রভুর পুনঃ চাটুকর ও সাংঘাতিক জিঘাংসা পরায়ণ "চুকলখোর"। তথাচ এমন বলা যায় না যে, সে কালে হাস্য ভাণ্ড ধারক ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ-বাহক, রাজসভার অনুগ্রহ ও জনসমাজের আদর সত্ত্বেও, খুব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দরবারে যে কদরের কার্য্যকারী ও যে দরের কারবারী ছিলেন গুণে জ্ঞানে যতই দক্ষ হউন, লোকে তাঁহাকে সেই দৃষ্টিতেই দেখিত। বিদূষকের আভিধানিক অর্থ নিন্দুক, হাস্য ভাণ্ডবাহী "ভাঁড়"। আমোদ উৎপাদন ও আনন্দ প্রদানই ছিল ইঁহাদের অস্তিত্বের মূল উদ্দেশ্য ও একমাত্র কার্য্য। এবং আমোদানন্দ উৎপাদিত ও হাস্য তরঙ্গ প্রবাহিত করিবার অভিপ্রায়ে যে প্রকৃতির ও যে পরিমাণের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষাদি কল্পনা ও প্রয়োগ করা প্রয়োজন হইত, কেবল তাহাই নানা কথার ও কার্য্যের নৈপুণ্যছলে এবং গদ্য পদ্যের কৌশলে, অতি সরল ও সরসভাবে প্রযুক্ত করিতেন। অতএব সে সব ব্যঙ্গ বিদ্রূপ যতই ব্যক্তিগত হউক, কিছুমাত্র কষ্টদায়ক মর্ম্ম বা চর্ম্ম বিদারক বা রূঢ়তাব্যঞ্জক হইত না,—অন্ততঃ তদ্রূপ ভাবে তাহা কেহ কখনও গ্রহণ করিত না। তাহা পরিহাসোদ্দীপক আমোদোৎপাদক ও আনন্দদায়ক, হইয়া সকলেরই উপভোগ্য হইত, ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বিষয়ীভূত ব্যক্তি নিজে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপভোগ করিতেন। সে কালের সরল ও সরস অন্তঃকরণের সেই আমোদকর উপভোগ্য কোনও বাক্যাবলী, তৎকালে রাজা মহারাজাকে প্রয়োগ অযোগ্য না হইলেও, একালে কোনও সাধারণ নগণ্য লোকের প্রতি প্রযুক্ত বা ব্যবহৃত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহা অভিমানস্ফীতের মান-বিনাশক হইতে পারে ও পেনাল কোডের ধারা বিশেষের অভিযোগ যোগ্য ও দণ্ডনীয় হইয়া, তামাসাকারীকে কারাগার প্রেরণের কারণ হইয়া পড়ে। ইহার অবশ্য আর এক "পীঠ" আছে। সেটা পরে দেখান যাইবে।

সে কালের সাময়িক রীতি ও সামাজিক প্রথানুসারে, লোকের রুচি অবশ্য অন্যরূপ ছিল; তাহাকে আমরা এখন অমার্জ্জিত ও স্থূল রুচি,—চাই কি অশ্লীল উক্তি বলিতে পারি। তা, এটা কাল ও দেশভেদে ভিন্ন হইয়াই থাকে, সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেই হইয়া চলিয়াছে। সে কালের প্রথানুরূপ রুচি অনুসারে ব্যক্তিগত বৈবাহিক ও পারিবারিক অতি নিকট বা দূর সম্পর্ক উপলক্ষ্য করিয়া, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও হাস্য পরিহাস বিলক্ষণই চলিত। হাস্যাধিকারে এরূপ বিদ্রূপের নিষেধ ছিল না, সম্পর্কের অধিকারানুসারে ইহার অবাধ প্রচলন ছিল। ব্যঙ্গব্যবসায়ী বিদূষক এ বিদ্রূপেও বঞ্চিত ছিল না। রাজকীয় প্রভুর বেহাই বেহান, শ্যালক শ্যালিকা শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতিকে বাকচাতুর্য্যে বিদ্ধ করিয়া হাস্য কৌতুক উৎপাদন করিতে ছাড়িত না। বিদূষক আপনাকেও আপনি ছাড়িত না, স্বকার্য্য সাধনানুরোধে আপনাকেও অসংখ্য রকমের 'সঙ' সাজাইত।

বাঙ্গালার খাস বাঙ্গালা আমলে ঐরূপ হাস্য কৌতুকের ভাণ্ড যাহাদের হাতে পড়িয়াছিল, তাহাদের নাম ছিল "ভাঁড়"। "ভাঁড়" বিদূষকেরই পরবর্ত্তী সংস্করণ ও বিদূষকেরই কার্য্য সম্পাদক ব্যক্তি ও নামান্তর মাত্র। বাঙ্গালা আমলে সংস্কৃত "বিদূষক" বিদায় লইয়া বাঙ্গালী "ভাঁড়" কে স্বপদে পদস্থ হইতে দিয়াছিল। কৃষ্ণনগর দরবারের ভাঁড়রাজ "গোপাল ভাঁড়" বাঙ্গলা মুলুকে

অমর হইয়া আছেন। প্রতি গৃহে ঐ নাম পরিচিত। প্রত্যেক বাঙ্গালী-কণ্ঠে গোপালভাঁড়ের নাম উচ্চারিত, সদরে অন্দরে অঙ্গনে উনুনের পীটে তাহার" ভাঁড়ামির" গল্প আবৃত্তি পুনরাবৃত্তি হইয়া হো হো হাসির ঢেউ উত্থিত অদ্যাবধি হইতেছে, হয়ত চিরকালই হইবে। খুব লোকপ্রিয় কোন বাঙ্গালী কবি, কীর্ত্তনিয়া বা যাত্রাওয়ালা, অতটা লোকময় কিনা সন্দেহ। গোপালের পরবর্ত্তী কালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধরগণের আমলে বহুপুরুষ পর্য্যন্ত ঐ পদ, হাস্যরসরসিক আরও বহুযোগ্য ব্যক্তি অধিকার করিয়া দরবার গুলজার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও নাম অল্পাধিক পরিমাণে আজও লোকের মনে আছে। এখন আর "ভাঁড়ের" সেরূপ পদ ও অধিকার দেশের কোথাও নাই, "ভাঁড়ামি" কথাটী সম্ভ্রমকরও নয়।

ভাঁড়দের কর্ত্তৃক হাস্যরসের কল্পনা ও রচনার কার্য্য বহুস্থলে সাহিত্যের সহিত সংযোগযোগ্য বা সঙ্কলন সম্ভাব্য হইলেও, সে কালে ভাঁড় সম্প্রদায় সাহিত্যাধিকারের বাহিরেই ছিলেন। একালে বরং তাঁহাদিগকে বা তাঁহাদের কর্ত্তৃক তৎকালে কৃত স্থায়ীরূপে রক্ষাযোগ্য কার্য্যকলাপকে সে অধিকারে গ্রহণ করা হইতেছে।

হাল সাহিত্যে, মৃত দীনবন্ধু মিত্র তাঁর সময়ে 'হাস্যাবতার' বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। অনাবিল, নির্দ্দোষ আমোদ আরাম দায়ক হাসির উৎস ছুটাইতে অমনটী আর দ্বিতীয় ছিল না; আজও এ ক্ষেত্রে দীনবন্ধু বোধ হয় অদ্বিতীয়ই রহিয়াছেন। সম্ভবতঃ চিরকালই থাকিবেন। যেমনটী যায়, তেমনটী আর হয় কি? সর্ব্বভূতে সমবেদনা যুক্ত, দয়া মমতার দুগ্ধ ধারায় উচ্ছলিত, অসূয়া-সংস্পর্শবিরহিত, ক্রোধহীন, নিরহঙ্কার, সুখে দুঃখে রোগে তাপেও সদা প্রফুল্ল, সুশিক্ষিত সুমার্জ্জিত, উদার মহৎ অন্তঃকরণের অমন উচ্চ, অবাধ, পূর্ণ ও প্রীতি-জ্যোতি-পুলকিত হাসি আর কোথায়! দীনবন্ধু বাবুর নাট্য প্রহসনে হাস্য রসের লহরী লীলা। কিন্তু, তাঁহার নিজের কৌতুকোদ্দিষ্ট স্বাভাবিক কথোপকথনে যেজীবন্ত হাস্যরস সশরীরে মূর্ত্তিমান হইত, তাহার তুলনায় তাঁহার নাটকে, প্রহসনে কাব্যে প্রকটিত হাস্য রস, মধুরোজ্জল হইয়াও, প্রায় কিছু নয় বলা যাইতে পারে। কেবল রসের পরিমাণ ও গৌরবগণনায় গুণীর গুণ নির্দ্ধারণ করিতে গেলে, মিত্রজ মহাশয়কে হাস্য রসের কবি বলা বোধ হয়, অসঙ্গত হয় না।

দীনবন্ধু-বঙ্কিম-সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের নাতি পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে কাব্য কাণ্ডের সহিত হাস্য রসের ভাণ্ড, সহজাত শক্তির স্বত্বাধিকার সূত্রে কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়াছিল ও জিম্বা ছিল নিছক বাঙ্গালা সাহিত্যের শেষ বাঙ্গালী কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের। গুপ্ত কবির সম্মুখে, পার্শ্বে ও পশ্চাতে প্রতিযোগী পাল্লাদার, সহযোগী জুড়িদার ও সাগরেদ শিক্ষানবিশ আরও ছিলেন অনেকে। গুপ্ত-গুড়গুড়ে-উদ্গারিত রসের—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শ্লেষাদি মূলক ও তদতিরিক্ত ও তদ্‌সম্প্রসারিত গোরব গালিগালাজের গুলজার-ঝঙ্কারিত হাস্যরসের উত্তাল তরঙ্গতুফানে,—তাহার 'ফেরতা ফেরতা' পাল্টা দরপাল্টা প্রবাহের প্রখর প্রচণ্ড প্লাবনে ও উজান ভাটি উভদিক ব্যাপী আলোড়ন বিলোড়নে, কতকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা মুল্লুক বিপুল অনুরাগে ও বিপর্য্যয় বেগে এক বিরাট 'বাইচ' খেলার পাল্লা দিয়াছিল; এবং বাঙ্গলা সাহিত্যের তরী সে বেগ ধারণ করিয়া 'বান্‌চাল' না হইলেও কিরূপে বিপন্ন ও ব্যথিত হইয়াছিল, তাহা এখন কেবল অনুমেয় এবং এ সময়ের কোনও কোনও দিক বিশেষের রসোদ্গারের ক্রিয়া প্রক্রিয়ার সহিত তুলনীয়। গুপ্ত গুড়গুড়ের অপকৃষ্ট ও অপভ্রংশ অংশ আজও বিদ্যমান আছে এবং বিগত কতক কাল হইতে বেগে বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু, সেই অপকৃষ্ট অংশের সঙ্গেও যে, সে কালের একটা সাবেক সরলতা ছিল তাহা আর এখন নাই। সে সরলতার স্থান এখন গরলতায় অধিকার করিয়াছে। তখন তাঁহাদের তাৎকালিক রুচি অনুরূপ ও জন সাধারণের উপভোগ উপযোগী রসের সৃষ্টি ও পুষ্টির অভিপ্রায়ে, এবং "কবি-যুদ্ধে" প্রতিযোগীর সহিত জয় পরাজয়ের জিদাজিদিতে, আবশ্যকস্থলে শাস্ত্র ও শস্ত্র-কৌশলে, আদিরস সিঞ্চিত অল্পাধিক অশ্লীল উক্তি বা গা ঢাকা গালিগালাজের কাব্যগত ব্যবস্থা ও ব্যবহার করা হইত; তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল হো হো হাস্যের অবতারণা ও প্রতিযোগীর "কবি-শক্তির" অবমাননা এবং লাঞ্ছনা গঞ্জনা করা; তদ্ভিন্ন তদ্দ্বারা তাহার আর্থিক পারমার্থিক, বৈষয়িক, সাংসারিক ও সামাজিক সর্ব্ববিধ অনিষ্টের ও সর্ব্বনাশের কামনা ও

সাধনা করার অনুমাত্রও উদ্দেশ্য থাকিত না। তাহা তখনকার লিপি যোদ্ধাদের স্বপ্নাতীত ছিল। এখন সেইটাই হইয়াছে সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। যে লোকের উপর লিপিজীবীর জাত-ক্রোধ ও যে সূত্রেই হউক কলহ বিবাদ, তাহা সে নিবন্ধ হউক বা যাহাই হউক সে বেচারী ও তাহার অষ্টবিংশ পুরুষ লিপি আক্রমণ ও জঘন্য বচন-রস উদ্ভাবিত বিষাক্ত গালি বর্ষণের বিষয়ীভূত হয়। এবং লিপিকর, কুৎসা কৌশলে তাহার সর্ব্বপ্রকার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হন। সেকালে একালে, তফাৎ এই। আর তফাৎটা কি সাংঘাতিক, সাহিত্যের ও সমাজের কি ভয়ানক পীড়াদায়ক, তাহা কেবল অনুভবনীয় "লাইবেলের" ভীতি ও দণ্ডবিধির দুর্গতিতেও এই দুরন্ত রস-স্রাবের অবাধ স্রোতে বাধা দিতে পারিতেছে না। তা, কটা লোকেই বা তাহা করিয়া উঠিতে পারে ও করিতে গিয়া অগ্নিময় কটাহ হইতে অগ্নিকুণ্ডে পড়িতে চায়।

গুপ্ত কবির হাস্যরসের রচনায় তৎকালের লোক বড়ই প্রীতিলাভ করিতেন। আমরা বাল্যকালে, অনেককেই উহা অতি আগ্রহ ও আদরের সহিত আবৃত্তি করিতে শুনিতাম। এখনও কোন্ উহার আদর না আছে। গুপ্ত মহাশয়ের অনেক সাগরেদ জুটিয়াছিল। দত্ত অক্ষয় কুমার বাবু, বঙ্কিম বাবু, দীনবন্ধু বাবু, রঙ্গলাল বাবু প্রভৃতি, পরে স্ব স্ব খোদিত পথে উদিত হইয়া কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রথম উদ্যমে ইঁহারাও ঈশ্বর গুপ্তের ওস্তাদী স্কুলে অল্পাধিক সাগরেদী করিয়াছিলেন। দীনবন্ধুতে ও রঙ্গলালে ঈশ্বরী-আভা দিব্য একটু ছিলও বটে।

ঈশ্বর গুপ্তের "জের" মদনমোহন তর্কালঙ্কার। "বাসবদত্তা"য় সে কালের প্রাচীন ছাঁচের কাব্যের সর্ব্বশেষ আহুতি। মদনমোহন হইতেই পুরাতন প্রদীপ পূর্ণ নির্ব্বাণ, এবং মাইকেল দত্তের "মেঘমন্দ্র" মহা আসরে নূতন ইঙ্গ-বঙ্গ—বিলাতি বাঙ্গালাগানের উৎপত্তি। সে বহুকালের কথা নয়;—প্রায় এই সে দিনকারই কথা। মধ্যে দুইটা দশ বৎসর পার হইয়াছে মাত্র। কিন্তু ইহার মধ্যেই আমরা নূতনের পর নূতন, নূতনের নূতন, নেহাত আনকোরা নূতন-আসর, সুর ও ছন্দ দেখিতে পাইতেছি। একটাও যেন বাসী হইতে, পাকিতে ও টিকিতে পারিতেছে না। মাইকেলী সুর মারা গিয়াছে; হেমচন্দ্রী সুর হারিয়া গিয়াছে। কিছু কাল হইতে আর একটা সুর বা একটা ছোট সুরকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকটা খাট খাট আনকোরা নূতন সুর ঘুর ঘুর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এ সুরটা বা সুর কয়টা কিন্তু নেহাত চুটকী সুর। ওস্তাদী আখড়াই, হাফ্ আখড়াই আসরের পর যেন খেমটাউলীদের খেমটার আসর,—আড় খেমটা, গড় খেমটা ও খেমটা এই তিন শ্রেণীতে ইহা বিভক্ত করিলে করা যাইতে পারে। নিছক ও খাটি খেমটার সুর একা ক'দিন টিকিবে বলা যায় না, টিকিলে বাঙ্গালী পুঙ্গবেরা নিশ্চয়ই নিশ্চিন্তপুরের নিকটস্থ হইয়াছেন ইহাই ঠিক করিতে হইবে। কিন্তু বিলাতী বাঙ্গালা কাব্যের সুর কোনটাই টেকসই ও স্থায়ী হইতেছে না। ইহা দৃষ্টিবান্ ব্যক্তি মাত্রেরই দ্রষ্টব্য। 'মঙ্গল কবিদের' উত্থিত খাঁটি বাঙ্গালীর খাঁটী বাঙ্গালা সুর মুকুন্দরাম হইতে আরম্ভ হইয়া মদনমোহন পর্য্যন্ত পুরাদমে পৌঁছিয়াছিল, এবং মাইকেলে ঠেকিয়া থামিয়াছিল। গণিয়া দেখুন এ গতি ও স্থিতি অল্পাধিক চারি শত বৎসর ব্যাপী। এটা কাহারও ঘরগড়া মতনয়, এটা সংঘটিত ঘটনা।

কিন্তু বিলাতী সুর মাইকেল দত্ত হইতে সুরু করিয়া হাত নাগাত এই মুহূর্ত্ত কাল পর্য্যন্ত, মাত্র ত্রিশ বৎসরের মধ্যে গড়পড়তা গণ্ডা পারাইয়া, সোয়া গণ্ডার কোটায় পড়িয়াছে। যদি বল এটা উন্নতি তবে কাযেই নাচার। কারণ উপস্থিতপ্রসঙ্গে একথা তুলিয়া তর্ক করিবার অবসর নাই। পরেও বৃথা বিতণ্ডায় প্রবেশ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে যদি সাহিত্য পথের কোনও প্রকৃত ও সবল শান্ত পথিক শীতল চিত্তে, কোন দিন একথা উত্থাপন করা আবশ্যক মনে করেন, আমরা এ বিচারে তাঁহার সহিত সরলান্তঃকরণে যোগ দিয়া পরস্পরের চিন্তার আদান প্রদান করিতে পারি, এবং তাহাতে আমরা ভুল বুঝিয়া থাকিলে তাহা সংশোধন করিবার অবসর পাই। এরূপ স্থলে প্রতিজ্ঞা যে, পূর্ব্বপক্ষের প্রদত্ত ও অনুকূল যুক্তির অনুমাত্রও অপলাপ করিব না। যে হেতু, বিলাতি সুরের জিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের হিত হইলে, আমরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্তোষ লাভ করিব।

সাবেক বাঙ্গালীর সাহিত্যাধিকারেও হাস্যরস প্রচুর ছিল; সঙ্গীতাধিকারে বরং বেশী বেশিই ছিল। কিন্তু

সর্ব্বত্রই প্রায় অপরাপর রসের সহিত একত্রে, অপরাপরের পরে, পশ্চাতে, মধ্যস্থলে বা বাহিরে বসবাস করিত। প্রায় কোথায়ও অপরের সঙ্গ-বিরহিত হইয়া, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে, হাস্য আপনার আস্য দেখাইতে অগ্রসর হইত না। বাঙ্গালীর বারইয়ারী তলায়ও না। তথায় সে আর যতই ঠেঁঠামি, নোংরামি ও নেংটামি দেখাক, এ পক্ষে আদপ কায়দাটী ছাড়িত না। হয় ত ল্যাংঠা হইয়া আসরে নামিত, অথবা আসরে নামিয়া নাচিতে নাচিতে উলঙ্গ হইত, কিন্তু অপরের পরে পশ্চাতে নামিত; একা সর্ব্বস্ব হইয়া ও নিজের নিরবচ্ছিন্নতা মাত্র লইয়া আসর লইত না। আমরা আমাদের হাল সাহিত্যেই কিছু কাল হইতে "প্রহসনে" ও পঞ্চানন্দেই নিরবচ্ছিন্ন হাস্যরস উৎপাদন আকাঙ্ক্ষী রচনা স্বতন্ত্র আধারে ও স্বাধীন আকারে দেখিতে পাইতেছি।

উপরে উল্লিখিত যে তিন খণ্ড নূতন ও চারিখণ্ড পুরাতন পুস্তিকা উপলক্ষ করিয়া, আমরা আজ এই প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি, তাহা পরস্পরে অল্পাধিক পরিমাণে, নিছক হাস্যরস জননার্থী রচনা হইয়াও, কিন্তু অপর প্রকৃতির এবং অপর আকারাবয়ব ও অপর পরিচ্ছদের কেবল ইংরাজী "পাঞ্চ"টী ভিন্ন ইহাদের কোনটীই প্রহসন বা পঞ্চানন্দ নহে। এই হিসাবেই আমরা ইত্যগ্রে বলিয়াছি,—প্রহসন, পঞ্চানন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী উদয় ও অস্তিত্ব সত্ত্বেও বলিতে সাহসী হইয়াছি যে, আমাদের উপস্থিত আলোচ্য বক্ষ্যমাণ প্রকৃতির ও পৃথক আকৃতির নিছক হাস্যরস রচনার প্রথম প্রবর্ত্তক ইন্দ্র নাথ বাবুর পরে বোধ হয়, মিষ্টার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

তবে ইহার মধ্যে আর একটু কথা আছে। এ ধরণের নিছক 'হাসির গান' ও নিরবচ্ছিন্ন হাস্য রসের কবিতা প্রথম প্রণয়ন করিয়া পৃথক ভাবে প্রকাশ করিলেও মিষ্টার দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, একমাত্র কেবল হাস্য রসের কবি নহেন, তিনি অপরাপর রসেরও কবি, এবং এ সময়ের শ্রেষ্ঠশ্রেণীর শক্তিমান কবি। অভিনব যুগের যতগুলি গুণবান্ ও গৌরবান্বিত কবি, এ মুহূর্ত্তে কাব্য রচনা করিতেছেন, তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা ইনি হীনপ্রভ নহেন, ইঁহার কবিত্বপ্রভা বরং অধিকতর উজ্জ্বল। ইঁহার গীতি কবিতা কোমল ও মধুর হইয়াও নেহাত কামিনীজনোচিত কিঙ্কিণি কঙ্কণ ঝঙ্কার নয়, বা অলস আধ-ঘুমন্ত অসুস্থ চিত্তের অপুষ্ট, অস্ফুট রুগ্ন ভগ্ন ভাব-বিক্ষুব্ধ ও অহেতুক বিষণ্ণতা-ভাব গদ গদ অবোধ্য বিলাস কাকলী নয়। তাঁহার সহযোগী অপরাপর কবির গীতি কবিতা নিচয়, সংখ্যার হিসাবে, যেমন অসুখমারভাবে অনবরত ঝাঁকে ঝাঁকে অজস্র নির্গত হইতেছে, তাঁহার তেমন নয়; মিঃ রায়ের গীতি কবিতা সংখ্যায় তত বেশী হইবে না, কাহন কাহন ত নয়ই, পণ পুরিয়াছে কিনা সন্দেহ বোধ হয়, কয়েক ডজন মাত্র হইবে; তা, সংখ্যা তাহার যতই কম হউক তাহা সহজ চিত্তের সবল উক্তি, বোধ্য ও শরীর যুক্ত, উহা কৃত্রিম শিল্প শোভা সমন্বিত। বিচিত্রবর্ণরাগ রঞ্জিত, নীরদ নীলিমা সংলগ্ন, বিমানে দোদুল্যমান দিব্য চন্দ্র-কিরণোজ্জ্বল বাষ্পময় মুক্তামতির মালা নয়। সর্ব্বোপরি এই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সম্প্রতি নাটক রচনায় অসাধারণ শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহা প্রকৃতই পুরুষোচিত প্রতিভার পরিচায়ক। এই অসামান্য স্বাভাবিক শক্তি, উচ্চতর শিক্ষার ও বিস্তৃত অধ্যয়নের সহিত সংযুক্ত; ইহা তাঁহার সবিশেষ সুবিধা ও সৌভাগ্য। হাস্য রসের রচনা তাঁহার কবিত্ব শক্তির অন্যতম বিকাশ মাত্র। তাঁহার গভীরতর ক্ষমতার তুলনায় এ অংশটা খুবই ক্ষুদ্র ও লঘু। তথাচ একমাত্র হাল্‌কা হাসি দৃশ্যতঃ যত তুচ্ছ, কার্য্যতঃ তত নহে। উহা উৎপন্ন হওয়া, বিশেষতঃ উহা উৎপাদন করিতে পারা সর্ব্বথা সৌভাগ্য সাপেক্ষ। রায় মহাশয় সময়ে সময়ে যে হাস্যরস রচনা করিয়াছিলেন, তাহারই কতকগুলি একত্রিত হইয়া এই 'হাসির গান' পুস্তিকা। এই হিসাবেই আমরা এ ক্ষেত্রে পৃথক্ ও একক ভাবে নিছক হাসির কথা বলিয়াছি।

আমাদের আলোচ্য অপর দুই নূতন কবিও কেবল হাসির কবি নহেন। ইঁহাদের উপস্থিত পুস্তকদ্বয় নিছক হাস্যরসের রচনায় পর্য্যবসিত বটে। কিন্তু ইঁহারা অপরাপর রসেরও কবি। শ্রীযুক্ত রসময় লাহার গাঢ় প্রকৃতির কবিতা আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার এই হাসির পুস্তিকার শেষাংশে, তাহার পরিচয়ার্থে কতকগুলি প্রশংসা পত্র ছাপিয়া দিয়াছেন। 'পণ্ডিত শাস্ত্রী' 'সুকবি এম্ এ, সি এস্' 'বিখ্যাত লেখক হীরেন্দ্র দত্ত এম্ এ,' "প্রতিষ্ঠাবান্ কবি রবীন্দ্র ঠাকুর' এবং ইংরেজী ও বাঙ্গালা পত্রের অর্দ্ধ ডজন সম্পাদক ইঁহার সমূহ কবি-শক্তির সার্টিফিকেট দিয়াছেন। তাহা অবহেলা করিবার সাধ্য নাই। অতএব তাঁহারা যে মনটি বলিয়াছেন, আমরাও ইহাকে [illegible]

পরন্তু শ্রীযুক্ত বেনোয়ারীলাল গোস্বামী নব্য তন্ত্রের কোনও কবি অপেক্ষা কিছুতেই কম নহেন, ইহা আমরা মাসিকপত্র সকলের পাঠক স্বরূপ সম্যক রূপেই জ্ঞাত আছি। ইনি বহুদিন যাবৎ ভিন্ন ভিন্ন পত্রে কবিতা লিখিয়া আসিতেছেন, অতএব ইনি অনেকেরই পরিচিত কবি। ইঁহার চিত্ত কবিজনোচিত,—রচনা সুন্দর ভাব ও ভাষায় সজ্জিত, মিষ্ট মোলায়েম, সরস।

মিঃ দ্বিজেন্দ্র রায়ের কথা এখনি বলিয়াছি। আরও একটা কথা বলা যাইতে পারে, যাহা ইঁহার নিজের ও ইঁহার স্বজাতি বাঙ্গালীর কিঞ্চিৎ গৌরবের কথা। মিঃ রায় ইংরেজী কবিতার রচনায় বিদেশীয় দুর্লভ অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। সে ক্ষমতা দেখিয়া উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজ কবি স্বয়ং স্যর এড্‌উইন আর্ণোল্ড বিস্মিত বিমুগ্ধ। এই বাঙ্গালীর লিখিত ইংরেজী কাব্য (Lyrics of Ind) পড়িয়া ঐ ইংরেজ কবি বিস্ময়সূচক প্রীতি প্রশংসা প্রকাশ করিয়া বলেন 'Astonishing undoubted poetical power বিস্ময়কর। সন্দেহবিরহিত সুনিশ্চিত কবিত্ব শক্তি।" পরন্তু, বিশিষ্ট বিলাতি পত্র 'ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিবিউ এবং 'স্কচম্যান' এই বাঙ্গালীর ঐ ইংরেজী কবিতা পুস্তকের প্রভূত ও প্রকৃত প্রশংসা করিয়াছেন। শেষোক্ত পত্রের সমালোচক, রায় মহাশয়ের রচনায় ইংরেজী ভাষার প্রয়োগ-দক্ষতার ও ইংরেজী-ছন্দ-ব্যবহার-নিপুণতার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, 'এই বাঙ্গালী ইংরেজী কবিতা প্রণয়নকল্পে জন্মকবি,—যথার্থ ই ইংরেজ কবি।"

প্রশংসা ইহার অধিক হইতে পারে না। এবং একটী অতি বিশিষ্ট ও পূর্ণমাত্রায় মার্জ্জিত এবং অসংখ্য অত্যুজ্জল প্রতিভাশালী ব্যক্তি কর্ত্তৃক ব্যবহৃত ও বর্ত্তমান সময়ের সভ্যতম ও শ্রেষ্ঠতম বিদেশীয় ভাষায় কবিতা লিখিয়া, এরূপ প্রশংসা উদ্দীপন করা জনৈক বিদেশীয়ের পক্ষে আদৌ দুর্লভ। প্রথমতঃ ইহা আদৌ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। বিদেশীয় ভাষায় এবং বিদেশীয় বিদ্যার অপরাপর বিভাগে শক্তিশালী ব্যক্তিগণ বহু শ্রম শিক্ষা অভ্যাস ও আয়াসে, কৃতিত্ব লাভ করিতে পারেন,—করিতেছেন বটে, কিন্তু বিদেশীয় কবিত্ব-কলা, কাব্যগত ভাব, ছন্দ ও সুর, সর্ব্বোপরি তাহার সহজাত স্বাভাবিকতা সম্যক্‌রূপে আয়ত্তাধীন করিয়া, সে ভাষায় কবিতা প্রণয়ন করা এবং তদ্বারা সে দেশের সাহিত্য সমাজের শীর্ষস্থানীয় কবি ও সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকগণের চিত্ত স্পর্শ করিয়া প্রীতি প্রশংসা আকর্ষণ করা বস্তুতই বিস্ময়কর। এ প্রকৃতির কৃতিত্ব কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। এ দেশীয়গণ ইদানীং ইউরোপীয় বিজ্ঞানে ও বহুবিধ বিদ্যায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া যশস্বী হইতেছেন; পক্ষান্তরে ইউরোপীয় আচার্য্যগণের মধ্যে অনেকেই এদেশীয় সাহিত্যে ও শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও দেশীয়দের গুরুস্থানীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। কিন্তু কই তাঁহাদের কেহ ত কখনও এ দেশীয় কোন ভাষায় কবিতা লিখিতে বা লিখিয়া যশস্বী হইতে পারেন নাই। পরন্তু, আমাদের বাঙ্গালীর মধ্যে যিনি যত বড় ইংরেজীনবিশ হউন বা থাকুন, কেহ কখনও ইংরেজী কবিতা প্রণয়নে প্রকৃত পক্ষে পারদর্শী হইতে পারেন নাই। ইংরেজী কবিতা রচনায় কৃতিত্বের কথা এক শুনা গিয়াছিল,—স্বল্পজীবী-কুমারী তরুদত্তের; আর শুনিতেছি এই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের। ইহা বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বলকর; তথাপি বাঙ্গালীর বহুমুখী শক্তিরও সুদুর্লভ।

একমাত্র নিছক হাস্যরসের কারবার বোধ হয়, কেবল "ভাঁড়" সম্প্রদায়ই করিত। সেটা ব্যবসায়ী "বফুন" ভিন্ন বস্তুতই সম্ভবে না। নহিলে হাস্যরসের রচয়িতা মাত্রেই সাহিত্যের, সঙ্গীতের ও কবিতার গুরু ও গভীর অংশেরও রচয়িতা ও অভিনেতা। কবি, কথক, লেখক, গায়ক সকলেই।

সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে বা পাইবে কি না জানি না, এবং মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত না হউক, 'কমিক' গান এ দেশে একটুও নূতন নয়। সমাজের সাময়িক রঙ ও মনুষ্য স্বভাবের দোষ দুর্ব্বলতা ও বিসদৃশ-ব্যবহার ও অনুষ্ঠান কৌতুকের বিষয়ীভূত করিয়া চিরকালই লেখক, বিশেষতঃ ভিন্ন ভিন্ন গায়ক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক তথা তাহার বাহিরে অবস্থিত অপরাপর আমোদ অভিনেতাদের কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে, ব্যঙ্গ বিদ্রুপাত্মক হাসির গান রচিত ও গীত হইয়া আসিতেছে। সমাজে যখন যে স্রোত বিশেষরূপে বহে ও বেগমান হয়, তখনি তাহার কৌতুকাবহ 'কমিক' গান উঠে,এবং যে পর্য্যন্ত আর একটা স্রোত ছুটিয়া আবার নূতন কৌতুককর 'কমিক' গীতির সৃষ্টি না করে, সে পর্য্যন্ত অল্লাধিক পরিমাণে গীত হইতে থাকে। সমাজের উচ্চ স্তর হইতে ক্রমে নিম্ন নিম্নতর

স্তরে যাইয়া উহা গড়াইয়া পড়ে ও গীত হয়। পরন্তু, এ প্রকৃতির যে দুই চারিটা গান, অধিক মাত্রায় লোক-প্রিয় হয় ও জনসাধারণের অধিকাংশ লোকের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে, তাহা টিকিয়াও যায়। আবার নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে তাহাদের নিজের নিজের রচিত রসানুরূপ হাসি তামাসার গান উঠিয়া বহুল পরিমাণে গীত হয়; তাহা আর তত উপর স্তরের দিকে যায় না। ইতর শ্রেণীর মধ্যে তাহাদের নিজস্ব হাসির গানের সংখ্যা কম নয়। "গাড়োয়ানী গান" নানা রকমেরই আছে।

মিঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হাস্যরসের যে গান রচিয়াছেন, তাহা অবশ্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রুচি রসানুরূপ "বৈঠকি গান" এবং সুরে ছন্দে ভাবে ভাষায় ও বিষয়ে ঠিক এই মুহূর্ত্তের উপযোগী, তজ্জন্য তাহা উক্ত সমাজের আদৃত, উপাদেয় ও উপভোগ্যও হইয়াছে। মিঃ রায় তাঁহার গানের মধ্যে নিজের মৌলিক ও অনুকৃত গুণপণার একমাত্রা অভিনবত্ব দিয়াছেন, যাহা এরূপ গানে পূর্ব্বে ছিল না; আর তজ্জন্যই আমরা তাঁহাকে উহার প্রবর্ত্তক বলিয়াছি; নহিলে যে সকল বিষয় সাধারণতঃ অবলম্বন করিয়া, তিনি তাঁহার গান রচিয়াছেন, সে সকল বিষয়ে অপরাপর রচয়িতার অন্য রকমের হাসির গান বিদ্যমান আছে। থিয়েটারে, যাত্রাদলে ও তাহার বাহিরেও আছে। ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বেও ছিল। পরন্তু মিঃ রায় তাঁর গানে যে একটু অভিনবত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাও যে খুব একটা বেশী কিছু ইহাও বলা যায় না। দাসুরায় পাঁচালী-গানে ও মধুকান 'ঢপ' গানে নিজের নিজের বিশেষত্বের যে একটা অভিনবত্ব মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিলেন ও যাহা চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে, মিঃ রায়ের অভিনবত্বটুকু তদনুরূপ হইলেও তাহা অপেক্ষা কম।

কিছুকাল মাত্র পূর্ব্বে এই কলিকাতা সহরের বাবু সম্প্রদায়ে "রূপচাঁদ পক্ষী"র ভারি নাম ডাক ছিল। রূপচাঁদ পক্ষী গান বাঁধনদার ও বৈঠকি গায়ক ছিলেন এবং তাহাতে বিলক্ষণ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। রায় মহাশয়ের এই সব হাসির গান এখন যেমন বৈঠকে বৈঠকে ও মজলিসে মজলিসে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন "পক্ষী"র গান বাবুলোকের বৈঠকখানায় ও বন্ধুবান্ধবের সম্মিলন সভায় এমনিই আদরের সহিত গীত হইত। "পক্ষীর দল" বলিয়া রূপচাঁদ পক্ষী প্রমুখ একটী দলও নাকি ছিল শুনিয়াছি। রূপচাঁদ হাসির গান অনেক রচিয়াছিলেন এবং তাহার পশার মিঃ রায়ের কমিক গানের অপেক্ষা তখন বরং বেশীই হইয়া উঠিয়াছিল। মিঃ রায় সমাজ সংক্রান্ত যে সব আধুনিক বিষয়ে গান বাঁধিয়াছেন, সে সব বিষয়েও রূপচাঁদ কত কমিক গান রচিয়াছিলেন। সে সব গানের এক আধটা এখনও এখানে ওখানে শুনা গিয়া থাকে। রূপচাঁদের সমসাময়িকই বোধ হয়, আর একজন বৈঠকি গানের বাঁধনদার ও গায়ক বর্দ্ধমান অঞ্চলে ছিলেন ও দেশ মধ্যে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম "প্যারীমোহন কবিরত্ন"। ইনি লেখাপড়ায় রূপচাঁদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন বোধ হয়, সংস্কৃতে কিঞ্চিৎ জ্ঞানও হয় ত তাঁহার ছিল। কবিরত্নের কবিতা ও গীত রচনা শক্তি সবিশেষ বিকাশ লাভ করিয়াছিল এবং রূপচাঁদ অপেক্ষা কম ছিল না; হয় ত কিছু বেশীই বা ছিল। এই শক্তিরই জন্য তিনি বর্দ্ধমান রাজদরবার হইতে "কবিরত্ন" উপাধি পাইয়াছিলেন। রূপচাঁদের ন্যায় প্যারীমোহনও অনেক কমিক গান রচিয়াছিলেন ও রাখিয়া গিয়াছেন। বড় ছোট, গম্ভীর ও তুচ্ছ উপস্থিত মত বা সাময়িক হুজুগ অনুসারে যখন যেটা সম্মুখে পড়িত, তখনি তাহার গান বাঁধিয়া গায়িতে লাগিতেন। এই উভয় ব্যক্তিরই বিনা-সবিশেষ চিন্তায় ও চেষ্টায় ও বিনা ক্লেশে, বলিতে বলিতে তখনি গান রচিবার ক্ষমতা ছিল ও রচনাও অতিশয় দ্রুত ছিল। ইঁহাদের হাসির গানের খুব আদর ও পশার হইলেও, কেবল মাত্র হাসির গানই বাঁধিতেন না ও গায়িতেন না। গুরু গম্ভীর বিষয়েও ইঁহাদের বিস্তর গান আছে। ঈশ্বরতত্ত্ব সৃষ্টি রহস্য, সংসার-বৈরাগ্য ও অদ্বৈতবাদাদি হইতে আলু, পটল, কইমাছ, কলাই দাল, ও বিলাতি চাল চলন, বাবুআনা, সাহেবীআনা ও স্বাধীন জেনানা কিছুই ইঁহাদের গানে বাদ পড়ে নাই। কিন্তু ইঁহাদের যে কয়টা গান আজও বাঁচিয়া আছে, অর্থাৎ লোকের মুখে সময়ে সময়ে গীত হইতে শুনা যায়, তাহাদের মধ্যে গভীর বিষয়ের গানই বেশী; এবং হাল্‌কা হাসির গান খুব কম। এবং সে "কম" ও বোধ হয়, আর কিছুকাল মধ্যে একেবারেই কিছু থাকিবে না।

প্যারীমোহনের "কোথায় সে জন, জানে কোন্ জন? যে জন স্বজন লয় করে।" এই দীর্ঘাকার গানটী ও রূপচাঁদের "চিরদিন কখন সমান না যায়" এই গানটী, ইঁহাদের

গুণাগুণ যাহাই হউক, খুব লোক প্রিয় হইয়াছিল ও আজও ঐ দুই গান অনেকে গাহিয়া থাকে। কথিত আছে, একদা রূপচাঁদ পক্ষী ফরাশডাঙ্গায় এক মজলিশে তাঁহার "চিরদিন কখন সমান না যায়" গানটী গাহিতেছিলেন। গান সমাপ্তির পর সমবেত বাবুদের মধ্যে কয়েকটী হিন্দুস্থানী বাবু ঐ গানের অর্থ বা স্থূল তাৎপর্য্য জানিতে উৎসুক হওয়াতে, পক্ষী গায়ক তৎক্ষণাৎ উৎকৃষ্ট হিন্দিতে ঐগানের তাৎপর্য্যবোধক ও অর্থ ও বাক্যানুরূপ এক গান উপযুক্ত সুর সংযোগে যুগপৎ বাঁধিয়া ও গাহিয়া বাবুদিগকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করিলেন। গানটীর রচনা ও গাওনা বাজনা অনায়াসে একত্রেই হইল। সে গানটীর কয়েক চরণ এই ;—

এসা দেখো ফিন্ রহেগা নেই।
যব যেসা, তব তেসা, ছোড় দিল্‌কা আশা,
দুনিয়া কে তামাসা দেখো ভাই।

* * *

দুনিয়াকি খেলা কভি বুরা ভালা,
কোভি ঘটা ঘোর কভি হোয উজালা,
কভি হীরামতি কভি মিলে লালা,
কভি ঘাটতি হ্যায় বাড়তি নেই।
ছোড় নিরানন্দ করোজী আনন্দ,
ধ্যানসে ধরোজী সদা সদানন্দ
চন্দ বোঝকে বাস্তে দুনিয়াকে, এ ফন্দ দ্বন্দ্ব ধন্দ
না রই।
কহে পক্ষী রূপ নহোজী বিরূপ
ধ্যানমে ধরোজী প্রভুজীকি রূপ
অপরূপ রূপ ও রূপ স্বরূপ, এরূপ জগমে নেই।

কিন্তু রূপচাঁদের ও প্যারীমোহনের খুব লোক-প্রিয় 'কমিক' গানও, যাহা কতককাল খুব দাপটে চাপটে যথা তথা গীত হইয়াছিল, তাহাও এখন আর বড় শুনা যায় না। ফল কথা, সাধারণতঃ যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে হাসির কবিতা বা হাসির গান শীঘ্রই 'বাসি' হইয়া পড়ে। টাটকাতেই উহার তেজ। বাসি কৌতুক প্রায় বাসি কুসুমেরই মত ম্লান ও মলিন হইয়া আপনার আকর্ষণ হারায় ও বিস্মৃতির সলিলে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহাদের কেহ কেহ একেবারে বিলুপ্ত না হইলেও, অবহেলার অন্ধকার কোণে একটু স্থান অধিকার করিয়া পড়িয়া থাকে ও কখনও কালে ভদ্রে এক আধবার ব্যবহারে আসিয়া আপ্যায়িত হয়।

হাস্য-গীতি অপেক্ষা ক্রন্দন গীতি বরং বেশী দিন বাঁচিয়া থাকে; তাহাদের অনেকে চিরজীবীও হয়। ইংরেজী সাহিত্যের সুবিখ্যাত হাস্যের কবি "টম হুড" ইহার এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। হুডের ছায়া, আমাদের এই মুহূর্ত্তের ইঙ্গবঙ্গ কাব্য সাহিত্যের কমিক কৌতুকে ও হাস্যরস রচনায় রচয়িতাগণের জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে, ইদানীং নিপতিত হইয়া, তাহাতে অনুকৃতির এক আধমাত্রা অপূর্ব্বত্ব, অভিনবত্ব বা উজ্জ্বলত্ব প্রদান করিতেছে।—রসেটী বলেন—শেলী ও টেনিসনের মধ্যস্থিত অর্থাৎ ঐ দুই কবির কবিত্ব বিকাশের মধ্যবর্ত্তী কালে আবির্ভূত ইংরেজ কবিগণের মধ্যে টম হুড সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও মধুর; পরন্তু, লয়েল ও এলাইজা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণ হুডের কবিত্ব স্মৃতির সম্মানার্থে, কবিপদন্ত কবিজনোচিত উপহার,—উৎকৃষ্ট কবিতা গুচ্ছের কুসুম হার গাঁথিয়া স্বজাতীয় সাহিত্যের গলে দোলাইয়া দিয়াছেন। তথাচ হুডের কবিতা সম্বন্ধে, ইংরেজী সাহিত্যের ইংরেজ সমালোচকই বলিতেছেন ;—

—'But it is doubtful whether the 'humourous fancies grafted on meloncholy impressions' which form the staple of his verse, have in them the staff of immortality.

হুড হাস্য রসের কবি বলিয়াই সাধারণ লোকে জানে। পরন্তু, হুডের রস রসিকতা বিষণ্ণতার মুদ্রাঙ্ক উপরে বিন্যস্তও বটে, তথাচ ঐ সমালোচক বলিতেছেন—হুডের হাস্য রস রচনায় অমরত্বের উপাদান আছে কিনা সন্দেহ। তা হউক। তবুও হুড এখনও খুব সজীব। কিন্তু, হাস্যের জন্য এই হাসির কবি হুড তত সজীব নহেন—যত সজীব তাঁহার ক্রন্দন কবিতার জন্য। হুডের হাসির ছোট ছোট কবিতা সেওয়ায় হাস্য রসের দুইটী দীর্ঘ রচনা আছে। একটীর নাম "রসন্ত-বিদ্যাবরী" এবং অপরটী "কুমারী কিলমানসেগ্ এবং তাঁহার পদপল্লবমুদারম্"। এ উভয়ই উত্তম। হাস্য রসাত্মক এ দুই দীর্ঘ কবিতা এবং কৌতুকপ্রদ আর কয়েকটী ক্ষুদ্র খণ্ড কবিতা আজও বেশ সজীব থাকিলেও ইহারা কদাচিৎ কবিকে জীবিত রাখিতে পারিত। ইহারা সকলেই ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে হুডের প্রতি লোকের প্রীতি

প্রসন্নতার পরোক্ষ উপাদান হইলেও, ইহারা কেহই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ মুহূর্ত্তে, তাঁহাকে মলিনতা ও মৃতকল্পতা হইতে হয় ত রক্ষা করিতে পারিত না। টম হুড যে এখনও ইংরেজ জাতির মধ্যে সবিশেষ জীবিত ও জাগ্রত রহিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ চিরকালই থাকিবেন, তাঁহার হাস্য রসের কবিতা আদৌ তাহার কারণ নয়, তাহার কারণ তৎকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটী ক্রন্দনের কবিতা। হুডের সার্ট সঙ্গীত Song of the Shirt এবং "নিশ্বাস সেতু" the Bridge of Sighs করুন রসোদ্দীপক এই দুই সুপ্রসিদ্ধ কবিতা, ইংরেজ জাতির হৃদয়ে, রক্তে মাংসে মিশ্রিত হইয়া হুডকে নিরতিশয় লোকপ্রিয় ও চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। এই দুই কবিতাই অতি করুণ, কোমল ও মর্ম্মস্পর্শী। ইহাদের ক্রন্দন-শীলতার স্বাস্থ্যকর সমীরে, হুডের হাস্যরস যেন সংশোধিত হইয়া, লোকের অধিকতর প্রীতিকর হইয়াছে। সাধারণতঃ এইরূপ দেখা যায় যে, কবির একটী অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যের কৃতিত্ব তাঁহার আর পাঁচটী অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট রচনার প্রতি লোকের নয়নাকর্ষণ করে।

রেবারেণ্ড আর্, এইচ্ বারহাম, ইংরেজী সাহিত্যের আর একটী হাস্য রস রচয়িতা কবি,বিখ্যাত ও যশস্বীও বটে। এই রেবারেণ্ড পাদরী রসিক "Thomas Ingoldsley Esq বিকল্পিত নামে "বেনামা" হইয়া, তাঁহার হাস্যরস লহরী প্রবাহিত করিয়াছিলেন। নব প্রকাশিত ইঁহার হাসির কবিতা কিছু কিছু পাঠ করিয়া,—এবং অধিকতর আদৃত টম হুডের কবিতার সহিত সংপ্রতি উহা একত্রে পাঠ করিয়া, আমাদের বিদেশীয় চিত্তে যেরূপ ধারণা হইল, তাহাতে হাস্য রসোদ্দীপনে এই পাদরী সাহেব, সুপ্রসিদ্ধ হুড অপেক্ষা একটুও কমও ছিলেন না, উহার কোনও কোনও অংশে বরং বেশীই ছিলেন বলিয়া বোধ হইল। ডাক্তার গার্নেটেরও দেখিতেছি এইরূপ অভিমত। প্রগাঢ় সাহিত্য তত্ত্বদর্শী ও এ সময়ের প্রবীণ সমালোচক ঐ ডাক্তার সাহেবের বিবেচনায়, হাসির কবিতা রচনায়, সমগ্র ইংরেজী সাহিত্যে একমাত্র হুড ভিন্ন, আর কেহই, পাদরী বারহামের মত নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই। পরন্তু, হাস্য রসের আখ্যান কবিতার রচনায়, অধিকতর ক্ষমতা ও ওস্তাদী হাত দেখাইয়া বারহাম, হুডকে খুব বেশী "রকমই হারাইয়া দিয়াছেন।" ডাক্তার গার্ণেটের মত বিশিষ্ট ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণই অবশ্য এরূপ বিষয়ে এমন নির্দ্দিষ্ট ও স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করিতে সমর্থ। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের নিগূঢ় স্বরূপ-গত সূক্ষ্ম চাতুর্য্যে অনভিজ্ঞ ও অনভ্যস্ত এবং তাহাদের সুবিচারে অক্ষম হইয়াও, বিদেশীর বিদেশীয় কর্ণেও যেরূপ শুনায় ও যৎসামান্য জ্ঞানে যেমন অনুভব হয়, তাহাতেও আমরা দেখিতেছি যে, বারহামের কবিতাবলীর ছন্দ, যতি, মিলন ও সুর সলিলস্রোতবৎ সর্ব্বত্রই এমন সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দ ও মিষ্ট মোলায়েম ভাবে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে যে, তাহা হাস্য রসেরই স্বাভাবিক ও সম্যক উপযোগী এবং অল্পাধিক 'কটমট' ইংরেজী ভাষায় নেহাত সাধারণ নয়। যথা স্থানে, আবশ্যকানুসারে আমরা ইহার দুই চারি চরণ উদ্ধৃত করিলেও করিতে পারি। কিন্তু ইংরেজী কবিতা উদ্ধৃত করিবার অবসর ও উপযোগিতা আমাদের খুব কমই আছে; নহিলে হাস্য রসের যতগুলি রচনা সংপ্রতি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে, বারহামের এই বই হইতেই বেশী মাত্রায় উদ্ধৃত করিবার অবকাশ বিদ্যমান বটে।

কিন্তু, এস্থলেও সেই কথা, হাসির কবিতা বা হাস্যরস বাসি হইলেই 'বিগড়ে' যায়। ইংরেজী মতও তাই। ইংরেজ এ রসকে 'স্যামপান' মদিরার সঙ্গে তুলিত করিয়া বলেন Humourous poetry like champagne, gets flat soon after it has been drawn তবুও ইংরেজী অনুকৃত আমাদের আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে, বিদেশীয় বিপণির অন্যান্য বস্তুর ন্যায়, বিলাতি 'বাসি' হাস্য রসের অল্পাধিক বিকৃত বাষ্প রাশি, জোর বাতাসে আসিয়া যে পৌঁছিতেছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, গোপন করিয়াও লাভ নাই। উপস্থিত আলোচনা প্রসঙ্গে, অগত্যাই এই বায়বিয় ক্রিয়াটিরও গতি-ক্রম কিয়ৎপরিমাণে অধ্যয়ন ও প্রদর্শন করা আবশ্যক হইবে, এ কারণেও ইংরেজী সাহিত্যের ঐ অঙ্গ বিশেষকে প্রবন্ধের অন্তর্গত করিতে হইয়াছে।

টমহুডের হাস্যের ন্যায়, রেবারেণ্ড বারহামের অনেকানেক হাস্য, এখন ঔদাস্যের বিষয়ীভূত হইয়া আস্য ঢাকিয়াছে। বারহাম নিজে খৃষ্ট ধর্ম্ম যাজক পাদরী পুরোহিত হইয়াও, ঐ ধর্ম্মের কোনও কোন শাখা প্রশাখা সম্প্রদায়ের উপর বিদ্রূপের এমন সাংঘাতিক শক্তিশেল

হানিয়াছিলেন যে, হাস্য লহরীর অজস্র রসোচ্ছ্বাসেও তাহার মর্ম্মান্তিক বেদনার লাঘব হয় নাই; বেদনা তাহাতে বরং আরও বেশী বাড়াইয়াই দিয়াছে। বহু লোকের এই বেদনা ও অন্তর্যাতনা হেতু এবং কৌতুক কবিতার বিষয়ীভূত তাহাদের সমসাময়িক প্রসঙ্গাদির অন্তর্ধান ও অল্পাধিক অবোধ্যতা হেতুও বারহামের বহু কবিতা এখন বিলুপ্ত বা বিস্মৃত হইয়াছে। তথাচ তাঁহার Jackdaw of Rheims নামক বিষম বিদ্রুপাত্মক কৌতুক কবিতা, সাহেব বিবিদের মধ্যে অনেকেরই নাকি আজও কণ্ঠস্থ, এবং খুবই আগ্রহ আহ্লাদ সহকারে তাঁহারা ইহার আবৃত্তি করিয়া থাকেন। এই কবিতায়, এক দাঁড়কাককে ক্যাথলিক কার্ডিনালের আসনে বসাইয়া, সুতীক্ষ্ণ শ্লেষে, কার্ডিনাল ও তদীয় সম্প্রদায়ের বিলক্ষণ দুর্গতি করা হইয়াছে। প্রথমতঃ দাঁড়কাকের দৌরাত্ম্য, কার্ডিনালের ক্রোধ, উভয়ের বিষম বিরোধ, কার্ডিনাল কর্ত্তৃক কাকের অষ্ট পৃষ্ঠে অভিসম্পাৎ, ক্রমে কাকের নীরব "কনেফেসন" বা পাপাঙ্গীকার, কাকে কার্ডিনালে মহামিলন, উপসংহারে দাঁড় কাকের দেবত্ব-প্রাপ্তি বা "সেণ্ট" হইয়া স্বর্গে গমন। এক কথায় রোমান্ কাথলিক ধর্ম্মানুষ্ঠান সকলকে শ্লেষও ব্যঙ্গ করিয়া এই কৌতুকোদ্দীপক কবিতা। বারহামের প্রায় সব কবিতাতেই এই সম্প্রদায়ের উপর শ্লেষ ও ধর্ম্ম যাজকগণের বিলাস ব্যভিচারাদির ব্যঙ্গ বিদ্রুপ দেখা যাইতেছে ও তাহাতে সবিশেষ শক্তিবত্তার পরিচয় আছে।

আলোক-বার্ত্তা
বা
তারবিহীন টেলিফোন্।

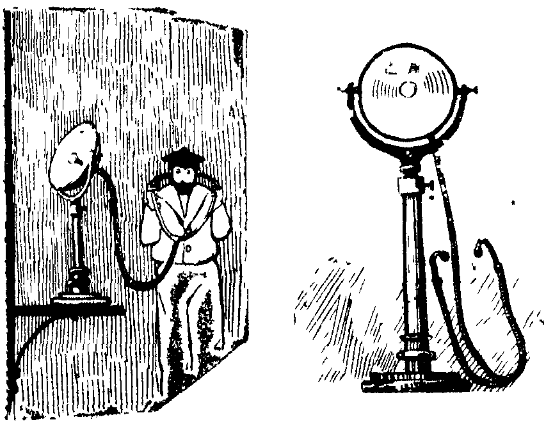
তারবিহীন তাড়িত-বার্ত্তার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি যে বার্ত্তা প্রেরণের অভিনব উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সংবাদ এখনও আমাদের দেশের অনেকের অগোচর রহিয়াছে। মার্কনি বা আচার্য্য বসুর উদ্ভাবিত তারবিহীন তাড়িত-বার্ত্তায় যেরূপ বৈদ্যুতিক কম্পন তারের সাহায্য ব্যতিরেকেই দূর দূরান্তে প্রেরিত হইতে পারে, তেমনি এই নবাবিষ্কৃত আলোকবার্ত্তা বিনাতারে কেবল মাত্র এক আলোকরেখার মধ্য দিয়া বার্ত্তা প্রেরণে সক্ষম হইয়াছে। অধিকন্তু আলোক-বার্ত্তা তাড়িতবার্ত্তা অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠত্ব পাইতে অধিকারী।

এই অদ্ভুত আবিষ্কার দ্বারা সাধারণ টেলিফোন যন্ত্রের ন্যায় কার্য্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ দুই ব্যক্তি বহু দূরে অবস্থিত হইয়াও পরস্পরের কণ্ঠস্বরে বিনা তার সাহায্যে কথাবার্ত্তা কহিতে সক্ষম হইবে। সকলেই জানেন, তাড়িত-বার্ত্তা বা টেলিগ্রাফে নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন বা সঙ্কেত দ্বারা বাক্য রচনা করিতে হয়, তাহা সকলের আয়ত্ত নহে; কিন্তু আলোক-বার্ত্তা দ্বারা কথিত বাক্য সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্যরূপে প্রেরণ করা যাইতে পারে এবং সঙ্কেতেও প্রেরণ করা কষ্টকর নহে, অতএব ইহা একরূপ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। অধিকন্তু,তারহীন তাড়িত-বার্ত্তা নভোমণ্ডলের অনুকুল অবস্থার উপর নিতান্ত নির্ভরশীল এবং ইহার প্রেরণ অনেক সময় দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ হইয়া পড়ে; কিন্তু আলোকবার্ত্তায় ইচ্ছা মাত্রই সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে, এবং প্রেরণ-স্থানে কথা কহিবা মাত্র গ্রহণ-স্থানে শ্রুত হইয়া থাকে, বায়ুমণ্ডলের কোন অবস্থার উপরই নির্ভর করে না।

উনবিংশ শতাব্দী বৈজ্ঞানিক-যুগ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, একের পশ্চাতে অন্য, অন্যের পশ্চাতে আর আবিষ্কার জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিতেছে। কিন্তু এই সকল আবিষ্কার এত জটিল যে, অনেক সময় সর্ব্ব-গ্রাহ্য হয় না; এই জটিল আবিষ্কারের দিনে আলোকবার্ত্তা একটি অতি সরল ও সহজ-বোধ্য আবিষ্কার। এই যন্ত্রের নাম Radiophone বা রশ্মি-বার্ত্তা; নাম দ্বারাই বোঝা যাইতেছে যে, একটি



আলোক রশ্মির মধ্য দিয়া বার্ত্তা প্রেরণের উপায় বিশেষ। আমরা যে চিত্র দিয়াছি, তাহাতে প্রেরণস্থান একটি বাতিঘর (Light house) এবং গ্রহণস্থান একটি জাহাজ কল্পনা করিয়া লইয়াছি। বাতিঘরে একটি শব্দ পরীক্ষিত (Sound-Proof) টেলিফোন বাক্স (ক) আছে, বাক্সের টেবিলের উপর একটি শব্দ প্রেরকের স্থানে চারিটি শব্দপ্রেরক খ (Transmitters) আছে, এবং তাহা হইতে চারি জোড়া তার গ গ গ গ, একটি নিয়ামক যন্ত্রের (Resistance box and regulator) মধ্য দিয়া বাতিঘরের 'সন্ধানালোকের' (Search-light, যাহা দ্বারা দূর সমুদ্রে জাহাজ প্রভৃতির স্থিতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, সেই আলোকের) পশ্চাৎভাগে আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছে। প্রেরণ-স্থানে যন্ত্রের আবশ্যক এই পর্য্যন্ত।



এক্ষণে দেখা যাউক, গ্রহণ-স্থানে কি কি আবশ্যক। গ্রাহক টেলিফোন বাক্সর স্থানে কেবল মাত্র একটি গোলাকার কটাহ মধ্য (concave) দর্পণ (mirror) তাহার মধ্য স্থলে তাপমান যন্ত্রের (Thermometer) নিম্ন গোলকের (bulb) মত একটি কাচগোলক অঙ্গার চূর্ণ (carbonised filament) পূর্ণ হইয়া সংলগ্ন রহিয়াছে এবং তাহার অপরাংশ পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত যাইয়া একটা শ্রবণ নলের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। শ্রবণ নলের আকার অবিকল phonograph যন্ত্রের নলের ন্যায়।

মনে করা যাক, দুই মাইল দূরবর্ত্তী একখানি জাহাজের কাপ্তেনকে সংবাদ দিতে হইবে। বাতিঘরের সন্ধানালোক (Search light) ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জাহাজের উপর ফেলা হইল, কাপ্তেন বুঝিলেন তাঁহাকে কিছু বলা হইবে, তিনি নল কাণে দিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আলোক আসিয়া দর্পণের উপর পড়িল, বাতিঘর রক্ষক উচ্চকণ্ঠে যাহা বলিতে লাগিলেন, কাপ্তেন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে লাগিলেন; জাহাজের গতি বা আন্দোলনে কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। এক্ষণে আলোক বহুদূরে প্রেরণের পারকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতে পারে, কিন্তু সকলেই জানেন যুদ্ধক্ষেত্রে Helcographic principle দ্বারা আলোক সঙ্কেত বহু দূর-ব্যাপী হইয়া থাকে, অতএব সে বিষয়ে বিশেষ কোন চিন্তার কারণ নাই।

এই সত্যের আবিষ্কর্ত্তা শ্রীযুক্ত Hammond V. Hays of Boston Mass. স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, এস্থলে তাহাই অনুবাদ করিয়া দিলাম।

আলোকবার্ত্তার (radiophone) প্রধান তত্ত্ব এই যে, আলোক রশ্মিদ্বারা গ্রাহক যন্ত্রে (Receiving mirror) নানা প্রকার তাপ কম্পন (varied heat-waves) প্রেরণ করা যাইতে পারে। কাচগোলকে (bulb) আলোক-রশ্মি পাত হইলে অঙ্গার চূর্ণ সকল আলোকের তাপ আত্মসাৎ করে, এবং তদ্দ্বারা তন্মধ্যস্থ বায়ু প্রসারণ সংঘটিত হয়। প্রেরক যন্ত্রে উচ্চকণ্ঠে কথা বলিলে আলোকের গতিতে প্রত্যেক শব্দ বিভিন্ন প্রকার চেষ্টা উৎপাদন করিয়া তাপের তারতম্য করিয়া দেয়; তদ্ধেতু গোলকের অন্তঃস্থ বায়ুর প্রসারণও ইতস্ততঃ হইয়া যায়, এজন্য প্রত্যেক শব্দ যথাযথ-রূপে কর্ণে প্রবেশ করে।

তারহীন তাড়িত বার্ত্তা যখন প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তখন তাহার সংবাদ ইচ্ছামত স্থানে প্রেরণ করা যাইত না, যে যে স্থানে গ্রাহক কল (receiver) থাকিত, সকলেই সে সংবাদ জানিতে পারিত; কোন গুপ্তকথা প্রেরণের উপায় ছিল না। এক্ষণে এ দোষের সংশোধন হইয়াছে। আলোকবার্ত্তায় কিন্তু পূর্ব্বাপর হইতেই যথেচ্ছা সংবাদ প্রেরণ কষ্টকর নহে। আলোক-বার্ত্তার আর একটি সুবিধা ব্যয়-সংক্ষেপে; টেলিগ্রাফের ব্যয়ের সহিত ইহার ব্যয় তুলিত হইলে নগণ্য বলিয়া মনে হইবে। যুদ্ধক্ষেত্রে টেলিগ্রাফির তার কাটার যে হাঙ্গামা, আলোকবার্ত্তা ও তারহীন টেলিগ্রাফি তাহার অনেক নিরাকরণ করিবে সন্দেহ নাই।

একদিকে যেমন আলোকবার্ত্তা, টেলিগ্রাফ বা টেলিফোন

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব পাইবার অধিকারী, অপর পক্ষে তেমনি ইহাপেক্ষা উহাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হইবে। আলোক-বার্ত্তা খোলা স্থানে—যথা যুদ্ধক্ষেত্র, সমুদ্র-বক্ষ ইত্যাদি—কার্য্যকর হইতে পারে, কিন্তু সৌধমালাসমাকুল নগর প্রভৃতিতে অসংখ্য প্রাচীর প্রভৃতি বাধা ভেদ করিয়া আলোক প্রেরণ কোন প্রকারেই সম্ভব নহে, যুদ্ধক্ষেত্রে বেলুনে চড়িয়া হেলিওগ্রাফ করা হয়, তাহাও দৈনিক জীবনের উপযোগী নহে। প্রকৃত পক্ষে আলোকবার্ত্তা বিশাল সমুদ্র-বক্ষে নাবিকদিগের দেবাশীর্ব্বাদ, অন্যের ইহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি খুব কম। আবিষ্কর্ত্তা আশা করেন যে, কালে এই যন্ত্র প্রত্যেক বাতিঘরে ও বন্দরে বিরাজ করিবে—এবং এই যন্ত্রের উপকারিতা, সরলতা, ও মিতব্যয়িতাই তাহার কারণ সন্দেহ নাই। ইহা দিন রাত্রি সমভাবেই কার্য্য করিতে সমর্থ, আলোক সংশ্লিষ্ট দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, রাত্রি ভিন্ন ইহার কার্য্যকরী ক্ষমতা নাই। ইহার কার্য্য, বায়বিক-তাপ-কম্পনের উপর নির্ভর করে, আলোক দিবালোকে দৃষ্ট হউক বা নাই হউক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

অনেকে ইহাও প্রশ্ন করিতে পারেন যে, সূর্য্যতাপেই ত কাচগোলক বিস্তৃত হইয়া অন্তঃস্থ বায়ুতে কম্পন উৎপাদন করিয়াছে, অতএব আলোকরশ্মি তাহাতে আর কম্পন তুলিতে পারিবে না; কিন্তু এ ধারণা ভুল। সূর্য্যালোকের সহিত প্রেরিত আলোক রশ্মি মিশ্রিত হইয়া নূতনতর কম্পন উৎপাদন করিবে। কোয়াসা, কুজ্ঝটিকাও ইহার পক্ষে বিশেষ বাধা নহে; আলোকের তাপ ভেদ করিতে সমর্থ হইলেই কার্য্য চলিবে।

এক্ষণে আবিষ্কর্ত্তার একটু পরিচয় দিয়া বিদায় গ্রহণ করিব। পূর্ব্বেই তাঁহার নাম ও বাসস্থানের উল্লেখ করিয়াছি; তিনি একজন যুবক ইঞ্জিনিয়র, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের বোষ্টন সহরে Bell Telephone companyর অধীনে কার্য্য করেন। তিনি অতিশয় সদালাপী ও বিনয়ী; তিনি বহুদিন এই সত্য আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াও অতি অল্পদিন হইল এই যন্ত্র নিউইয়র্ক নগরের Madison square gardenএর বৈদ্যুতিক প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি দুই মাইল দূরবর্ত্তী স্থানের সহিত কথোপকথন [illegible] বলিয়াছেন যে ইহা এত সামান্য যে একণে ইহার প্রকাশে জন সাধারণের কোন উপকার নাই। এবং তিনি বলিতে চাহেন যে, অন্যে চেষ্টা করিলেই ইহা আবিষ্কার করিতে পারিতেন; তাঁহার হঠাৎ মনে লাগিয়াছিল, ইহাতে বিশেষ বাহাদুরী কি আছে? এ theroy ত বহু দিন হইতে অনেকেরই জ্ঞাত আছে। এত পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি নিরস্ত, তিনি যে তারহীন টেলিফোন বা আলোক-বার্ত্তার প্রথম আবিষ্কর্ত্তা, তাহা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হয় না। তিনি অন্যের সত্য ধার লইয়া প্রবর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া তিনি প্রবর্ত্তক (adapter) মাত্র। এরূপ সৎ-গুণাধার না হইলে কি ঈশ্বর তাঁহার চিত্তে এই অপূর্ব্ব সত্য জ্ঞান প্রকটিত করিতেন?

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মাধুরী।

দৃশ্যকাব্য।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

দুর্গাধিপ—(সিন্ধুদেশস্থ গোবিন্দগড়ের অধীশ্বর)
কাশী—ঐ বিশ্বস্ত প্রাচীন অনুচর।
ভবানী—ঐ নগরপাল।
বীরেন্দ্র—ঐ ভাবী জামাতা।
কুমার—ঐ পুত্র
দয়ানন্দ—সন্ন্যাসী
রাঘব—দস্যুপতি
অনন্ত, হারিৎ, অন্যান্য দস্যু-অনুচর ও প্রহরীগণ প্রভৃতি।

স্ত্রীলোক।

কৌশল্যা—দুর্গাধিপের স্ত্রী
মাধুরী—ঐ কন্যা

মাধুরী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দুর্গাধিপের গৃহ।

(কৌশল্যার প্রতিমূর্ত্তির সমক্ষে জানু পাতিয়া দুর্গাধিপ)

দু। অনিত্য সংসারে দিয়ে আত্ম বিসর্জ্জন,
হে আনন্দময়ি তুমি করেছ গমন,

সুখে নিত্যানন্দ ধামে। দেবীরূপে তথা
বিরাজিছ আলো করি বিদ্যাধরী সনে
নিত্য দিব্য সিংহাসনে। আর আমি হেথা,
হতাশ, বিষাদ ভরা অধীর হৃদয়ে,
তোমার অনিত্য স্মৃতি এই প্রতিমার—
সম্মুখে রয়েছি বসি কৃপা ভিক্ষা তরে।
হে মহিমাময়ি, তব পুণ্য মহিমায়;
মুক্ত করি দিয়ো প্রিয়ে দুষ্কৃতি আমার।
ধর্ম্মের আসনে বসি দয়াময় যবে
করিবেন বিচার আমার ভবলীলা
অবসানে—মোর পক্ষ করো সমর্থন
করেছি তোমার প্রতি যত অত্যাচার
ততোধিক প্রীতি পূর্ণ হৃদয়ে বলিয়ো
মার্জ্জনা করিতে মোরে। ঘোর অপরাধী
আমি—ক্ষমার অতীত। তবু তুচ্ছ শাস্তি
ঘটে যেন তব পুণ্যবলে। (উঠিয়া)
—হৃদয়ের
ভার, হইল লাঘব কিছু দুষ্কার্য্যের
অনুতাপ আসিলে অন্তরে অশ্রুজলে
মনের মালিন্য ধুয়ে শান্তি আসে চিতে!
স্বেদজলে ধুয়ে গিয়ে দেহগ্লানি যথা
নিদাঘ সায়াহ্নে করে প্রফুল্ল শরীর।

(কাশীর প্রবেশ)

হেথা কেন?

কা। বাহিরে নগরপাল আছে
দাঁড়াইয়া আপনার লভিতে দর্শন।

দু। বল তারে আসিতে হেথায়। (কাশীর প্রস্থান)
অর্ব্বাচীন
বৃদ্ধ—তার কিবা প্রয়োজন মোর সনে?

(ভবানীর প্রবেশ)

দু। খুব সংক্ষেপে তোমার কথা বল।

ভ। তাই বল্‌চি প্রভু। আপনার আজ্ঞামত সংক্ষেপেই বল্‌চি।

দু। বল।

ভ। প্রভু, হয়ত শুনেছেন যে, ঐ পশ্চিমের জলার পাশে—

দু। যে অদ্ভুত স্ত্রীলোক থাকে তার কথা বল্‌ছ?

ভ। আজ্ঞে হাঁ। গাঁয়ের সবাই বলে সে মাগী ডাইনি, ভুত পেরেতের সঙ্গে কথা কয়। এই দেখুন না, সব ধান গেল—গরু বাছুরগুলো,সব মরচে, এই যে বিষ্টি হচ্ছিল না—সকলে তার দোষ দিচ্ছিল। আবার এই যে ভয়ানক বিষ্টিতে দেশটা একেবারে ভেসে গেল, এ সব তার কায। কেননা বিষ্টি হবার দু'দিন আগে থাক্‌তে সে বলেছিল যে, এবার খুব বৃষ্টি হোক্। সে মানুষের সঙ্গে বড় মেশেনা। অবারে অক্ষণে, তেমাথা রাস্তায়, তেকোনা বাড়ীতে, শিয়ালের শিং, হাঁড়গিলের ঠোঁট, গিরগিটির পিত্তি, আরো যে কত কি সিদ্ধ করে ভাঙ্গা কুলো, মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে ফেরে, আর মন্তর-তন্তর নিয়েত আছেই, এই যে সব লোক মর্‌চে সকলেই বলে যে এই ডাইনি বেটীর জন্যে—

দু। তা আমি কি কর্‌ব?

ভ। হুজুরের কাছে প্রার্থনা এই যে, তাকে এই দুর্গে এনে পরীক্ষা করুন। যদি সে সত্যি সত্যি ডাইনি হয়, তবে তাকে জলে ডুবিয়ে হোক, আগুণে পুড়িয়ে হোক, মেরে ফেলুন—আমাদের এ বিধি ত আছে।

দু। ভাল ভাল, তার জন্যে লোক পাঠাচ্ছি। আর কিছু বল্‌বার আছে?

ভ। আপনার সম্বন্ধে কিছু—

দু। আমার সম্বন্ধে?

ভ। জানেন ত প্রভু, প্রথম রাত্রির পর ঘোর অন্ধকারে আমাকে সহর ঘুরে দেখ্‌তে হয়, কোথাও কোন গোলমাল হয় কিনা আর কোন কিছু সন্দেহ কর্‌বার মত দেখা যায় কিনা?

দু। এই সম্বন্ধে না কি?

ভ। শুহুন্‌না, আমি যখন রাত্তিরে ঘুরি, তখন আপনার দুর্গের উত্তর ধারে আলো দেখেছি।

দু। উত্তর দিকে? তুমি স্বপ্ন দেখেছ—সেখানে ত কেহ থাকে না!

ভ। তাইত বলি হুজুর—তবে ভূত কি আলেয়া হবে বুঝি, কিন্তু ভূতেরা ত কথা কয় না! আমি কিন্তু কিছু কথা কহিবার শব্দ শুনে ছিলাম।

দু। তুমি ঠিক বল্‌ছ?

ভ। নিশ্চয়ই—তবে তারা খুব চেঁচিয়ে কথা কয়নি।

লোকেরা যখন অবৈধ কার্য্য করে, তখন গোলমাল করে না।

দু। তুমি কাহারো কাছে এ কথা বলনি ?

ভ। হুজুর ছাড়া কাহাকেও বলিনি।

দু। তবে তুমি আর কাহাকেও বলিও না।

ভ। হাঁ প্রভু ; আশা করি এজন্যে দাসের অপরাধ লইবেন না।

দু। না, না, তুমি তোমার কর্ত্তব্য কায করেছ।

ভ। আপনি জানেন এ সব সন্ধান যদি না রাখি, তা হলে গরিবের চাকরিটী যাবে, আর রাজাও তাঁর একজন বিশ্বাসী লোক হারাবে।

দু। কি এক কথাই এক শ বার !

ভ। (স্বগত) এক কথাই এক শ বার (প্রকাশ্যে) নমস্কার (স্বগত) আমার এই কথাই এক শ বার। (প্রকাশ্যে) ডাইনির কথাটা যেন মনে থাকে। ভুলবেন না।

(প্রস্থান)

দু। এ কি ? উত্তরের দিকে আলো ? কথাবার্ত্তা
করে শোনা যায় রাত্রে ? এ যে অসম্ভব।
মাধুরী কি হেলা করি নিষেধ আমার
সৌভাগ্য-সম্পদ ভুলি' এখনো আসক্ত
সেই দরিদ্র যুবার প্রেমে ! সত্য যদি—
ঘৃণা লজ্জা ক্ষোভে তারে বিসর্জ্জিব আজি।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দুর্গের একটী কক্ষ।

বীরেন্দ্র ও মাধুরী।

মা। কেন এত নির্ব্বন্ধ তোমার ? শুনিব না
কথা তব। প্রথম নিশার পরে আর
করিব না দেখা তব সনে। পিতৃ আজ্ঞা
করিব পোষণ। কেন করি আমাদের
অক্ষুণ্ণ সম্মানে আর কলঙ্ক লেপন ?
ক্ষম মোরে।

বী। দিবসের পরিণাম সনে
চক্রবাক মিথুনের মত, তবে কি আমরা
কেঁদে যাচিব বিদায় পরস্পরে ? জেনো
প্রিয়ে, প্রণয়ের তরে পবিত্র সময়
নিশা, যখন সকলে থাকে অচেতন
ঘুমে। প্রণয়ীরা মানে না সে বিধি কভু,
প্রত্যেক মুহূর্ত্ত তার বহু মূল্যবান্
ভাবে তারা দিবসের প্রহরের চেয়ে।
আনন্দ প্রখর হয় বিপদের মুখে
আমরা যখন মিলি আনন্দের আশে,
হারাবার ভয় আসে নিমেষে নিমেষে
আলিঙ্গন পাশে বাঁধা থাকি যে সময়
তখনও কাঁপি পরস্পরে।

মা। করিযোনা
প্রলুব্ধ আমায় আর। আজি নিশা হতে
বিভিন্ন হইব পরস্পরে। আর কভু
আমাদের হবে না মিলন।

বী। বিপরীত
হইবে অথবা। আজি নিশা হতে মোরা
হব না বিচ্ছিন্ন আর। লভিব মিলন
দোঁহে চির তরে। শিবের মন্দিরে আছে
পূজারি ঠাকুর, সুহৃদ্ আমার তিনি,
পবিত্র মিলনে দিবে তোমায় আমায়
বাঁধি পরস্পর করে। অদ্যই নীশিথে
অপার্থিব রতনের হব অধিকারী
যে রত্নের আশে প্রণয়ী সতত ফেলে
সুদীর্ঘ নিশ্বাস।

মা। ত্যজ এ সঙ্কল্প তব
পিতা মোর কিছুতেই হবে না সম্মত।

বী। আমি জানি পিতা তব ধরিবে প্রথমে
রুদ্রমূর্ত্তি। শান্ত হ'লে সে রোষ ঝটিকা,
প্রকৃতি কহিবে কাণে করুণার বাণী
দুহিতার পক্ষ তার করি সমর্থন।
নিমেষের নির্দ্দয়তা ভুলিয়া অমনি
আবার স্নেহের কোলে লইবে তোমায়।
কি বল মাধুরী ?

মা। করিওনা পীড়াপীড়ি।

বী। অবশ্য আমার হ'বে তুমি। অস্বীকার
করিতেছে রসনা তোমার—উপহাস

করি তারে আঁখি তব দিতেছে সম্মতি।
রাজত্ব করিছে সুখে প্রণয় উন্নত
বুকে তব। হৃদয়ের অনুরাগ লভি
দীর্ঘশ্বাস জয়োল্লাস করিছে ঘোষণা।

মা। এই কর মম—আর্পব নিশ্চয় আজি
নিশাকালে হইব তোমারি প্রাণাধিক
আত্মীয়স্বজন, মান, সম্পদ সহায়,
সব পরিহরি মিশিব তোমার সনে।
সামান্য সৌভাগ্যে তব চির ভাগ্যবতী
গণিব আমারে।

বী। সে ভগ্ন মন্দিরে তবে
তোমায় আমায় হবে দেখা। পুরুষের
বেশ ধরি যেয়ো অসঙ্কোচে—সন্দেহের
রহিবে না ভয়—বীর পরিচ্ছেদে অঙ্গ
করি আচ্ছাদন—অথচ হৃদয় রবে
কোমলা নারীর।

মা। সোজা তবে বীর সাজা!

বী। নিশ্চয়, নিশ্চয়, আছে বীর শত শত
অঙ্গ ভঙ্গী করি শুধু ফেরে যথাতথা
সম্মুখ সমরে কিন্তু হয় নিরুদ্দেশ!
পলায়ন বিধি হেন বীরের লক্ষণ।
অথচ তাদের মূর্ত্তি হয় প্রতিষ্ঠিত।
তাদের গৌরব-গানে ধরণী কম্পিত।

মা। আসিছেন পিতা বুঝি।

বী। যাবে তুমি?

মা। যাইব নিশ্চয় যদি না আসে মরণ!

বী। বিদায়! বিদায়! [প্রস্থান]

মা। এখনো আসিছে শব্দ
কল্পনাত নয়? ওই আসিছেন পিতা।

(দুর্গাধিপের প্রবেশ) পিতঃ!

দু। কি করিছ তুমি?

মা। পিতঃ!

দু। শীঘ্র বল।

মা। আমি এসেছিনু—

দু। যুবা বীরেন্দ্রের সনে সাক্ষাতের তরে?

মা। জান ত সকলি তুমি—

দু। প্রতি নিশা জলে আলো উত্তরের দিকে
কথাবার্ত্তা শুনা যায়—

মা। আমারি সে আলো।

দু। কার কণ্ঠরব?

মা। আমার ও বীরেনের।

দু। নিষেধ কি করি নাই এই কার্য্য তরে?

মা। নিষেধ করেছ পিতঃ বড় অসময়ে।
না মানি নিয়তি বাধা তোমারি আদেশে
যে তরু আশ্রয় করি সুখী এ লতিকা,
করোনা বিচ্ছিন্ন তারে রাখ এ মিনতি—
অঙ্কুরে বাঁচালে যারে সলিল সেচনে;
অনুগতা তনয়া যে আমি। দেবতার
বাণীসম মানি তব কথা, হতে মম
জ্ঞানের বিকাশ। দ্বিরুক্তি করিনি কভু।

দু। তা হলে নিষেধ মম অবশ্য পালিতে।

মা। বীরেনের কথা বল প্রথম যে দিন
স্পন্দিত হইল দেহ পুলক হিল্লোলে।
সুন্দর বলিলে তারে, আমিও ভাবিনু
তাই—সাহসী সে শুনিয়া তোমার মুখে
হর্ষভরে দুরু দুরু করিল হৃদয়।
বলিলে যখন তুমি নহেক সে ধনী—
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি ফিরানু বয়ান।
নয়নের ধারা হেরি উরসে আমার
বলেছিলে তুচ্ছ অতি সৌভাগ্য-সম্পদ
প্রকৃতির দান হ'তে। তোমারি আদেশে
বীরেনে বাসিনু ভাল—পিতঃ তদবধি!

দু। ছিল বটে আগে মোর এ মোহ স্বপন্।

মা। সে মধুর স্বপ্নে আমি এখনো বিভোর।
কি দোষ আমার ইথে?

দু। এই সে সময়
তবে জাগিবার তব। আত্ম সংযমের
তরে দৃঢ় কর মন—হয়োনাক আর
অগ্রসর। ঘৃণাকর নীচ অনুরাগে।
অপার স্নেহের কোলে ফিরে এস মোর।
সম্মত নহ কি তুমি আমার কথায়?
শুন তবে—গর্ব্বভরে আমার আদেশ,

অবহেলি' মত্ত হয়ে হেয় অনুরাগে
পরিণয় কর যদি নীচ প্রজাসহ,
এ জীবনে হেরিব না আনন তোমার।
মরণের পরে পাবে ঘোর অভিশাপ
সম্পদের স্থলে মোর, করিনু প্রতিজ্ঞা।
যাহা ইচ্ছা কর স্থির—চলিলাম আমি।

[প্রস্থান]

মা। দাঁড়াও, দাঁড়াও, পিতঃ! চলে গেল হায়,
বুঝিলনা দুহিতার মরম বেদনা,
মা আমার, আজ যদি থাকিতে গো তুমি
তা হ'লে কি পিতা মোরে পারিত ত্যজিতে?
সরমের মাথা খেয়ে পিতাবে বুঝাতে
হইত না এত কথা। হা অদৃষ্ট মোব!
বীরেন্দ্র, এখন আমি তোমারি কেবল।
সর্ব্ব সুখ বিসর্জ্জিযা অর্পিনু তোমার
করে সর্ব্বস্ব আমার—জীবন সর্ব্বস্ব
তুমি—কিন্তু কর যদি অবহেলা মোরে
ভ্রূভঙ্গী করিয়া কর তীব্র তিরস্কার
এ প্রণয়ে ঔদাসীন্য দেখায়ে হৃদয়ে
ব্যথা দাও যদি—না মা অসম্ভব তাহা
তুমি চির সত্যময় সন্দেহ কি তার?

তৃতীয় দৃশ্য।

অরণ্য।

রাঘব ও অনন্ত।

অ। এসেছি এ গহন কাননে। কি আদেশ
বল প্রভু?
রা। শক্র তুমি মম।
অ। বটে!
রা। মৃত্যু হতে বাচায়েছ বলি'।
অ। তাই কি বিরাগ এত?
রা। দিন রাত তদবধি শান্তি নাই
মোর। ভাবিতেছি শুধু কেমনে তোমায়
পাঠাইব শমন সদনে।
অ। একি কথা!
বিচিত্র উপায় এ যে প্রতিদান তরে।
রা। এ অরণ্যে পড়েছিনু শান্তি রক্ষকের
প্রহরীগণের হাতে—
অ। এখনো হয়নি এক মাস।
রা। যুঝেছিনু তাহাদের সনে
আমরা সকলে, যদবধি অসি তব
খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়েনি ভূতলে। আর
আহত অঙ্গের মম, বহিলে শোণিত
ধারা, বাধ্য হয়ে পলা'নু আমরা সবে।
বনের জটিল পথ আমাদেব চিব
পরিচিত—হনু অগ্রসব মোরা, তারা
সবে পড়িল ধাঁধায়। বৈরীপদধ্বনি
তাই হারানু হেলায়। তথনো শোণিত
স্রোত থামে নাই মম। পড়িলাম ক্লান্ত
হ'য়ে উরসে তোমার। কেশরী যেমন
শিকাবীব অস্ত্র হতে শিশুরে আপন
রক্ষা করে, তুলি মোবে তেমতি সবলে
আনিলে আবাসে ত্বরা। মূর্চ্ছিত হইনু
আমি অমনি সেথানে।
অ। করুণার কার্য্য আমি ভেবেছিনু তাহা।
রা। আমিও রয়েছি
ঋণী এত দূব তব। কিন্তু তার পর?
তার পর খুলে ছিলে অঙ্গ আবরণ
মম, ক্ষত স্থান হেরিবারে। তার পর
কি হেরিলে বল?
অ। হেরিনু সঙ্কেত এক তব বাহু মাঝে।
রা। জানি, জানি, দেখেছিলে,
তুমি—মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়ে ছিল সে মুহূর্ত্তে
মোর—তোমার নয়ন সে সঙ্কেত 'পরে
ছিল নিবদ্ধ তখন। যা' কিছু গোপন
মম জেনেছ সকলি—করেছ প্রকাশ আর।
অ। করিনি প্রকাশ তাহা সত্য জেন স্থির।
রা। কঠিন শপথ কর—সে প্রসঙ্গ
আননি রসনা অগ্রে।
অ। যদি তার এক
বর্ণ উচ্চারিয়া থাকি, ভবানীর দয়া
হ'তে হইব বঞ্চিত।

রা। সখা তবে তুমি
মম। ওকি? শুন দেখি—
অ। মানুষের পদ ধ্বনি।
রা। স্থূল মানবের বুঝি। সবে এস
এই দ্বারে—দেখি কেবা আসে?
(দয়ানন্দের প্রবেশ)
অ। কোথা এত ত্রস্ত হয়ে যেতেছ ঠাকুর?
দ। দিযোনাক
বাধা মোরে—ওই দুর্গে যাব আমি, কার্য্য
আছে সবিশেষ।
রা। (স্বগত) দুর্গে। (প্রকাশ্যে) কি কায তথায়?
দ। মূঢ় তুমি বড় বৎস। অতি গোপনীয়
এ বিষয়।
রা। দাও সদুত্তর—তা না হলে
দেহ হতে হৃদপিণ্ড করিব অন্তর।
অ। শীঘ্র বল।
দ। ভাল বলিতেছি।
রা। কায নাই ভূমিকায় আর।
দ। দুর্গাধিপচিত্ত বড়
হয়েছে চঞ্চল। আমি যাইতেছি তাঁর
গ্রহশান্তি তরে।
রা। দুর্গেশের পরিচিত
তুমি কি ঠাকুর? স্বচক্ষে দেখেছে তিনি?
দ। নহে।
রা। জানে কি তোমারে কোন অনুচর তাঁর?
দ। কেহ নয়।
রা। কি নাম তোমার? বুঝি—
দ। দয়ানন্দ।
রা। (স্বগত) তাই বটে। (প্রকাশ্যে) সত্বর মোচন
কর পরিচ্ছদ তব। ইতস্তত: কেন?
এখনি ডাকিব তবে অনুচরগণে,
প্রহারি এ বেশচ্যুত করিবে তোমার। (বস্ত্রত্যাগ)
ভাল, শুন মোর কথা যাও নিজ মঠে,
এদিকে এসনা আর। নহিলে ভূতের
খেলা হেরিবে অচিরে। শীঘ্র মঠে গিয়ে
ইষ্টচিন্তা করগে আপন।
দ। রাম, রাম,
এই অত্যাচার হরি করোনা গ্রহণ;
কৃপা বিতর, গুণে কর এদের মঙ্গল। [প্রস্থান]
রা। পলাইল। বুঝেছ কি উদ্দেশ্য আমার?
অ। একরূপ বুঝিয়াছি বটে।
রা। ফিরে যাও
আমাদের দলে, দুঃসাহস কার্য্যভার
আজিকার রাত্রে দিনু তোমার উপর।
পাইবে সাহায্যকারী দুর্গের ভিতরে
যাহারা প্রশস্ত পথ দিবে দেখাইয়া।
অ। ভাল তবে বিদায় এখন।
(প্রস্থান)
রা। এই বার
হারাইবে দুর্গাধিপ হিতাহিত জ্ঞান।
স্বহস্তে সাধিব আজ স্বস্ত্যয়ন তার।
প্রতিশোধ হ'বে কিছু অদ্ভুত ভীষণ—
শোণিতাক্ত স্মৃতি যার ভবিষ্যতে দিবে
শিক্ষা দুর্দান্ত মানবে—কুণ্ঠিত যাহারা
স্বীয় অনুচর প্রতি কৃপা বিতরণে।
শত অত্যাচার বটে মহতের ক্ষমা
লভিতে সক্ষম। কিন্তু অপমান আছে
হেন—যাহা বহির্ভূত করুণার সীমা। [প্রস্থান]
(ক্রমশঃ—)

কুকি জাতির বিবরণ।

(৪)

কুকিগণ কর্ত্তৃক ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে, বৃটিশ ত্রিপুরার অন্তঃপাতী খণ্ডল পরগণায় ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের সময় কাণপুরে যে লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, এই হত্যাকাণ্ড তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনীতে এই ঘটনা অতি সংক্ষেপে ও লঘুতররূপে বিবৃত হইয়াছিল। উক্ত বিজ্ঞাপনীর স্থূল মর্ম্ম এই :—

"১৮৬০ খ্রীঃর জানুয়ারি মাসের প্রথমভাগে চট্টগ্রামে এইরূপ রিপোর্ট আগত হইল যে, চারি পাঁচ শত কুকি,

ফেনী নদীর মুখে একত্রিত হইয়াছে। ইহার অব্যবহিত পরেই সংবাদ পাওয়া গেল, তাহারা অনেক গুলি গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছে এবং বিস্তর মনুষ্য হত্যা করিয়াছে। ইহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তৎ সংবাদ আমরা জানিবার পূর্ব্বেই ৩১শে জানুয়ারি তারিখ কুকিগণ ফেনী নদীর ভাটিতে যাইয়া ছাগলনাইয়া নামক স্থানে (ত্রিপুরা জিলার সমতল ভূমিতে) প্রবেশ করিল। তাহারা ১৫ খানা গ্রাম ভস্মীভূত ও লুণ্ঠন এবং ১৮৫জন বৃটিশ প্রজাকে হত্যা করিয়া একশত লোক ধৃত করিয়া আনিয়াছিল।"

এই হত্যাকাণ্ড অবলম্বন করিয়া, রাধামোহন নামক জনৈক গ্রাম্য কবি একটি গীতি কবিতা রচনা করেন। এই কবিতার ঘটনায় মোটামুটি অবস্থা সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। কবিতাটির কিয়দংশ কৈলাস বাবু সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা নিম্নে প্রদান করিলাম।

কবি বীণাপাণির পদ বন্দনা করিয়া বলিতেছেন :—

"শুন সর্ব্ব সাধুজন ইহার নির্ণয়।
যেন মতে খণ্ডলেতে কাটাকাটি হয়॥
দেখ মাঘ মাসে শনিবারে শ্রীপঞ্চমী ছিল।
মুন্সীর খিল বাজারে বাবু ধুরন্ধর * ছিল॥

* ধরণীধর সিংহ কাপ্তান।

সেদিন প্রভাত কালে, করেছিল পূজার আয়োজন।
চিনি শর্করা আদি যত লয় মন॥
পূজা আরম্ভিল হেনকালে প্রমাদ ঘটিল।
অকস্মাৎ তিপ্রা কুকি আসি দেখা দিল॥
তারা, দাও শেল হাতে বন্দুক কান্ধে দেখ্‌তে ভয়ঙ্কর।
দেখে প্রাণ ভয়ে কাঁপে কালা ভুজঙ্গর।
রণে প্রবেশিল যারে পায় কাটিয়ে ফেলায়।
অবনীতে কাটা পড়ি ধূলাতে লুটায়॥
রুধির আবেসিল আকাশেতে উড়িছে শকুন।
ঘর জিনিস লুট করি চালে দেয় আগুন॥
তারা ঘন্টা নিল, কুড়াল নিল আর নিল, দাও কাঁচি।
সিন্দুক ভাঙ্গি কাপড় নিল ভাল ভাল বাছি॥

* * * *

ঠিক দুপর বেলা হ'ল, পুড়ে মুন্সী বাড়ী।
সে দিন ফিরে যায়, রাত পোহালে ছিল রবিবার,
কাটা গ্রামে কাটি আসি দিল পুনর্ব্বার॥"

* * *

চৈলেছে কোলা পাড়া॥
কোলা পাড়া যেতে তারা করেছে গমন।
বাউনালীর কূলে আসি দিল দরশন॥
দেখে গুণাগাজী, গুণাগাজী এল সাজি, সিপাই সঙ্গে করি।
তিপ্রা কুকি ফিরাইল বন্দুক আওয়াজ করি।" *

খণ্ডাল পরগণার অন্তর্গত মুন্সীর খিল গ্রামের বাজারে ত্রিপুরেশ্বর বাহাদুরের কাপ্তান ধরণীধর সিংহ কতক সৈন্য লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। ১৬ই মাঘ, শনিবার শ্রীপঞ্চমীর পূজোপলক্ষে অস্ত্রাদি পরিষ্কার করিয়া, পূজার নিমিত্ত সাজাইয়া রাখা হইয়াছে, এমন সময় হঠাৎ সংবাদ পাওয়া গেল, চারি পাচ শত কুকিতে নিকটবর্ত্তী গ্রাম আক্রমণ করিয়াছে। কাপ্তান মহাশয় এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই অস্ত্রাদি লইয়া পলায়ন করিলেন। † তখন কুকিগণ অবলীলাক্রমে দাহন, লুণ্ঠন ও নিধনাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল; তাহাদিগকে বাধা দেওয়ার আর কেহই ছিল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুদিগকে মাতার সম্মুখে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া, নীচে সুতীক্ষ্ণ শেল ধারণ পূর্ব্বক বিদ্ধ করিতে লাগিল। পুরুষ এবং বৃদ্ধ স্ত্রীলোক মাত্রকেই নির্দ্দয়তার সহিত বধ করা হইয়াছিল। কেবল যুবতী স্ত্রীলোকদিগকে বন্ধন করিয়া, সঙ্গে লইয়া গেল। তাহারা এবার ১৫ খানা গ্রাম লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করিয়া, ১৮৫ জন লোকের প্রাণ সংহার করিয়াছিল এবং প্রায় এক শত লোককে ধৃত করিয়া আনিয়াছিল। এই সকল গ্রামের স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ সমস্তই কুকিগণ লুণ্ঠন করিয়াছিল।

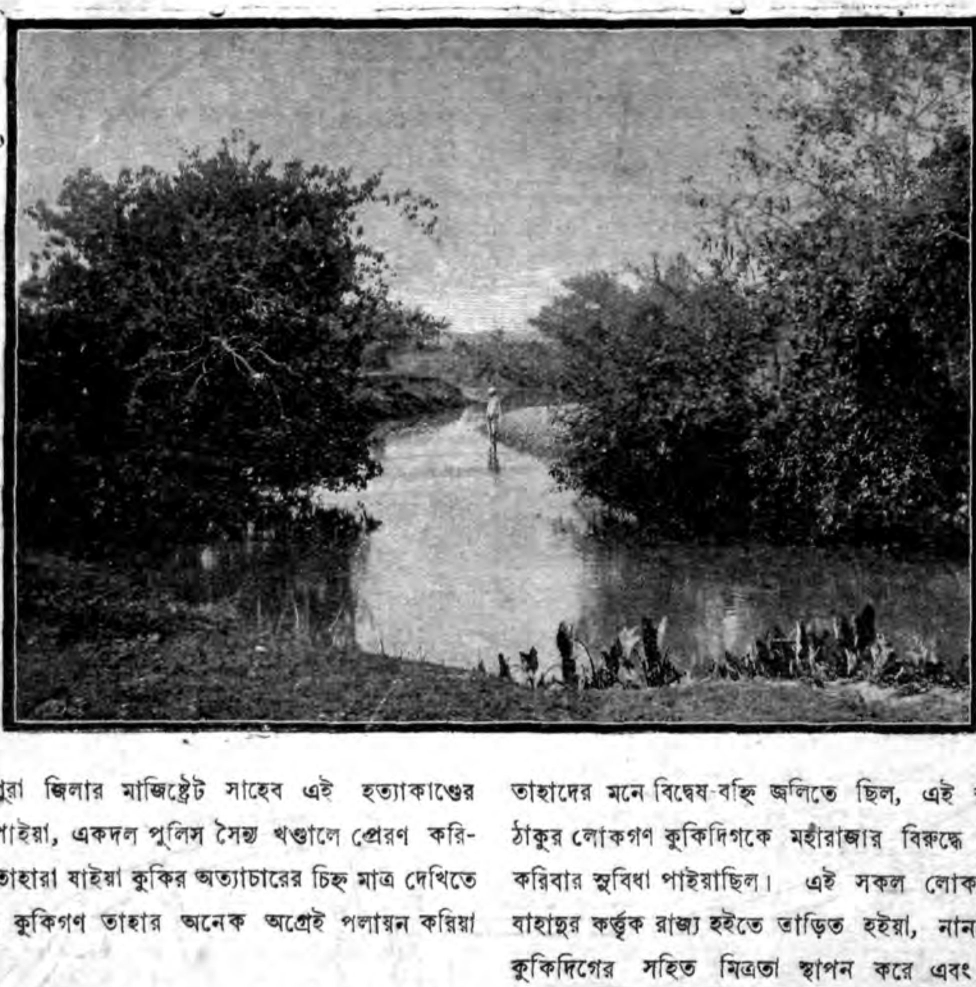
এই সময়ে গুণাগাজী নামক গ্রাম্য একজন প্রধান লোক চতুর্দ্দিকস্থ পল্লী হইতে ২৫। ৩০টি বন্দুক সংগ্রহ করিয়া, বাউনালী নামক ক্ষুদ্র নদীর তীরে কুকিদিগকে আক্রমণ করে। কুকিগণের সঙ্গে অধিক বন্দুক ছিল না। সুতরাং তাহারা আক্রান্ত হইয়া, নদী পার হইতে সাহস পাইল না; এখান হইতেই পলায়ন করিল। গুণাগাজী সাহসে বুক বাঁধিয়া এরূপভাবে বাধা না জন্মাইলে কুকিগণ

* কৈলাস বাবুর রাজমালা—৩য় ভাঃ, ৬ষ্ঠ অঃ, ৩৬২।৩৬৩ পৃঃ।

† এই কারণে কাপ্তান ধরণীধরকে অনেক লাঞ্ছনা পাইতে ও কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণিত হইতে হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে তিনি কাপুরুষ ছিলেন না। 'জমাতিয়া বিদ্রোহ' সময়ে তাঁহার সাহস ও বিক্রমের বিস্তর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।—

আরও বিস্তর ক্ষতি করিত, সন্দেহ নাই। আমরা বাউ-নালীর নদীর একখানি চিত্র নিম্নে প্রদান করিলাম।

দিগকে বাধ্য করিয়াছিল। এবং ইতিপূর্ব্বে মহারাজার কতকগুলি প্রজা ডুপটাং কুকিদিগকে আক্রমণ করায়,



ত্রিপুরা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া, একদল পুলিস সৈন্য খণ্ডালে প্রেরণ করিলেন। তাহারা যাইয়া কুকির অত্যাচারের চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাইল; কুকিগণ তাহার অনেক অগ্রেই পলায়ন করিয়াছিল।

এই শোচনীয় ঘটনার মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া, বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষগণ যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে :—

"পূর্ব্বে ইহা অনুমান করা হইয়াছিল যে, ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুর ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে কোন রকম গোলমাল ঘটাইবার অভিপ্রায়ে,রাজবংশের নিকট সম্পর্কিত কোন্ ব্যক্তিদ্বারা যত দুরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত কুকিগণ চালিত হইতেছে। পরে নিশ্চয়রূপেই জানা গিয়াছিল যে, ত্রিপুরা রাজ্যের তিন চারি জন পলাতক ঠাকুর লোক এই আক্রমণের প্রধান উত্তেজনাকারী ছিলেন। এই সকল ঠাকুর লোক দীর্ঘকাল কুকিদিগের সহিত বাস করিয়া তাহাদের মনে বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিতে ছিল, এই সুযোগেও ঠাকুর লোকগণ কুকিদিগকে মহারাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার সুবিধা পাইয়াছিল। এই সকল লোক মহারাজ বাহাদুর কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া, নানা শ্রেণীর কুকিদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন করে এবং মহারাজ বাহাদুরের অধিকৃত স্থান সমূহ মধ্যে মধ্যে আক্রমণ ও লুণ্ঠন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এই সকল ঘটনার কথা মধ্যে মধ্যে আমাদেরও কর্ণগোচর হইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রকৃত পক্ষে কোনও ঠাকুর লোক এই ঘটনায় সংলিপ্ত ছিলেন কিনা, তাহার কথা বলা যায় না। সম্ভবতঃ পূর্ব্বের দুই একটী ঘটনা দেখাইয়াই, বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের মনে এই ভাব জাগ্রত হইয়াছিল। এই ঘটনার প্রকৃত কারণ পরে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এইরূপ :—

স্বাধীন ত্রিপুরার পার্ব্বত্য প্রদেশে 'রিয়াং' নামক এক সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রিয়াংগণ ত্রিপুরা ও কুকির মধ্যবর্ত্তী সঙ্কর জাতি বলিয়া

অনেকের বিশ্বাস। এই বিশ্বাস সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, রিয়াংগণের স্বভাব প্রায় কুকিগণের ন্যায়ই উগ্র। এবং ইহারা কতকটা হিংস্র ভাবাপন্নও বটে। খণ্ডালের বাঙ্গালী মহাজনদিগের নিকট হইতে রিয়াংগণ সর্ব্বদাই টাকা কর্জ্জ লইত। অনাবৃষ্টি হেতু উপর্য্যুপরি দুই তিন বৎসর কাল পার্ব্বত্যঅঞ্চলে শস্য উৎপন্ন না হওয়ায়, রিয়াংগণ নিতান্ত নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছিল। এদিকে মহাজনেরা অবিরত টাকার নিমিত্ত তাগাদা আরম্ভ করিল। অভাবের সময় এই তাগাদা রিয়াংগণের পক্ষে নিতান্তই অসহনীয় হইয়া উঠিল; এবং এই কারণে তাহারা কতকগুলি কুকি প্রজার সহিত মিলিত হইয়া এই হত্যাকাণ্ড ঘটাইয়াছিল। খ্যাত নামা কুকি সরদার রতন পুইয়া এই ঘটনায় সংলিপ্ত ছিল। ত্রিপুরার রাজবংশ সংসৃষ্ট কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর এই হত্যা ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

খণ্ডালের যে সকল লোক কুকিগণের অত্যাচারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ১৩০০৭ টাকা প্রদান করা হয়। ইহার অর্দ্ধাংশ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও অর্দ্ধাংশ ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুর বহন করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতের নিমিত্ত কুকিদিগকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে তৎপরবর্ত্তী শীত ঋতুতে অভিযানের আয়োজন করা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আবশ্যক মনে করিলেন এবং এই সময় হইতেই তাহার অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে, এক দল কুকি স্বাধীন ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ করিল। উদয়পুরে ত্রিপুরেশ্বর বাহাদুরের একটি সেনানিবাস ছিল, তাহাতে ১ জন মাত্র হাবিলদার ও ২৫ জন সিপাহী অবস্থান করিত। এত অল্প সংখ্যক লোকের কুকিগণের মুখে দাঁড়ান সম্ভবপর হইতে পারে না। তাহারা কুকির আক্রমণের সংবাদ পাওয়া মাত্রই "মেগেজিন" ছাড়িয়া পলায়ন করিল। কুকিগণ এই"মেগেজিনের"বলে প্রবল বিক্রমে উদয়পুর ও তন্নিকটবর্ত্তী দুই থানা গ্রাম আক্রমণ করিল। এখানে বিস্তর লোকের প্রাণ হত্যা এবং অনেক গুলি লোকালয় ও একটি সমৃদ্ধিশালী বাজার লুণ্ঠন ও দাহ করিয়াছিল। উদয়পুর নিবাসী ছেয়ড়ি লস্কর নামক একটি লোকের সহিত আমাদের আলাপ আছে। কুকিগণ কর্ত্তৃক ইহারও বাড়ী লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইয়াছিল। ইহার স্ত্রীকে কুকিগণ লইয়া গিয়াছিল, কিছুকাল পরে সে পালাইয়া আসিয়াছে। কুকির আক্রমণের সময় ছেয়ড়িলস্কর ভয়ে পলায়ন করিতেছিল, পথিমধ্যে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। এই সময়ে দূর হইতে একজন কুকি তাহাকে গুলি করিয়াছিল। ভগবানের কৃপায় সেই গুলি তাহার গায়ে লাগিল না, কিন্তু বন্দুকের শব্দ শুনিয়া ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। এই সময়ে কুকিগণ তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া, সম্ভবতঃ মৃত কি জীবিত পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত দাও দ্বারা তাহার শরীরে তিনটি আঘাতের বড় বড় চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। তত জোরে আঘাত করে নাই বলিয়াই প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল।

উদয়পুর হইতে কুকিগণ পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের দিকে ধাবিত হইল। ইহারা কালিন্দী রাণীর (চাথমা সরদার) অধিকৃত স্থানে যাইয়া, কয়েক খানা গ্রাম দগ্ধ করিবার পর একদল বৃটিশ পুলিস সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, পর্ব্বতাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

অতঃপর কুকিদিগকে বিশেষরূপে দমন করা আবশ্যক বোধে, চট্টগ্রামের কমিসনর বক্‌লেণ্ড্ সাহেব ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের সহিত পরামর্শ করিবার নিমিত্ত লেফ্‌টেনেণ্ট্ গ্রেহাম্ কে আগরতলায় প্রেরণ করিলেন। গ্রেহাম্ সাহেব মহারাজ বাহাদুরের সহিত আলাপাদি করিয়া ১৮৬১ খ্রীঃ ১০ই আগষ্ট তারিখে কমিসনার সাহেবের নিকট যে রিপোর্ট করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ ঃ—

"কুকিদিগের অত্যাচার নিবারণ জন্য স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রান্তভাগে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ সৈন্যস্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, মহারাজ তাহাতে সম্মত নহেন। তিনি তাঁহার নিজ সৈন্য উপযুক্ত স্থানে সন্নিবিষ্ট করিতে প্রস্তুত আছেন। নিবিড় অরণ্যে গবর্ণমেণ্টের সৈন্যগণ, কুকিদিগের সহিত যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইবে না। আগামী শীত ঋতুতে মহারাজ তাঁহার অধীনস্থ বৃহৎ এক দল কুকি সেনা,দুরন্ত কুকিদিগের বিরুদ্ধে পাঠাইতে প্রস্তুত আছেন। আমার বিশ্বাস, মহারাজ সরলভাবে এই প্রস্তাব করিয়াছেন; এবং প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। *

* কৈলাস বাবুর অনুবাদ।

ইহার পরের বৎসর (১২৭২ ত্রি—১৮৬২ খ্রী) মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর পরলোক গমন করার পর মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে ত্রিপুর রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে অথবা চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোনরূপ অশান্তির কারণ ঘটে নাই কিন্তু উত্তর প্রান্তে শ্রীহট্টের সীমান্তবর্ত্তী স্থানে (আদমপুরে) কুকিগণ কর্ত্তৃক বিষম উপদ্রব ঘটিয়াছিল। এই ঘটনার মূল কারণ যাহা জানা গিয়াছে, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

লালচুক্লার পুত্র রাজা মুরচইলাল, প্রসিদ্ধ কুকি-সরদার সুকপইলালের ভগ্নি ভানুও থাঙ্গাকে বিবাহ করেন। এই সুকপইলালের পিতা মংপের কুকিগণের পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। সুকপইলালও বিক্রমে পিতা অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। কোনও কারণবশতঃ রাজা মুরচইলাল স্বীয় পত্নী ভানুও থাঙ্গীকে অপমানিত করিয়াছিলেন। বীর দুহিতা এবং বীর ভগিনী, অভিমানিনী পত্নীর প্রাণে সে অপমান সহ্য হইল না। তিনি ভ্রাতা সুকপইলালকে এ সংবাদ জানাইলেন। এই সূত্রে কুকিগণের মধ্যে বিষম অশান্তি ঘটিয়াছিল। এবং সেই অশান্তি ক্রমে গড়াইয়া, হতভাগ্য বাঙ্গালী জাতির উপর পড়িল। সুকপইলাল, বাংবুং ও লালহুলন প্রভৃতি রাজাগণ মিলিত হইয়া, ত্রিপুর রাজ্যের কয়েকটি গ্রাম, এবং শ্রীহট্ট জিলার আদমপুরের নিকটবর্ত্তী কয়েকখানা গ্রাম লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করিয়া, অনেকগুলি লোক ধৃত করিয়া লইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে যে সকল স্ত্রীলোক ছিল, তাহাদের কয়েক জন পলায়ন করিয়া কাছাড়ে আসিয়াছিল, অবশিষ্টগুলিকে কুকিগণ বিবাহ করিয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে।

এই হত্যাকাণ্ডের পর কুকিদিগকে কৌশলে বাধ্য করিবার নিমিত্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন (১৮৬২—৬৩ খ্রীঃ)। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের তদানিন্তন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গ্রেহাম্ সাহেব খ্যাতনামা কুকিসরদার রতনপুইয়াকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিলেন। এই সন্ধিতে ধার্য্য হইয়াছিল যে, সীমান্ত প্রদেশে শান্তিরক্ষার নিমিত্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, রতনপুইয়াকে বার্ষিক ৪০০ টাকা, হাউলং দিগকে ৮০০ টাকা, এবং 'সাইলো'দিগকে ৮০০ টাকা প্রদান করিবেন। উত্তর অঞ্চলে কাছাড়ের ডেপুটি কমিসনার ষ্টুয়ার্ট সাহেব, সুকপইলাল, মোল্লাসরদার ও বনপুইলালের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করেন। এখানে, সুকপইলাল গবর্ণমেণ্টের বাধ্য থাকিয়া শান্তিরক্ষা করিলে, তাঁহাকে বার্ষিক ৬০০ শত টাকা প্রদান করিবার কথা হইয়াছিল।

১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে কুকিগণ চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে নানাবিধ উপদ্রব ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কোন রকম অনিষ্ট করিতে সক্ষম হয় নাই। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে ইহারা ভীষণ আত্মকলহে লিপ্ত ছিল, সুতরাং সমতল ভূমিতে নামিয়া অনিষ্ট করিবার অবসর পাইয়াছিল না।

১৮৬৭ খ্রীঃ মার্চ্চ মাসে প্রায় ৫০০ শত হাউলং কুকি সমবেত হইয়া চট্টগ্রাম অঞ্চল আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছিল। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষগণ বর্তন পুইয়া দ্বারা এই সংবাদ জানিতে পাইয়া, চট্টগ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে সৈন্য সংস্থাপন করিলেন। হাউলংগণ সেই দিকে সুবিধা না পাইয়া, ত্রিপুর রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম হইতে সতর্ক থাকায়, এখানেও তাহারা কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। কাজেই নিরাশ হৃদয়ে পর্ব্বত মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

১৮৬৮ খ্রীঃ শেষ ভাগে, সুকপইলাল ও বানপুইলালের অধীনস্থ বহুসংখ্যক কুকি সম্মিলিত হইয়া, কাছাড়, ত্রিপুরা এবং মণিপুর অঞ্চলে সমভাবে অত্যাচার আরম্ভ করিল। এই সময়ে মণিপুরের মহারাজ মারজিতের পুত্র কানাই সিংহ পিতৃসিংহাসন অধিকারের মানসে একটি ক্ষুদ্র দল সংগ্রহ করিয়া কুকিদিগকে সেই দলভুক্ত করিয়া লইলেন। ইনি কুকিগণের সহিত বিশেষ প্রীতি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার রাজকুমার নীলকৃষ্ণ দেববর্ম্মণ বাহাদুর কুমার কানাই সিংহের ভাগিনেয় ছিলেন। এজন্য খণ্ডলের হত্যা-কাণ্ডে কুকিগণের সহিত নীলকৃষ্ণ গোপনে সংলিপ্ত ছিলেন বলিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সন্দেহের কারণ ঘটে। ত্রিপুরার তদানিন্তন মাজিষ্ট্রেট গর্ডন সাহেবের রিপোর্ট দ্বারা সেই সন্দেহ অপনীত হইয়াছিল * এই হত্যাকাণ্ডে নীলকৃষ্ণের সহানুভূতি ছিল কিনা, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু কয়েকটি কুকি সরদারের সঙ্গে যে তাঁহার প্রীতি প্রণয় ছিল, একথা মিথ্যা নহে। কাছাড়ের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি

* Government letters to the commissioner of Chittagong, 7th Nov. 1860. No. 5845.

কমিসনার এডগার সাহেবও * কুকি প্রদেশ পরিভ্রমণ কালে এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইয়াছিলেন।

১৮৬৯ খ্রীঃর প্রারম্ভে গবর্ণমেণ্ট, কুকিদিগের বিরুদ্ধে তিন দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই যুদ্ধযাত্রার ফল মোটের উপর ভাল হইয়াছিল না। এই সনের শেষ ভাগে, কুকিদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত বৃহৎ একদল সৈন্য প্রেরণ করিবার পক্ষে, সার উইলিয়ম গ্রে, প্রস্তাব প্রেরণ করেন। তদানিন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড মেও বাহাদুর এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া, সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার নিমিত্ত স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে তিনি, ত্রিপুর রাজ্যে পলিটিক্যাল এজেণ্ট নিয়োগের প্রস্তাব বিশেষ রূপে অনুমোদন করেন। বলা বাহুল্য যে, ইহার পূর্ব্বে উক্ত রাজ্যে গবর্ণমেণ্টের রেসিডেন্সি ছিল না।

ইহার পরে প্রায় এক বৎসর কাল কুকিদিগকে কৌশলে বাধ্য করিবার নিমিত্ত ইংরেজ কর্তৃপক্ষগণ বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। কাছাড়ের ডেপুটি কমিসনার মিঃ এডগার্ এই সময়ে কুকিগণের আবাস স্থানে (ব্যাপারির বাজারে) গিয়া, কুকিসরদার সুকপইলালকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে সম্মানসূচক এক খেলাত প্রদান করিলেন। এই খেলাতে সোণালি লালবর্ণের ফুল বিশিষ্ট সবুজবর্ণের পায়জামা ১টি, এই রকমের কাজ করা বেগুনি রঙের কোট একটী, সাদা ও সবুজ রঙের কাজকরা সুন্দর টুপী ১টি, বেলোয়ারি ও সোণার দানাযুক্ত হার ১ ছড়া, এবং বেলোয়ারি কর্ণভূষণ দুইটি ছিল। এডগার সাহেব মনে করিলেন, কতকগুলি সামান্য মূল্যের ঝুটা জিনিস দিয়া বর্ব্বরকে হস্তগত করা হইল। বর্ব্বর তাহা গ্রহণ করিলেন বিপরীত ভাবে, তাঁহার অনুচরগণ মণিপুরের দরবারে যাইয়া প্রকাশ করিল, "কাছাড়ের বড় সাহেব আসিয়া, আমাদের রাজাকে কর দিয়া গিয়াছেন!"

ইংরেজ কর্তৃপক্ষগণের কৌশলজাল এখানে ব্যর্থ হইল। এই সকল কৌশল দ্বারা উপকারের পরিবর্ত্তে বরং অপকার ঘটিয়াছিল। কুকিগণ বুঝিল,—তাহারা যত অত্যাচার করিবে, ইংরেজগণ ততই উপহারাদি প্রদান দ্বারা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইবেন। সুতরাং ইংরেজদিগের নিকট হইতে কিছু কিছু আদায় করিবার ইহাই উত্তম ব্যবস্থা! তদবধি কুকিগণ নরহত্যা, গৃহদাহ এবং লুণ্ঠনাদি কার্য্যে অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিল।

সুকপইলালকে খেলাত প্রদান করিয়া এডগার সাহেব শিলচরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সংবাদ পাইলেন, কুকিগণ পুনর্ব্বার আক্রমণ ও লুণ্ঠন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে! অল্প কালের মধ্যে ইহারা কাছাড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা এবং মণিপুরের নানা স্থান আক্রমণ করিয়া, গৃহদাহ, নরহত্যা এবং লুণ্ঠনাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল। এই সময়ে আবার অনেকগুলি যুবতী স্ত্রীলোককে কুকিগণ বন্দী করিয়া নিয়াছিল।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।

দেবীযুদ্ধ।*

"——একাকী এ ভবে
সহায় সম্পদ হীন,—আত্মীয় বান্ধব,
বিদ্যা, বুদ্ধি, কপর্দ্দক পথের সম্বল,
বিপদে সাহস বাক্য, বিলাপে সান্ত্বনা,
কিছুই ছিল না, নাই;—সংসার সাগর
তরঙ্গে পতিত পক্ষিশাবকের মত
ভাসিয়াছি, ভাসিতেছি, আরো কত কাল
ভাসিতে হইবে, তাহা জানেন বিধাতা।"

উৎসর্গপত্রের এইরূপ বিলাপাত্মক উপক্রমণিকায় কাব্যসূচনা করিয়া কবি প্রসঙ্গক্রমে যতটুকু আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার কাব্য কথার মর্ম্মোদ্‌ঘাটনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। শ্রীহট্ট প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া কবি শৈশবেই পিতৃহীন হন, দারিদ্র্য দুঃখে দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়া নানা ক্লেশে বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। পরে প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎ সুন্দরী দেবীর অনুকম্পা ও বাৎসল্য লাভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া দীর্ঘকাল শিক্ষকের কার্য্যে ও শিক্ষাপরিচর নামক মাসিক পত্রের সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া পরিণত জীবনে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীর ছায়া অবলম্বনে দেবীযুদ্ধ রচনা করিয়াছেন। ইহা কবির প্রথম রচনা নহে;—বহু বৎসরের সাহিত্য-সেবার ফল। কিন্তু ইহা ভক্তহৃদয়ের স্বাধীন উচ্ছ্বাস;— সুতরাং সমালোচকের অধিকারের অন্তর্গত নহে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ সকলের নিকট সুপরিচিত না হইলেও, তদন্তর্গত চণ্ডী হিন্দুর নিকট বিলক্ষণ পরিচিত। দেবীযুদ্ধ তদবলম্বনে রচিত হইলেও কবিকল্পনা পৌরাণিক কাহিনীর ছায়ামাত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, ইচ্ছামত বসন ভূষণে সুসজ্জিত করিয়া এক অভিনব দেবীযুদ্ধের বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ভাল কি মন্দ আদ্যন্ত না পড়িয়া—মীমাংসা করিবার উপায় নাই। কাব্যের লক্ষ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি; সুতরাং যুক্তিতর্ক কাব্যমধ্যে

---

* ইনি পরে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী হইয়াছিলেন।

* শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ প্রণীত, মূল্য ১।০। কলিকাতা ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী হইতে প্রকাশিত।

স্থান পাইতে পারে না। দেবীযুদ্ধ কাব্য—অথচ আদ্যন্ত যুক্তিতর্কে পরিপূর্ণ। তর্কের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের মিলন সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা নিতান্তই গদ্য সাহিত্যের অন্তর্গত। কবি তাহাকে পদ্যের গণ্ডীর মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া কাব্যাকারে যে যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছেন, তাহা যেমন তীব্র, তেমনি সকরুণ।

দেবতার পরাজয়, অসুরের স্বর্গাধিকার, প্রাচীন সাহিত্যের চির পুরাতন কাহিনী! শুম্ভ নিশুম্ভ সেই পুরাকাহিনীর নায়ক। তাহারা শিবের বরে স্বর্গলোক অধিকার করিয়া, শিবানীর কোপে নিহত হইয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছিল; কিন্তু দেবদলের পরাজয় হইল কেন, পরাজিত দেবদল আবার স্বর্গাধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইল কেন, পুরাণে তাহার যুক্তি-সঙ্গত কারণ উল্লিখিত নাই; কেবল জয় পরাজয়ের ঘটনাবলী বিবৃত আছে। কবি তাহা লইয়া সন্তুষ্ট হন নাই, তিনি নরলোকের ন্যায় সুরাসুরলোককেও নরলৌকিক কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া যুক্তি তর্কের সহায়তায় দেবীযুদ্ধ বুঝাইবার জন্য কাব্য রচনা করিয়াছেন।

ইহা নূতন ব্যাখ্যা। আজ কাল যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বাড়াবাড়ি হইয়াছে, এ ব্যাখ্যা সে শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় সমস্তই রূপক;—তদনুসারে দেবীযুদ্ধ পাপ পুণ্যের সমর—পুণ্যের বিজয়, পাপের পরাজয়, শরচ্চন্দ্রের দেবীযুদ্ধ সেরূপ আধ্যাত্মিক রূপক নহে; বরং তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ দেবীযুদ্ধের পাত্র পাত্রী সমস্তই শরীরী, দেবতা ও অসুর হইলেও অনেকটা যেন রক্ত মাংসের মানুষের মতই শরীরী জীব। দেবতা স্বর্গের আধিপত্য পাইয়া যেন গর্ব্বান্ধ অলস কর্ত্তব্যবিমুখ বিলাসলোলুপ মোগল বাদসাহের মত নেশাভাঙ্গে ঢুলিতে ঢুলিতে কোনরূপে চেরাসহী করিয়া রাজ্যপালন করিতেছিল; তখন অনলস কর্ত্তব্যপরায়ণ সাধনশীল অসুরদল অপরাজিত উৎসাহে দেবশক্তির মূল দেববিদ্যা উপার্জ্জনে নিযুক্ত হইয়া পুরুষকারের পুরস্কার স্বরূপ স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া লইল। ইহাতে বাহুবলের সঙ্গে ছল কৌশল ও অসুর দলের কিয়ৎ পরিমাণে সহায়তা না করিয়াছিল এমন নহে। কিন্তু একবার ছলে বলে কৌশলে স্বর্গরাজ্য হস্তগত করিবামাত্র অসুর নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, বিচারের নামে অত্যাচার, প্রজা পালনের নামে দুর্ব্বল দলন, অসুর শাসনের মূলমন্ত্র হইল। তখন দেবদল দেবগুরু বৃহস্পতিকে অগ্রণী করিয়া তাঁহার উপদেশে স্বর্গোদ্ধারে অগ্রসর হইলেন। তজ্জন্য দেবদল শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শক্তিভূমিতে সমবেত হইলেন;—শক্তি শত্রুনাশ করিয়া দেবী যুদ্ধাবসানে দেবদলকে স্বর্গরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন।

দৈত্যরাজ যখন স্বর্গরাজ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন দেবদলের দুর্দ্দশার অবধি ছিল না। সুচতুর অসুররাজ দেবগুরু বৃহস্পতিকে দৈত্য-কারাগারে বন্দী করিয়াছিলেন।

কবি বলিতেছেন:—

দেবাসুরে যুদ্ধ বাধিবে দেখিয়া
আগেই অসুর হরিল তাহারে;
দেবতা পূজিত সুর গুরু আজ
বন্দী অসহায় দৈত্য-কারাগারে।

এই বৃহস্পতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ইহার রূপক হীন নাম—জাতীয় শিক্ষা! সে যুদ্ধ করে না, কিন্তু তাহার মন্ত্রণাবলেই ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য শাসন করিতে সক্ষম ছিলেন।

বৃদ্ধ সে ব্রাহ্মণ অস্ত্র নাহি ধরে,
যায় না কখন সংগ্রামের স্থলে;
ত্রিলোকের পতি আছিলাম আমি
একমাত্র তার মন্ত্রণার বলে।"

অসুরদল দেবদলের জাতীয় শিক্ষা কারারুদ্ধ করিয়া অস্ত্র শাস্ত্র কাড়িয়া লইয়া জ্ঞানবল ও বাহুবল বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। দেবতা-দের উপর কড়া পাহারা বসাইয়া দিয়াছিল;—

পথে ঘাটে সদা দৈত্যের প্রহরা,
যুড়ি তিন লোক দানবের থানা;
দেবের কপালে যথেচ্ছ বিহার,
কথোপকথন পরস্পরে মানা!

দেবদল সম্মিলিত না হইলে মন্ত্রণা হয় না, মন্ত্রণা না হইলে, বৃহস্পতিকে না পাইলে কর্ত্তব্য নির্ণয় হয় না। অসুর না ঘুমাইলে সে মন্ত্রণার অবসর কোথায়? তাই দেবদল আরাধনা করিয়া নিদ্রাদেবীকে স্তবে তুষ্ট করিলে নিদ্রার কৃপায় অসুর ঢলিয়া পড়িল,—

"সন্নদ্ধ সমর বেশে শ্লথমুষ্টিচ্যুতবাণ
সংজ্ঞাহীন দ্বারে দ্বারে প্রহরী অসুরগণ।"

তখন মন্ত্রণার সুযোগ পাইয়া দেবদল হিমাচলের নিভৃত নিকেতনে সমবেত হইলেন। মন্ত্রণার প্রথমেই আত্মকলহের সূচনা, কাহার দোষে দেবদল স্বর্গচ্যুত? মহাদেবের বরেই ত এরূপ ঘটিয়াছে। মহাদেব তাহাতে টলিলেন না; তিনি নানা যুক্তি তর্ক দৃষ্টান্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইয়া দিলেন:—

"বংশগত বিলাসিতা, বংশগত অহঙ্কার,
বংশগত বলগর্ব্বে দেবতার অধঃপাত;
কর্ম্মবীর দেবকুল বাক্যবীর এবে হায়,
করিয়া কর্ম্মের পূজা শুম্ভ দৈত্য বিশ্ব-নাথ।"

দেবদল বৃহস্পতির পশ্চাতে পশ্চাতে শক্তি ভূমির উদ্দেশে যাত্রা করি-লেন। যাত্রার প্রথমে তাঁহারা অসুরবলের মাত্রা নির্ণয়ের জন্য শুম্ভপুরে আসিয়া দেখিলেন, অসুরের নূতন কোন সম্পৎ নাই—যাহা দেবতার সম্পৎ ছিল তাহাই অসুরের হাতে পড়িয়া দেবদল দলন করিতেছে। কেবল নূতনের মধ্যে ছিল প্রতারণা, প্রতিযুদ্ধে তাহা ব্যবহৃত হইয়াছে। সে সকল কথা স্মরণ করিয়া দেবদল মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু দেবদত্ত শক্তিই যে অসুর শক্তির মূল—যাহারা দিয়াছিল তাহারা কাড়িয়া লইতে পারিলে অসুরের নিজস্ব বলিবার যে বেশী কিছু থাকিবে না, তাহাও দেবদল বুঝিয়া লইলেন। তখন স্বর্গোদ্ধারে কৃতসংকল্প দেবদল মন্ত্রণাস্থানে যাত্রা করিলেন:—

"অগ্রগামী বৃহস্পতি, সঙ্গে দেবচয়,
আসে পাশে দৃষ্টি নাই, চলিছে সকল।"

কিন্তু চলিতে চলিতে দেবদলের মনে বিকার উপস্থিত হইল। কারণ শক্তিলাভে বহুবিঘ্ন। প্রথমেই বৃহস্পতির উপর সন্দেহ আসিয়া বিঘ্ন উৎপাদন করিল। দেবদল ভাবিল,—

"কেন বৃথা শুনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বাণী,
ছুটিয়াছি মেষপ্রায় তাহার পশ্চাতে?"

দেবদল বুঝিল, বৃহস্পতির ইহাতে নিশ্চয়ই স্বার্থ আছে। সে স্বার্থ কি? অসুর ব্রত নিয়মের ধার ধারে না, সুতরাং অসুর শাসনে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অন্ন উঠিয়াছে। তাই বৃহস্পতি অন্ন সংস্থানের আশায় দেবদলকে যুদ্ধার্থ উত্তেজিত করিতেছেন! পতিত জাতিকে উপদেশ দান করা কত কঠিন, তাহা বৃহস্পতি বুঝিলেন। তাহারা সকল কাজের মূলেই কোন না কোন নীচ অভিসন্ধি করিয়া লয়; নীচ হৃদয়ে উচ্চ নিঃস্বার্থ উপদেশ ধারণ করিতে পারে না। এইরূপে দেবদল কখন সন্দেহে, কখন বিতর্কে, কখন অবসাদে আন্দোলিত হইয়া বৃহস্পতির পরিচালনা কৌশলে দেব-দল অবশেষে কায়-ক্লেশে শক্তিভূমি প্রাপ্ত হইলেন।

এ দিকে অসুররাজ প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন করিতে গিয়া শাসন কৌশলের মূলতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছেন; বাহুবলকেই পরমবল মনে করিয়া ন্যায়ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। বিচার উঠিয়া গিয়াছে; তাহার স্থলে দৈত্যস্বার্থ দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান। দৈত্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে প্রতি-

যুক্ত অব্যাহতি পায় ;—অভিযোক্তা কারাগারে প্রেরিত হয়। দেবতার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইবা মাত্রই দণ্ড। কারণ, রাজাজ্ঞা এইরূপ ;—

"দানবের অভিযোগে না করিলে দণ্ডদান,
চিরদিন খাটিলেও হইবে না পদোন্নতি।"

সুতরাং বিচারকগণ পদোন্নতির আশায় পদমর্য্যাদা পদদলিত করিতেছেন। ন্যায়ধর্ম্ম তাঁহাদের হৃদয় হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়াছে।

দেবাসুরের সংগ্রামের সকল কথাই অলৌকিক ; কেননা তখনও লোক সৃষ্টি হয় নাই;—কেবল বিশ্ব রচনার প্রথম প্রভাত। তখনকার কোন কথাই মানবকল্পনায় সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতে পারে না ; সুতরাং দেবীযুদ্ধের সুখ দুঃখ জয় পরাজয় পার্থিব যুদ্ধের ন্যায় মানব হৃদয়ে উৎকণ্ঠা, আকাঙ্ক্ষা, অবসাদ বা উল্লাসের আবেগ আনিয়া দিতে পারে না। সে যেন কাহার কথা, সে যেন কোন্ স্বপ্নলোক-কাহিনী, সে যেন কোন অজ্ঞাতপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব অসম্ভব ব্যাপার। তাহার সহিত মানব হৃদয়ের ভাব সামঞ্জস্য নাই ; কেবল রচনা কৌশলে ঘনসন্নিবিষ্ট সুদীর্ঘ সমাসপুষ্ট সুললিত পদাবলী কর্ণকুহরে এক অপূর্ব্ব ঝঙ্কারের ক্ষণিক আনন্দ কোলাহল ঘনীভূত করে ;—পুঁথি বন্ধ করিবার পর আর তাহার প্রভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। কবি সেই পুরাতন পৌরাণিক কাহিনীকে লৌকিক পরিচ্ছদে সমাবৃত করিয়া মানুষের সুখ দুঃখের নিদানভূত লৌকিক ঘটনাও বিচিত্র চিত্রে সুশোভিত করিয়া কাব্য রচনা করায় মনে হইতেছে—এ বুঝি মানব সমাজের কথা ; এ বুঝি প্রতিদিনের প্রত্যক্ষীকৃত প্রকাশ্য ঘটনাবলীর অস্ফুট চিত্রপট। এই গুণে দেবীযুদ্ধ লৌকিক উৎকণ্ঠা, লৌকিক আবেগে পাঠকচিত্ত বিমুগ্ধ করে। সেকালের কথা যেন একালের কথা বলিয়া—ইতিহাসের ঘটনা বলিয়া—নিতান্ত পরিচিত বন্ধুর ন্যায় হৃদয়দ্বারে আঘাত করে। আন্তরিকতা এত অধিক, মনে হয় বুঝি ইহার দেবাসুর সেকালের দেবাসুর নহে। অসুররাজ যখন রাজনীতির পন্থা-নির্দ্দেশের জন্য ঘোষণা করেন ;—

"মন্ত্রিগণ, বীরগণ, সৈনিক, শাসকগণ,
শুন বিচারকগণ, ব'লে রাখি এক কথা ;
রাজ্যের এ গুপ্তমন্ত্র মনে রাখ সাবধানে,
কিন্তু ইহা প্রকাশিয়া বলিওনা যথা তথা।—"

তখন সে গুপ্তমন্ত্র শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠা যেন প্রবল হইয়া উঠে ; তাহা কাব্য-কৌতূহল অপেক্ষা উচ্চ গ্রামে আরোহণ করে ;—অসুররাজনীতি কিরূপ তাহা জানিবার জন্য মন ব্যস্ত হইয়া পড়ে।

"বহুদিনে, বহুকষ্টে, সুকঠোর তপস্যায়,
স্থাপিয়া দানব রাজ্য হয়েছি ত্রিলোকপতি ;
এ রাজত্ব, এ প্রভুত্ব অব্যাহত রহে যাহে,
সে বিষয়ে চিরদিন সকলে রাখিবে মতি।"

এই রাজাজ্ঞা কে না শিরোধার্য্য করিবে ? সে যাহা লাভ করিয়াছে, সে তাহা অব্যাহতভাবে চিরদিন ভোগ করিতে না পারিলে, ন্যায়ের সিংহাসন প্রতিষ্ঠালাভ করে না ; সুতরাং এই নীতি মানব নীতির মতই মানব হৃদয়ের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। কিন্তু পরক্ষণেই অসুর-প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার কার্য্যপদ্ধতি অবগত হইয়া হৃদয় কেমন ব্যাকুল হইয়া পড়ে।

"বদ্ধ করি আট ঘাট, পাতিয়া কৌশলজাল,
জিতজাতি সমুদায় মুষ্টির ভিতরে রাখ ;
জাতীয় জীবন যেন কোথাও না স্ফূর্ত্তি পায়,
বিজিতের প্রাণনাড়ী পলে পলে টিপে দেখ।"

ইহা যে অসুরনীতি, সে কথা কে অস্বীকার করিবে ? কিন্তু এই নীতি রাজ্যের শাসনে কিরূপে ব্যবহৃত হইবে, তাহার উপরেই সুখ দুঃখ নির্ভর করে। বিজেতার শাসন সুকোমল হইবার পক্ষে বাধা নাই ;—তাহা বিজাতির শাসন অপেক্ষাও ভাল হইতে পারে। অসুররাজ সে আশঙ্কা নিবারণ করিয়া যখন ধীর গভীর নিনাদে নীতিব্যাখ্যায় নিযুক্ত হইয়া মহাভাষ্য রচনা করিয়া বলিতেছেন ;—

"সন্দংশে টানিয়া মাংস পরীক্ষিবে যার তার,
দেখিবে, পাইয়া ব্যথা করে কিনা চীৎকার ;
নীরবে সহিয়া টান যে করিবে ধন্যবাদ,
সে বটে আদর্শ প্রজা, জীবন রাখিবে তার ;—
"কিন্তু সন্দংশের টানে 'আহা! উহু!' যে করিবে,
বুঝিবে জাতীয় তেজ এখনও রয়েছে তার ;
দানবীয় নীতিচক্রে ফেলিয়া পিশিবে তারে
রহেনা শকতি যেন মুখ ফুটি কাঁদিবার।
*　　*　　*　　*　　*
"যখন তখন সবে ধর্ম্মের দোহাই দিবে,
করিয়া ধর্ম্মের ভাণ প্রতারিবে প্রজাকুল,
যেমন করিয়া পার রাখ সদা পদানত
জিতজাতি।—শাসনের নীতিমন্ত্র এই মূল।"

তখন মানব হৃদয়ে এক অব্যক্ত ব্যথা জাগিয়া উঠে ; মনে হয় এরূপ নীতি বুঝি অসুরের পক্ষেও ঘৃণাজনক। তখন ইতিহাসের কথা মনে পড়ে। মানব সমাজ কোথায় কোন্ দেশে কবে এইরূপ অসুরনীতি অবলম্বন করিয়া কি ফললাভ করিয়াছে, তাহার তথ্যানুসন্ধানের জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মে। ইহাই এ গ্রন্থের গুণ, ইহাই আবার এ গ্রন্থের মুখ্য দোষ। অবাস্তবকে বাস্তবের মত জাগাইয়া তুলিয়া কাব্যরচনা করিতে পারিলে, তাহাকে অবশ্যই গুণ বলিয়া বর্ণনা করিতে হইবে। ভ্রমর মধু সঞ্চয়ে ভবিষ্যতের জঠরজ্বালা নিবারণের উদ্দেশ্যেই প্রভাত হইতে না হইতে পদ্মবনে ছুটিয়া যায় ; কোরকবিকাশে বিলম্ব থাকিলে, ভোঁ ভোঁ করিয়া অসহিষ্ণুতা জ্ঞাপন করে ; বিকশিত শতদলের সন্ধান পাইবামাত্র আনন্দে অধীর হইয়া ভোঁ-ও-ও করিয়া একেবারে পদ্মগর্ভশয্যায় শায়িত হইয়া পড়ে। ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বড় অধিক নহে ; ক্ষুধার্ত্তের অন্ন সঞ্চয় চেষ্টা কতই সুন্দর হইবে ? কিন্তু ইহার মধ্যে কবিকল্পনা নায়ক নায়িকার ভাব বাস্তব ঘটনার ন্যায় বর্ণনা করিবার সময়েই কাব্য-সৌন্দর্য্য উপস্থিত হইয়া উঠে ; তখন আমরা কবিকল্পনাকে শতবার সাবাসি না দিয়া থাকিতে পারি না। ইহাই আমাদের স্বভাব। স্বভাব-গুণে ইহাকে আমরা কাব্যগুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকি। যাহা নয় তাহাকে তাহাই করাই ত বাহাদুরী—সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা—কাব্যশক্তির সুব্যক্ত প্রমাণ। দেবীযুদ্ধের কবি সেরূপ প্রমাণ প্রয়োগে ক্রটি করেন নাই। কল্পনা কৌশলে অজ্ঞাতপূর্ব্ব অসুর কাহিনীকে যেন চিরপরিচিত মানব-কাহিনীর ন্যায় সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু ইহাই তাঁহার কাব্যের মুখ্যদোষ। এই দোষে দেবাসুরের যুদ্ধ লৌকিক বর্ণে রঞ্জিত হইয়া দেবাসুরের যুদ্ধের অলৌকিকত্ব হারাইয়াছে। চণ্ডীনিহিত দেবীযুদ্ধ কাহিনী পঠিত হইবার সময়ে লোক তৎপ্রতি মনঃসংযোগ করে না ; এ "দেবীযুদ্ধ" পঠিত হইবার সময়ে লোকে উৎকর্ণ হইয়া শুনিবে ; কিন্তু ইহা দেবীযুদ্ধ, না আর কিছু তাহা বুঝিতে একটু বিলম্ব ঘটিবে। লিখিলাম রামায়ণ, লোকে তন্মধ্যে রাম-সীতা খুঁজিয়া পাইল না ;—এরূপ হইলে তাহাকে দোষ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। লিখিলাম চণ্ডী,—লোকে তাহার নাম শুনিয়া সভয়ে সসঙ্কোচে দূরে সরিয়া গেল না ; আরও কাছে ঘনাইয়া বসিয়া শ্লোকের পর শ্লোক শুনিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, গ্রন্থ শেষ হইয়া গেলে কহিল 'তারপর'—এরূপ লেখাও দোষের মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত। কিন্তু এই দোষের জন্যই "দেবীযুদ্ধ" সুখপাঠ্য হইয়াছে ; নচেৎ সেই চিরপুরাতন চণ্ডীর চণ্ডরবে কেহ কর্ণপাত করিত না।

কবি স্বদেশহিতৈষী যথার্থানুরক্ত ভক্ত সাধক। স্তোত্র পাঠ করিবার

সময়ে ভক্তের পরিচয় পাওয়া যায় ; দেবীদত্ত মন্ত্র পাঠের সময়ে স্বদেশ-হিতৈষীর পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কবিকল্পিত মন্ত্রের নাম—ত্রৈলোক্য বিজয় মন্ত্র। এই মন্ত্রের সাধনায় দেবদল কৃতার্থ হইয়াছিলেন। কবি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের দোষেই ভারতবর্ষের অবনতি হইয়াছে বলিয়া আজকাল যেমন রব উঠিয়াছে, ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিকেও দেবদল সেইরূপ তিরস্কার করিয়াছিলেন। কবি এই তিরস্কার কল্পনা করিয়া প্রসঙ্গক্রমে ব্রাহ্মণের পক্ষ হইতে একটি সুতীব্র প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে যে ব্রাহ্মণচিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহা যেন পরশুরামকে স্মরণ করাইয়া দেয় ;—

"ব্রাহ্মণ প্রস্তুত সদা করিতে সাধন
জগতের কল্যাণার্থ যে কোন ব্যাপার।
শুধু নহে মন্ত্র তন্ত্র,—জগতের হিতে
যাহা কিছু প্রয়োজন, তাই কার্য্য তার।
"অস্থিময় এই বাহু জানে অস্ত্র-খেলা ;
সমর-তাণ্ডবে পদ অনভিজ্ঞ নয় ;
এ ললাট লীলা-ভূমি কঠোর চিন্তায় ;
বিশ্ব-হিত-ধ্যানমগ্ন সদা এ হৃদয়।
প্রয়োজন উপস্থিত হইবে যখন,
কোষাকোষী ছাড়ি বাহু ধরিবে কৃপাণ ;
ক্ষুদ্র পিপীলিকাবধে আজ সে কাতর,
অনায়াসে শত্রুরক্তে করিবে সে স্নান।
যাহাতে বিশ্বের হিত তাহাই মঙ্গল ;
ব্রাহ্মণের তপোব্রত অন্য কিছু নয় ;
মঙ্গলের অন্তরায় করিতে সংহার,
ব্রাহ্মণ করুণা-হীন, নির্ভীক-হৃদয়।"

দেবী যুদ্ধের ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিকে কিন্তু কৃপাণ ধারণ করিতে হয় নাই. তাঁহার মুখের কথাই দেবদলের রাজ্যোদ্ধারে সহায় হইয়াছিল। সুতরাং সুরগুরুর সগর্ব্ব শিখাসঞ্চালন দেখিতে নিতান্ত মন্দ হয় নাই।*

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

খেদা।

(১)

"খেদা" শব্দটী ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুপ্রচলিত; কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ সম্ভবতঃ অনেকেই অবগত নহেন। ক্ষুদ্র-শক্তি মানব মদমত্ত ভীষণকায় দুর্দ্ধর্ষ বন্য হস্তিবৃন্দকে কিরূপে স্ববশে আনয়ন করেন, তাহাও বোধ করি সকলে জানেন না। বহুকাল যাবৎ আমি সমুৎসুক-চিত্তে এই বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; বহু যত্ন ও চেষ্টায় সম্প্রতি কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হইয়াছি। এক বৎসরের ঘটনা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাই এইস্থলে বিবৃত করিতেছি। আমি যে বৎসরের কথা বলিতেছি, এই বৎসর "হাতী ধরা কাজ" চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে সম্পন্ন হইবে—স্থিরীকৃত হয়। হস্তিযূথ নিবিড় অংশে বিচরণ করিয়া থাকে এবং উহাদিগকে ধরিতে হইলে যে শ্বাপদ-সমাকুল গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিতে হয়, ইহা বোধ করি কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। মানব সমাগম শূন্য অরণ্যানী মধ্যে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করা ও ধৃত বন্য হস্তী সমূহকে স্থানান্তরিত করা কিরূপ কষ্টকর ব্যাপার, তাহাও সহজেই অনুমেয়। মানুষের গমনাগমন-চিহ্ন বিরহিত হিংস্রজন্তুপূর্ণ দুর্গম অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করাও প্রাণান্তকর কার্য্য। প্রতি পাদবিক্ষেপে বাঁশ, গাছ, লতাগুল্ম কাটিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল; স্থানে স্থানে অপরিসর গিরিসঙ্কটে বৃহৎকায় পোষা হস্তীদল নিয়া যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব দেখিয়া, বহু ক্রোশ পথ ঘুরিয়া, গন্তব্য পথে পৌঁছিতে হইয়াছিল। এই প্রদেশের পাহাড়গুলি বেশী উঁচু নহে। (সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতটী মাত্র ১৫০০ ফুট উচ্চ)। তথাপি এই শৈলশ্রেণী সরলভাবে সমুন্নত বলিয়া সম্পূর্ণ দুরা রোহ। এই অনুন্নত পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া যাওয়ার সময় কখনও পর্ব্বত গাত্র কর্ত্তন করিয়া সোপানাবলী প্রস্তুত করিতে, কখনও বা সমতল করিয়া পোষা হস্তিযূথ চালাইতে হইয়াছিল। এত কষ্ট, এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এতদ্রূপ লোক-ভয়ঙ্কর অরণ্যে প্রবেশ করিলেও কিন্তু "হস্তী ধরা" ব্যাপারে কৃতকার্য্যতা লাভের কোনই নিশ্চয়তা নাই ; কারণ এ দেশীয় হাতীর দল মানুষের আগমন কোনরূপে বুঝিতে পারিলেই তৎক্ষণাৎ পলাইয়া যায়। ভীত হস্তিযূথ এক রাত্রে ৪০।৫০ মাইল পর্য্যন্ত চলিয়া যাইতে পারে ; এমন কি, পূর্ব্বদিকে চীনদেশ, দক্ষিণদিকে ষ্ট্রেইটস্ (straights) পূর্ব্বোত্তর কোণে কাছাড় গারো হিল, অধিক কি আসামের পর্ব্বত শ্রেণীতে পর্য্যন্ত যাইয়া থাকে। এই প্রদেশের হস্তীগুলি কখনও মনুষ্যমুখ দেখিতে না পাওয়ায়ই গারো বা অন্যান্য স্থানের হস্তী অপেক্ষা অধিকতর চঞ্চল ও দুর্দ্ধর্ষ। আমরা যে স্থানের কথা অদ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার অধিকাংশ রাস্তাই জন-প্রাণীর যাতায়াতের চিহ্নশূন্য এবং লোকপ্রপিতামহ ব্রহ্মার আমলের জঙ্গলে পরিপূর্ণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রতি পদে জঙ্গল কাটিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিয়া চলিতে হইয়াছিল ; মাঝে মাঝে বংশ কণ্টক সমাকীর্ণ লতাগুল্ম সমাচ্ছন্ন বনভূমি একেবারে অভেদ্য হওয়াতে

* দেবীযুদ্ধ রচয়িতা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের এক খানি প্রতিকৃতি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল।—প্রঃ সঃ

ক্ষীণ-সলিলা গিরিতটিনীর প্রতিকূল স্রোতে নামিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। ইহা ছাড়া এই স্থানের পাহাড়গুলি নীচু হওয়াতে কোনরূপ সাঙ্কেতিক সংবাদ প্রেরণ করাও অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছিল। এই পার্ব্বত্য প্রদেশে কি উপায়ে "হাতী ধরা" কাজ নির্ব্বাহিত হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণ সংক্ষিপ্তভাবে বলিতেছি।



খেদার প্রথম দৃশ্য।

সমরোন্মুখ সৈন্যের অগ্রগামী "লাইট কেভেলরির" (light cavalry) ন্যায় পদাঙ্কানুসরণকারীদল (trackers) সর্ব্বাগ্রে গমন করে। ইহাদের এক দিনের রাস্তার পশ্চাতে প্রধান শীকারীর দল ও ফিল্ড হাসপাতাল (field Hospital) থাকে। তাহাদের আবার দিনমান রাস্তার পশ্চাতে পোষা হাতী ও খাদ্য দ্রব্যাদির থাকিবার ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক শীকারীর সঙ্গে ৫ দিনের খাদ্য দ্রব্য থাকিবার নিয়ম। এই ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হইয়া ছিল না। সাঙ্কেতিক পতাকা ধারিণী(signallers)দের দ্বারা বিভিন্ন দলের মধ্যে সংবাদাদী প্রেরণ করা হইয়া থাকে। ইহাদের দ্বারাই প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ আদেশ প্রচার করিয়া থাকেন। পদাঙ্কানুসরণকারী দল বন্য হস্তিযূথের অনুসন্ধান প্রাপ্তিমাত্র এই শুভ সংবাদ পশ্চাদ্বর্ত্তী শিকারী দলকে সঙ্কেত দ্বারা জ্ঞাপন করে। তাহারাও যেই জানিতে পারে যে জঙ্গলী হাতীর দল এক স্থানে স্থির হইয়া রহিয়াছে, অমনি উহারা যথা সম্ভব সাঙ্কেতিক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই ভাবে প্রধান শীকারীদল সঙ্কেতানুরূপ হস্তিযূথের নিকটবর্ত্তী হইলেই এই হস্তিদল সম্বন্ধে অনুসন্ধান কারীদের কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হইল,—বিবেচিত হইবে। আমরা যেই বৎসরের কথা বলিতেছি, এই বৎসর অনুসন্ধানকারী দল উপর্য্যুপরি দুই তিন দিবস বিফলমনোরথ হইয়া বিশেষ যত্ন ও অনুসন্ধানের পর একটী প্রকাণ্ড যূথ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ সাহেব ও প্রধান জমাদার শীকারী আনোয়ার আলি প্রায় দুই কি আড়াই হাজার লোক সহ তৎক্ষণাৎ অগ্রগামী হইয়া চলিয়া গেলেন। পরে অন্যান্য লোকজন "কুন্‌কী" হাতী সহ যথাসম্ভব দ্রুত গমনে তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছিল। (এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, খেদা কার্য্যের জন্য শিক্ষিত পোষা হাতীকে "কুন্‌কী" হাতী বলে।) তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া দেখিল যে প্রায় চারি পাঁচশত হাতীর একটী প্রকাণ্ড বেষ্টন করা হইয়াছে। হস্তিযূথ বেষ্টন করিবারও একটা রীতি আছে। প্রদীপের পাঠক পাঠিকাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সংক্ষেপে তাহাও বলা যাইতেছে।

শিক্ষিত কার্য্যপটু শিকারী দল হস্তিযূথকে এইরূপে কৌশলক্রমে চালনা করে যে, যে স্থলে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য ও জল আছে,—সেই স্থানে তাহারা উপস্থিত হয়। বেষ্টন ঘেরাও করিবার পক্ষে ইহা অতি গুরুতর বিবেচ্য বিষয়, কারণ, হস্তিদলকে যত দিন এই স্থানে আবদ্ধ রাখা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহার মধ্যেই যদি জল ও খাদ্যের অভাব হয়, তবে নিশ্চয়ই হস্তিযূথ বেষ্টন ভাঙ্গিয়া পলাইয়া যাইবে। সুতরাং হস্তিযূথ উপযুক্ত স্থানে উপনীত হওয়া মাত্রই ক্ষিপ্রকারী শিকারী দল বেষ্টনবৃত্ত সঙ্কুচিত করিতে থাকে, এবং বিভিন্নদল যেমন নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, অমনি প্রত্যেক শিকারী নিজের ও পশ্চাদ্বর্ত্তী মানুষের মধ্যস্থিত জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ফেলে; এই প্রকারে যে স্থলে হস্তিযূথ থাকে তাহার চতুর্দ্দিকে বেশ প্রশস্ত রাস্তা প্রস্তুত হয়। এইরূপে বেষ্টন কার্য্য (ঘের) সম্পূর্ণ সম্পাদিত হইলে এই পথের স্থানে স্থানে লোক রাখা হয়। তাহাদের জন্য ক্ষুদ্র এক এক খানা ঘাসের ঘর প্রস্তুত করে। এই ঘরের সম্মুখভাগে রাত্রিকালে অগ্নি জ্বালিয়া রাখে; কারণ হাতী আগুনকে অত্যন্ত ভয় করে। রাত্রিতে দুই তিনজন ও দিবাভাগে একজন মাত্র প্রহরী ঐ স্থানে পাহারা দেয়, উহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে এক একটী পুরাতন বন্দুক এবং

বেটল্ থাকে। হাতী বেষ্টনবৃত্তের নিকটবর্ত্তী হইলেই প্রত্যেকে তুমুল শব্দে দিগন্ত কম্পিত করিতে থাকে। এইরূপ অগ্নি ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে হাতীর দল বেষ্টন ভাঙ্গিয়া পলাইয়া যায়; কিন্তু এরূপ ঘটনা কদাচিৎ ঘটে। বেষ্টন বৃত্তের পরিধি কখনও কখনও ১২। ১৩ মাইল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।



খেদা প্রস্তুতকারী কুলীগণ।

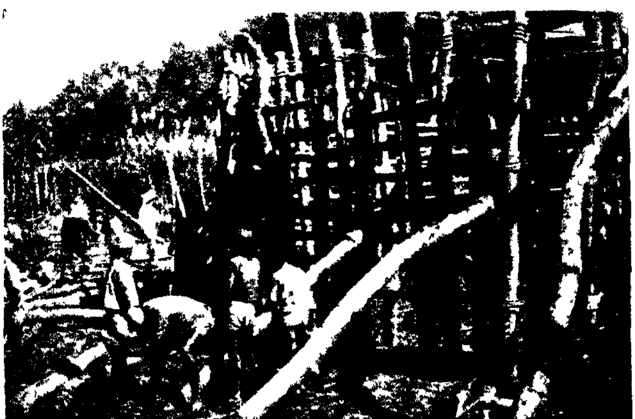
ড্রাইবের (drive) এর সময় কৌশল ক্রমে হস্তী চালনা কি সুবৃহৎ ব্যাপার, তাহা ইহা হইতেই উপলব্ধি হয় না কি? আমরা যে বেষ্টনের কথা বলিতেছিলাম, এই বেষ্টনাবদ্ধ মদমত্ত হস্তিযূথ লতা গুল্মাদি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া বৃক্ষ ও চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত দ্রব্যাদি একেবারে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করিয়া, বেষ্টন ভাঙ্গিয়া পলাইয়া যায়। কিছু দিন পর্য্যন্ত এই বন ভূমিব সর্ব্বস্থলেই—হাতীর গভীর পদচিহ্ন বর্ত্তমান ছিল। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল, ঘাস ও জলের একান্ত অভাবই হস্তিযূথের পলায়নের কারণ। এই ঘটনায় বহুদর্শী কার্য্যাধ্যক্ষ পশ্চাৎপদ না হইয়া বরং অধিকতর উৎসাহে অনুসন্ধানকারী দলের সহিত পশ্চাৎ পশ্চাৎ ১৫০ মাইল গিয়াছিলেন। অবশেষে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কার্য্যাধ্যক্ষ এই দলের সাক্ষাৎ পাইলেন। সকলেই অনুমান করিয়াছিলেন, এখন এই দলে ১০০ কি ১৫০ হাতী বর্ত্তমান আছে, কিন্তু পরিশেষে জানা গিয়াছিল যে, ঐ দলে ২০৩টি হাতী ছিল। এবার সকলেই বিশেষ মনোযোগ ও পরিশ্রমের সহিত হাতীর দল চালনা করিতে লাগিলেন। উঁহাদিগের কার্য্যকুশলতায় হস্তিদল অবিলম্বেই এক উপযুক্ত স্থানে যাইয়া বেষ্টনে আবদ্ধ হইল। এইবারের বেষ্টনবৃত্তটী (ঘের) ৭০ বর্গ মাইল হইয়াছিল। এইরূপে বেষ্টনকার্য্য সুসমাপিত হইলে প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ এই বৃত্তের মধ্যে কোথায় "খেদা" প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা ঠিক করিলেন।

"খেদা" শব্দের অর্থ খোঁয়াড় বা ফাঁড়ী। ৮ হইতে ১০ ইঞ্চ ব্যাসের খুঁটী দ্বারা বৃত্তাকারে ইহা নির্ম্মাণ করিতে হয়। প্রত্যেক খুঁটীর ৫ ফুট কিম্বা ততোধিক অংশ মৃত্তিকার উপর ও ১২। ১৪ ফুট উঁচু থাকিবে। খোয়াড়ের ভিতর ও বাহির এইরূপ স্থূল স্থূল সারবান্ বৃক্ষদ্বারা বেড়ার মত শক্ত দড়ি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। খেদার কাজ এইরূপে সম্পন্ন করাই নিতান্ত আবশ্যক, কারণ বলশালী আরণ্য হস্তী সমূহ খেদার মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া অত্যন্ত বল প্রকাশ করিয়া থাকে। খেদার ফটক (Gate) প্রস্তুত করা বিশেষ নিপুণতা-সাপেক্ষ। আমরা যেটীর কথা বলিতেছি, তাহা বহুদর্শী কার্য্যাধ্যক্ষের আবিষ্কৃত; এবং অলৌকিক কৌশলে পরিপূর্ণ। উহা এইরূপে গঠিত হইয়াছিল যে, সর্ব্বশেষ হাতীটি খেদার মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রই গেট্ পড়িয়া যাইত। সর্ব্বদা ব্যবহারের জন্য এই গেটটি শক্ত দড়ি দ্বারা ঝুলাইয়া রাখা হয়, এবং সঙ্কেতধ্বনি হওয়া মাত্র লোকেরা



খেদা নির্ম্মাণ—১ম দৃশ্য।

তীক্ষ্ণধার কুঠারী দ্বারা এই দড়ি কাটিয়া দিয়া থাকে। দড়ির যে অংশ কাটিতে হইবে, তাহা একখণ্ড কাষ্ঠ ফলকের উপর এরূপ ভাবে সংস্থিত থাকে, যেন এক আঘাতেই দড়ি কাটিয়া যায়। অসাধারণ বলশালী ৫০ জন পাহাড়ী তাহাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া গেটটি উপরে উঠাইয়া ছিল, ইহাতেই সম্ভবতঃ সে গেটটি কিরূপ দৃঢ় ও ভারবিশিষ্ট ছিল, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। ফটকের নিকটস্থ খেদার অংশ খুব শক্ত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। কারণ, এই স্থানটি এইরূপ সঙ্কীর্ণভাবে গঠিত যে, দুইটি হাতী পাশাপাশি কোনরূপে যাইতে পারে, সুতরাং অন্যান্য হাতীগুলি অত্যন্ত ভীত ও উত্তেজিত হইয়া ভয়ঙ্কর ভিড় করে। যে খেদার বিষয় এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে, তাহা ৪৯০০ বর্গফুট্ পরিমাণ হইবে। ২০০ শত হাতীর পক্ষে এই স্থানটুকু বেশী বলিয়া বোধ না হইতে পারে; কিন্তু একটু অপরিসর স্থান রাখাই বাঞ্ছনীয়, কারণ বিস্তৃত স্থানে বেগ দেওয়ার (speed নেওয়ার) অবকাশ পাইলে হাতীরদল আক্রমণের (charge করিবার) সুবিধা লাভ করিতে পারে।



খেদা নির্ম্মাণ—২য় দৃশ্য।

খেদা নির্ম্মাণের সময় সমস্ত কার্য্য অতি নীরবে সাবধানতার সহিত করিতে হয়, কারণ হাতীর ঘ্রাণ ও শ্রবণ-শক্তি প্রত্যন্ত প্রখর। ঘূণাক্ষরে একটু টের পাইলেই শীকারীদের সমস্ত কৌশল-জাল ছিন্ন করিয়া উহারা পলায়ন করিয়া থাকে। খেদা ভাগে ভাগে প্রস্তুত করিতে হয়। প্রত্যেক ভাগের জন্য বহু লোক নির্দ্দিষ্ট থাকে। কতক লোক বহুদূরে খেদার গেট্ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হয়। তিন চারি হাজার সারবান বৃক্ষ এক মাইল দূরে খেদা কার্য্যের জন্য নীত হইয়া থাকে। গারো পাহাড়ের বা অন্যান্য স্থানের বলবান্ মজুরেরা কাঁধে করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে নেয়, এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে বৃক্ষগুলি কাটিয়া খেদা-স্থলে আনয়ন করিয়া থাকে। কুলী মজুরদের কার্য্য-তৎপরতার কথা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, এই সুদৃঢ় ও সুবৃহৎ খেদাটি ১২।১৩ ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল। এই সকল ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিলে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যেরূপ দ্রুত ভাবে ও কৌশল ক্রমে এই সকল মোটা ও ভারী গাছগুলি যথাস্থানে নিঃশব্দে আনীত ও নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা বস্তুতঃই বিস্ময়কর কার্য্য। খেদার কার্য্য সমাপ্ত হইলেই ফানেল (funnel) এর কার্য্য আরম্ভ হয়। গেট হইতে আরম্ভ করিয়া ফানেল (funnel) টি আবশ্যক মত লম্বা করিতে হয়। ইহা যে স্থলে খেদার সহিত মিলিত হয়, সে স্থানের ফানেলও (funnel) গেটের ন্যায়ই সঙ্কীর্ণ ভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাহিরের মুখের দিকে ক্রমশঃই অধিকতর প্রশস্তরূপে গঠিত হয়। যে ফানেল (funnel) টির বিবরণ এ স্থলে প্রদত্ত হইতেছে, তাহা আধ মাইল লম্বা ও মুখের নিকট ৫০ গজ প্রশস্ত ছিল। ফানেল (funnel) টিও খেদার মত খুঁটি দ্বারা নির্ম্মিত হয়, কিন্তু ফটকের নিকটবর্ত্তী অংশ ছাড়া অন্যান্য ভাগ খেদার মত শক্ত ও মজবুত নহে। খেদা ও ফানেল (funnel) এর নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে সমস্ত অংশই জঙ্গলে ঢাকিয়া দেওয়া হয়। খেদার মধ্যস্থিত জঙ্গল রাশি একেবারেই অকর্ত্তিত থাকে। হাতীর দলকে ভুলাইবার জন্যই এইরূপ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক; তাহারা যখন জঙ্গলবেষ্টিত ফানেল (funnel) দিয়া দৌড়িয়া যায়, তখন যেন মনে করে যে তাহারা কোনও রূপ ফাঁদে না পড়িয়া গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিতেছে। যে খেদা বর্ণিত হইতেছে, উহা জঙ্গল দিয়া এরূপ সুন্দর ভাবে সাজান হইয়াছিল যে, ফানেল (funnel) এর মধ্যে দাঁড়াইলে উহা নিবিড় বন পরিশোভিত "নিকুঞ্জকানন" (wood land glade) বলিয়াই প্রতীত হইত। একগাছি দড়ি কিম্বা

একটীও খুঁটি নয়ন পথে পতিত হয় নাই। এখন হস্তিবৃন্দের প্রকৃত উত্তেজনা ও বিপদাশঙ্কা আরব্ধ হইল। প্রত্যেক ড্রাইভ পরস্পর বিভিন্ন, তাহার যথাযথ বিবরণ বারান্তরে বর্ণনা করিব, বাসনা রহিল।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

বসন্ত।

কে তুমি লো বিধুমুখি, এ বন বিজনে বসি।
আলু থালু কলেবর, আনত আনন-শশী,
নয়ন-কমল-স্মিতে, মাধুরী উথ'লি উঠে,
চারি দিকে থরে থরে অমল কুসুম ফুটে;
ঘনকৃষ্ণ বিকুঞ্চিত অদমিত কেশ-ভারে—
বিজড়িত ফুল-দাম চির-পীত-লতা-হারে।
একাকিনী, রূপরাণি, কেন এ বিজন-বনে।
কি দেখিছ একমনে অনিমিষ-বিলোচনে!
দারুণ-হিমাণী-শেষে এ কুসুম উপবনে
বসন্তের রাণী রূপে এসেছ কি বরাননে?
তোমার পরশে তাই ফুল-হীন বনতল—
সোহাগে সাজিল দেখ ফুল-জালে অবিরল;
সুরভিত সুকোমল তোমার কোমল-শ্বাসে
মলয় অনিল বয় নব চুত ফুল বাসে;
আনন্দে কোকিল কুজে, গুঞ্জরিয়া অলি দল—
কি মধুরে মুখরিত করিয়াছে বনতল।
এ আনন্দ-দিনে তবে বদন মলিন করি,
নমিত নলিন আঁখি কি দেখিছ রূপেস্বরি!
কোমল কমল-করে গতজীব বিহঙ্গমে,
উরসে চাপিয়া কেন রাখিয়াছ মনোরমে?
আজি তুমি সুধাময় কর-পদ্ম-পরশনে
জাগাইলে সুধাশ্বাসে এ অখিল অচেতন;
বল, দেবি, কেন তবে অই ক্ষুদ্র বিহঙ্গম
জগতে রহিবে আজি প্রাণ হীন অচেতন!
চপল হরিনাপাঙ্গে অচপলে এক মনে
তাই কি গো ভাবিতেছ তুমি, ইন্দুনিভাননে!
মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রী তুমি দেবী অমরার,
নিশ্বাসে নয়নে তব ঝরে সুধা অনিবার;
আজি অই গত-প্রাণ অচেতন বিহঙ্গমে
পারিবে কি বাঁচাইতে সেই সুধা-পরশনে?

শ্রীহরিশ্চন্দ্র নিয়োগী।

কঙ্কণ চোর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

সন্ন্যাসিনী অটল অচল। তাঁহার প্রতিজ্ঞা টলিল না। রজনীর একটী পূর্ণ যাম সময়ের মধ্যে নানাবিধ তোষামোদ ভয় প্রদর্শন করিয়াও প্রাড়্বিবাক কিছুই করিতে পারিলেন না। তিনি অনন্যোপায় হইয়া সেই গভীররাত্রে আবার গৃহে ফিরিলেন।

রজনীর অন্ধকার, শ্যামল প্রকৃতির শ্যামলসুন্দর সৌন্দর্য্য গ্রাস করিয়াছে। প্রাড়্বিবাক রাজপথ অতিবাহিত করিতে করিতে দেখিলেন—সে দিনের অন্ধকার যেন প্রলয়ের পূর্ব্ব সূচনা প্রকাশ করিতেছে। এত কালো, গভীর মিশ্‌মিশে অন্ধকার, তিনি যেন আর কখনও দেখেন নাই। আকাশে তারা জ্বলিতেছে। চাঁদ নাই, অন্ধকাররাশিই আধিপত্য করিতেছে। কেবল দূরে অদূরে—অতিদূরে, অনতিদূরে—ক্ষণে জাজ্জ্বল্যমান, ক্ষণে নিষ্প্রভ, ক্ষণে জ্যোতির্ম্ময়, ক্ষণে জ্যোতি-হীন তারকারাজি। এই নক্ষত্র কিরীটিনী যামিনীর নৈশ সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রাড়্বিবাক আগে কতই মোহিত হইতেন। হায়! আজ আর তাঁহার সে মোহ নাই। সে নৈশ সৌন্দর্য্য ভোগপ্রবৃত্তি নাই।

প্রণিধি পশ্চাৎ পশ্চাৎ মৌনাবলম্বন করিয়া আসিতেছিলেন সহসা অন্ধকারের মধ্য হইতে একজন দীর্ঘকায় লোক বাহির হইয়া প্রাড়্বিবাকের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। প্রাড়্বিবাক চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"কে তুমি?" সেই ছদ্মবেশী আগন্তুক বলিল—"আপনি এই বিস্তৃত মগধ রাজ্যের প্রাড়্বিবাক। মহাকালের মন্দির হইতে ফিরিতেছেন। আপনাদের বড়ই ভাবনা হইয়াছে। মনের শান্তি গিয়াছে। রাণীর মহল হইতে কি চুরি গিয়াছে—তাই আপনারা বড় ব্যতিব্যস্ত।"

প্রাড়্বিবাক চমকিত হইলেন। তাঁহার বিস্ময় বাড়িয়া উঠিল। অন্ধকারের আবরণে শরীর ঢাকিয়া, প্রকাণ্ড

রাজপথে, একজন অপরিচিত আগন্তুক তাহার মনের কথা আদ্যোপান্ত বলিয়া যাইতেছে! প্রাড়বিবাক ভাবিলেন—"নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি কোন মহাপুরুষ। অন্তরের কথা জানিবার ক্ষমতা আছে।"

প্রাড়বিবাক সেই অন্ধকারে অপরিচিতের পদযুগল ধরিতে গেলেন। আগন্তুক সরিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"অতটার প্রয়োজন নাই। আমি মহাপুরুষ নহি, বা অদ্বিতীয় লোক নই। তবে আপনার একটু উপকার করিব। আপনি নিজের প্রাণের চিন্তায় বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন—না? আমি আপনাকে প্রবুদ্ধ করিতে আসিয়াছি।"

প্রাড়বিবাক আরও চমকিয়া গেলেন। এ সব কি? চারি দিকেই ভীষণ প্রহেলিকা! পদে পদেই অদ্ভুত ঘটনার আবির্ভাব। তিনি কাতরকণ্ঠে বলিলেন—"আমি এই রাজ্যের প্রাড়বিবাক। ধর্ম্মাধিকারের প্রধান কর্ম্মচারী। আমার অঙ্গুলি হেলনে এত বড় মগধ সাম্রাজ্য চলিতেছে। আমি কাতর মুখে আপনার পায়ে ধরিতেছি—যদি কিছু জানেন ত বলিয়া দিন।"

সেই ছদ্মবেশী আগন্তুক বলিলেন—"মহাশয়! তাহা বলিবার জন্যই এই গভীর রাত্রে পথিমধ্যে আপনাকে ধরিয়াছি। আপনারা চোর ধরিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। চেষ্টা করিয়াও চোর ধরিতে পারিবেন না। চোর প্রকাশ্য রাজসভায় কাল উপস্থিত হইবে।"

সেই এক কথা!! চোর যা বলিয়া পত্র দিয়াছে—সে কথাও যা, আর এই নিশাচারী, অদ্ভুত আগন্তুক যা বলিল এও ত তাই! প্রাড়বিবাক মহাসমস্যায় পড়িলেন। মাথা নীচু করিয়া কি ভাবিলেন।

মুখ তুলিয়া দেখিলেন—সে আগন্তুক মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়াছে। হায় ভাগ্য!

(৩)

রাজা প্রাণের জ্বালায় রাজবাটী ত্যাগ করিলেন। তাঁহার চক্ষে তখন সেই উষালোকে প্রজ্বলিত, প্রদীপ্ত কিরণ-রাজিপূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন অন্ধকারময়। সমগ্র বিশ্বকেন্দ্র যেন মহাবেগে ঘুরিতেছে। রাজপুরীর প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ যেন অনলের তাপসঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্ব রাত্রে রাজপুরীর মধ্যে যে একটা সুখ, স্বচ্ছন্দ, আনন্দ, উল্লাস, প্রমোদস্রোত ছিল, তাহা আর নাই।

রাজার মনের অবস্থা এরূপ পরিবর্ত্তিত হইবার কারণ ছিল। সে কারণ গুলি ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে। মনে যাহার সুখ আছে, সে-ই জগৎকে সুখময় দেখে। সুখ হৃদয়ের মধ্যে, বাহ্য জগতে সুখ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। প্রাণের নিবিড় স্তরস্থিত একটা তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা আগে প্রাণটাকে তৃপ্ত করিলে, তবে বাহিরের জগৎ সুখময় বলিয়া বোধ হয়। প্রাণের মধ্যে তৃপ্তি না থাকিলে, বাহ্য জগতের কিছুই সুখময় নহে। রাজা মহানন্দের তা নাই।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। সমগ্র ধরা জ্যোৎস্নাপ্লাবিত। তরঙ্গিণীর তরল সলিলধারা, চাঁদের কিরণে রজতময় দেখাইতেছে। ধীরে ধীরে মলয়, সেই চন্দ্রালোকিত রজত-ধারা চুম্বন করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। পাপিয়া কোথা হইতে এক নিবিড় পল্লবাবৃত বৃক্ষের শাখায় শরীর লুকাইয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। কোকিলও অবসর বুঝিয়া, তান ধরিল। পাপিয়ার কাতরধ্বনির সহিত কোকিলের বিলাসস্মৃতি পূর্ণ পঞ্চমের রাগ মিশিল। তোমার প্রাণে সুখ নাই, হৃদয়ে দাবানল জ্বলিতেছে। প্রকৃতির এ অনমুভবনীয় স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য তোমার চক্ষে অতি তিক্ত বলিয়া বোধ হইবে। জগতের শত সহস্র লোক, শত সহস্র স্থানে সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভুলিল, মজিল, প্রাণটাকে অতি সুখময় জ্ঞান করিল; কিন্তু তুমি? তুমি হৃদয়ে অনন্ত জ্বালা লইয়া জগৎ ও প্রকৃতিকে অভিসম্পাৎ করিলে! তাই বলিতেছিলাম সুখ প্রাণে, বাহ্য প্রকৃতিতে নহে। সুখ হৃদয়ে, বহির্জ্জগতে নহে। বহির্জ্জগতের যা কিছু ভোগ্য, তাহা প্রাণের আকাঙ্ক্ষার অনুসারী হইলেই সুখ হয়।

মন্ত্রণা সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া রাজা অশ্বপালকে অশ্ব আনিতে বলিলেন। উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় মদোন্মত্ত তুরঙ্গরাজ বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত হইয়া তোরণের মধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা বাহিরে আসিলেন। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। ধীরে ধীরে অশ্বে উঠিলেন। তোরণের উপর—রাজার সম্বর্দ্ধনার জন্য নহবৎ বাজিয়া উঠিল। রাজা পরুষকণ্ঠে বলিলেন—"বাদ্য থামাইয়া দাও—বড় তিক্ত! বড় বেসুরা।" নহবৎ তখনই বন্ধ হইল।

অশ্বারোহণে মহারাজ মহানন্দ, বিলাসকাননের দিকে চলিলেন। দুইজন শরীররক্ষী পশ্চাতে আসিতেছিল। রাজা তাহা এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নাই। সহসা পশ্চাতে

দৃষ্টি করিলেন। বলিলেন—"তোরা কোথায় যাইতেছিস্" ? তাহারা মস্তক অবনত করিয়া বলিল "মগধেশ্বরের রাজলক্ষ্মী অচলা হউন। মহারাজ একাকী চলিয়াছেন, তাই আমরা সঙ্গে যাইতেছি।"

রাজা রোষকষায়িত নেত্রে তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। বলিলেন—"কে তোদের হুকুম দিয়াছে ?" একজন প্রহরী বলিল—"মহারাজের আদেশের অপেক্ষা করি নাই। আমরা কর্ত্তব্য করিতেছি।"

রাজা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে মুখ ফিরাইয়া তাহাদের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তাহারা বুঝিল, মহারাজের মস্তিষ্কে কোনরূপ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। নচেৎ এরূপ ঘটিবে কেন ? প্রহরীরা প্রস্থান করিবার উপক্রম করিল।

বাস্তবিকই মহারাজ মহানন্দ, সেই অমিত তেজশালী মগধেশ্বর, তখন একটু বিকৃতমস্তিষ্ক। তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, প্রহরীরা তাঁহার তাড়া খাইয়া রাজপুরীর পথ ধরিতেছে। তিনি তাঁহাদের আবার ডাকিলেন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া আবার অভিবাদন করিল। মগধেশ্বর গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করিলেন—"তোমরা আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হও।"

প্রহরীরা একটু যেন আশ্চর্য্য হইল। কিন্তু তাহারা কঙ্কণ চুরির ব্যাপার শুনিয়াছিল। বুঝিল, এই ঘটনায় তাহাদের প্রভুর—এই সুবিস্তৃত মগধরাজ্যেশ্বরের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। কাজেই তাহারা রাজার নূতন আদেশ পালনে কোনরূপ বিস্ময় দেখাইল না।

মগধেশ্বর বুঝিলেন—প্রহরীদের নিষেধ করিয়া তিনি একটা ভ্রম করিয়াছেন, এরূপ ভ্রম আর করিবেন না।

মহারাজ অশ্বকে সস্নেহে করাঘাত করিয়া বলিলেন—"জয়কেতু—তোমার সে উন্মদ গতি কই ? আজ তুমিও কি আমার দুঃখে বিকল ও শক্তিহীন ?"

অশ্ব প্রভুর মনের কথা যেন বুঝিল। সেই নির্ব্বাক, ভাষাহীন, জ্ঞানশূন্য পশু যেন সংস্কার বশে বুঝিল, মহারাজা তাহার মৃদুগতিতে অপ্রসন্ন হইয়াছেন। আবার সে বিদ্যুৎ বেগে ছুটিল।

রাজপথে আর এক নূতন ঘটনা। দুইজন কোতোয়াল এক চোরকে বাঁধিয়া লইয়া চলিয়াছে। প্রতিদিন এমন কত ঘটনাই হয়। রাজার চক্ষে যে না পড়ে, এমন নয়। সে দিন মহারাজ সহসা অশ্বের বল্গা সংযত করিলেন। যাহারা চোর ধরিয়া আনিতেছিল, তাহারা সহসা মগধেশ্বরকে অশ্ব পৃষ্ঠে তাহাদের সম্মুখে দেখিয়া যেন একটু বিস্ময়ান্বিত হইল।

রাজা বলিলেন—"তোমরা উহাকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছ কেন ?"

একজন প্রহরী মহারাজকে প্রণাম করিয়া বলিল "মহারাজ! এ ব্যক্তি এক শ্রেষ্ঠীর যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে।"

রাজা আগ্রহের সহিত বলিলেন—"প্রমাণ পাইয়াছ ?" প্রহরী বলিল—"যথেষ্ট প্রমাণ আছে—মহারাজ।"

চোর মহারাজের সম্মুখীন হইয়া অভিবাদন করিয়া বলিল "মহারাজ! সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব। প্রহরীরা আমাকে বৃথা সন্দেহ করিতেছে। পীড়ন করায় আমি স্বীকার করিয়াছি।"

মহারাজ মহানন্দের মনে কঙ্কণচুরির ব্যাপারটা আবার জাগিয়া উঠিল। আবার সেই প্রকৃতিস্থ, সংযম-প্রশমিত সৌন্দর্য্যগম্ভীর মুখমণ্ডল, ক্রোধে লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। অন্য সময়ে এরূপ আবেদনে চোর হয়তঃ মুক্তিলাভ করিত, কিন্তু মহারাজ সে দিন গম্ভীরকণ্ঠে আদেশ করিলেন—'এ নিশ্চয়ই চোর মগধে এত লোক থাকিতে এ হতভাগ্য শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল কেন ? ইহাকে শূলে দিব। এখন কারাগারে লইয়া যাও।"

যে প্রহরীরা চোরকে ধরিয়া আনিতেছিল, তাহারা মহারাজের আদেশে একটু স্তম্ভিত হইল। মগধেশ্বরকে তাহারা কখনও এত নির্দ্দয় দেখে নাই। তাহারা মনে মনে ভাবিল, মহারাণীর কঙ্কণচুরি ব্যাপারে মহারাজ অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। প্রহরীর মধ্যে একজন একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—"রাজরাজেশ্বর! অধীনের স্পর্দ্ধা মার্জ্জনা করিবেন। রাজাদেশ পালনে এ দাসেরা সর্ব্বদাই অগ্রসর। কিন্তু এই হতভাগ্যের প্রতি যে ব্যবস্থা করিলেন—তাহা পালিত হওয়া অসম্ভব।"

মহারাজ স্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন—? এ কথা বলিতেছ কেন ? রাজাদেশে চোর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। তাহাতে আপত্তি কি ?"

প্রহরী করজোড়ে বলিল—"এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ—অবধ্য।"

রাজা আরও রাগিয়া উঠিলেন। দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া রূঢ়স্বরে বলিলেন—"আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য। ব্রাহ্মণ

কখনও হয় নাই, আজ তাহা হইতে বসিয়াছে। রাজান্তঃপুর হইতে মহারাণীর অলঙ্কার চুরি—ব্রাহ্মণের দ্বারা শ্রেষ্ঠীর যথা-সর্ব্বস্ব অপহরণ, আশ্চর্য্য কথা! ব্রাহ্মণ যদি চোর হয়, তবে রাজাদেশে সে বধের যোগ্য। তোমরা ইহাকে কারাগারে লইয়া যাও। প্রাণদণ্ডই ইহার উপযুক্ত দণ্ড।”

সেই প্রহরী বলিল—“সহস্র অপরাধেও যে ব্রাহ্মণ অবধ্য মহারাজ! আমরা কর্ত্তব্য পালনার্থে ইহাকে ধরিয়াছি। আপনার আদেশেই ত রাজ্য মধ্যে ব্রাহ্মণের জন্য স্বতন্ত্র কারাগারের ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-চোর ইতিপূর্ব্বে আরও ধরা পড়িয়াছে। মহারাজ ত তাহাদের ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।”

রাজা কি ভাবিলেন। তাঁহার মনটা যেন তখন একটু প্রকৃতিস্থ। কিন্তু সে অবস্থাটা শীঘ্র অন্তর্হিত হইল। রাজা অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া বলিলেন—“এখন তোমরা ইহাকে কারাগারে রাখ। পরে যথামত ব্যবস্থা করিব।”

অশ্ব দ্রুতবেগে ছুটিল। অদূরে ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরিস্থ বিলাস কাননের শুভ্র, উন্নত তোরণ দেখা যাইতেছে। তাহার উপর পতাকা উড়িতেছে। বিলাসকানন, রাজার গুপ্ত প্রমোদগৃহ। সাধারণ লোকে জানিত, এখানে অন্তঃপুরিকা মাত্র নাই। কেননা, বিলাস কাননের পথে কোন পান্থের চলিবার আদেশ ছিল না। পথের মধ্যে মধ্যে প্রহরীর আড্ডা। রাজাদেশে তাহাতে সাধারণের চলাচল নিষিদ্ধ। কেবল রাজকর্ম্মচারী, রাজদূত, রাজসেনা তাহারাই প্রয়োজন হইলে এই পথে আসিত।

আরও কিয়দ্দূর আসিবার পর আর এক নূতন দৃশ্য রাজার চক্ষে পড়িল। মগধেশ্বর অশ্ববল্গা সংযত করিলেন। দেখিলেন—প্রধান কোতোয়াল একটী স্ত্রীলোককে কঠিন প্রহরার মধ্যে লইয়া চলিয়াছে। রাজা অশ্ব থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“একি ব্যাপার?”

প্রধান চৌরোদ্ধরণিক প্রণাম করিয়া বলিল, “মহারাজ! এই স্ত্রীলোক সদ্বংশোদ্ভূতা, কিন্তু কুলটা। ইহার স্বামী ইহার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া ইহাকে এক দিন তিরস্কার করে। সেই ক্রোধে এই কুলটা, বিষপত্র-রস-নিষিক্ত করিয়া নিদ্রিত স্বামীর কর্ণে ঢালিয়া দেয়। ইহার স্বামী এখন মুমূর্ষু অবস্থায়।”

ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় রাজা গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। তিনি সেই স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“নারী! এ কার্য্য তোমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে! তুমি স্বামীহত্যা করিতে বসিয়াছিলে?”

সেই স্ত্রীলোকের মন তখন অনুতাপবিদগ্ধ। স্বয়ং মগধেশ্বর যখন প্রশ্ন করিতেছেন—তখন অস্বীকার করাটা তাহার পক্ষে অসম্ভব বোধ হইল। সেই স্ত্রীলোক অবনতজানু হইয়া করযোড়ে বলিল—“রাজ্যেশ্বর! আমার স্বামী আমায় বড় ভাল বাসিতেন। কিন্তু হায়! আমি কালসাপিনী। তাঁহার পবিত্র প্রেম উপেক্ষা করিয়া, ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, আমি নরকে ডুবিয়াছি। রাজন্! আমার মৃত্যু ব্যবস্থা হউক।” রাজা কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে কি ভাবিয়া বলিলেন—“তাহাই হইবে। এ রাজ্যে স্ত্রীহত্যা পাতক কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু তোমার ন্যায় কুলকলঙ্কিনীর জন্য তাহাও করিতে হইবে। কিন্তু আমার মতে স্বামীঘাতিনীর প্রাণদণ্ড করিলে তাহার উপকার করা হয়। অনুতাপই তোমার উপযুক্ত দণ্ড। কাল বিচার করিয়া যা হয় করিব।”

এই স্ত্রীলোকের পশ্চাতে আর একটী যুবক দুই হস্ত আবদ্ধ অবস্থায় নীত হইতেছিল। যুবক অতি সুন্দর ও সুশ্রী, মুখ দেখিলে মায়া হয়। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—“এ কে?” প্রধান চৌরোদ্ধরণিক বলিল—“মহারাজ! এই যুবক এই রমণীর জার। এই স্ত্রীলোক অভিসারিকা হইয়া, ইহার সৌন্দর্য্য বহ্নিতে ঝাঁপ দিয়াছিল। এই যুবকের পিতা অশীতিপর বৃদ্ধ। পুত্রের মতিগতি জানিতে পারিয়া তিরস্কার করে। এই কামলোলুপ যুবক সেই বৃদ্ধের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে দণ্ড প্রহারে বধ করিয়াছে।”

রাজা কোষ হইতে তরবারি উন্মুক্ত করিলেন। সেই প্রদীপ্ত সূর্য্যালোকে তরবারি ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। সকলেই প্রমাদ গণিল। সকলেই ভাবিল—এ অপরাধের বিচার বুঝি হাতে হাতেই হইয়া যায়। রাজা বলিলেন—“এ ব্যক্তিকে এই তরবারি বিদ্ধ করিয়া এখনই বধ করিব!”

প্রধান চৌরোদ্ধরণিক রাজপথে এক মহা-অনর্থ সংঘটিত হয় দেখিয়া যুক্ত করে জানু পাতিয়া বলিল—“মহারাজার ন্যায় ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি আরও দৃঢ় হউক। এ ব্যক্তি অপরাধী, কিন্তু রাজ অসি ইহার অপবিত্র রক্তে কলঙ্কিত হওয়া যে

লজ্জার কথা। প্রজারা কি বলিবে ?" রাজা প্রকৃতিস্থ হইলেন। গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করিলেন—"ইহাকে নদীতীরস্থ ভূগর্ভ-নিহিত কারাগারে অনশনে রাখিয়া দাও। ধর্ম্মাধিকরণকে বলিও, আজ যাহা যাহা আমার চক্ষে পড়িয়াছে, সে গুলির বিচার আমি নিজেই করিব।"

অশ্ব একেবারে মহারাজকে বিলাস কাননের প্রকাণ্ড তোরণের সম্মুখে আনিয়াছে। তোরণদ্বার লোহময়। রাজার আগমন সংবাদে প্রহরীরা আগেই তাহা উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। মগধেশ্বর অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার মুখ হইতে অস্ফুটস্বরে উচ্চারিত হইল—"যে রাজ্যে ব্রাহ্মণ চোর, পুত্র পিতৃঘাতক ও সতী কুলত্যাগিনী, সে রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী। হায়! গুরুদেবের বাক্য কি শেষে সত্য হইল! মুরলা! মুরলা! সর্ব্বনাশী—"

(৪)

দুই তিনটী কক্ষ উত্তীর্ণ হইয়া মহারাজ এক নীলকান্ত মণি খচিত—স্বর্ণমণ্ডিত কক্ষতলে দাঁড়াইয়া—কম্পিত স্বরে ডাকিলেন—"তড়িতা—তড়িতা"!

কাতর সম্বোধনে—রুদ্ধোচ্ছ্বাসে, আবেগপূর্ণ হৃদয়ে—মগধেশ্বর যাহাকে ডাকিলেন, সে আসিল।

সে তড়িতা। তড়িতা কে আমরা জানি না। লোকে জানে না। রাজপুরীর অন্তঃপুরিকারাও জানে না। তড়িতার দাসীরাও জানে না। মহারাণী মুরলাও জানেন না। জানেন কেবল মগধেশ্বর। আর জানে কেবল তড়িতা।

তড়িতা দ্রুত আসিয়া আভূমি প্রণত হইয়া মহারাজকে প্রণাম করিল। সেই হৃত্তোৎফুল্ল তাম্বূল-রাগ রঞ্জিত সদ্‌গন্ধ পূর্ণ অধরে একটু অলস হাসি হাসিয়া বলিল "মনে পড়িয়াছে কি ?"

সেই রত্নকক্ষের ভিত্তি গাত্রে 'মনে পড়িয়াছে' কথা দুইটী প্রতিহত হইল। সেই কক্ষ মধ্যস্থ সুবর্ণ গঠিত পুষ্পপাত্রের মোহময় গন্ধের আশে পাশে যেন ঘুরিতে লাগিল—"মনে পড়িয়াছে কি ?" রাজার হৃদয়ের ক্ষুদ্র স্থানটীর শূন্যতা পূর্ণ করিয়া সে নিভৃত অন্তর কক্ষে কে যেন বলিয়া উঠিল—"মনে পড়িয়াছে কি ? বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে, বহির্জ্জগতে—সমগ্র মগধ রাজ্যের উন্মুক্ত বায়ুস্তরে—যেন ছড়াইয়া পড়িল—"মনে পড়িয়াছে কি ?"

তড়িতা সুন্দরী। বস্তুতঃই সে তড়িতা। সমস্ত দেহ খানিতে কে যেন তড়িৎ মাখাইয়া দিয়াছে। সেই কজ্জল-রেখামণ্ডিত সুকৃষ্ণ ভ্রূযুগের কৃষ্ণরেখার নিম্নে—আয়ত কৃষ্ণতর ইন্দীবর লোচনদ্বয়—তড়িতে পূর্ণ। বাহুর দোলনি গ্রীবার হেলনি, তাহাতেও যেন অশনি। তাম্বূলরাগ-রঞ্জিত ওষ্ঠাধরে হাসির মধ্যে যেন তড়িতের খেলা। তাই বলিতেছিলাম, বস্তুতঃই সে তড়িতা।

তড়িতা দেখিল—মহারাজ আসন গ্রহণ করেন নাই। কক্ষ মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন। সে আদরের সহিত হাত দুখানি ধরিয়া মুখে কাতরতা আনিয়া বলিল—"মহারাজ! আসন গ্রহণ করুন।"

রাজার হৃদয়ে বড় জ্বালা। সে জ্বালা রাজপথে আসিবার সময় বড় তীব্র হইয়াছিল। তড়িতে অনলশক্তি আছে। কিন্তু মগধেশ্বরের এ তড়িতা—নিসর্গের সে জ্বালাময়ী তড়িৎ নহে। সকল জ্বালা যেন সে নিভাইয়া দিল

সেই হেমকান্তি বাহুযুগল মগধেশ্বরের গলদেশ বেষ্টন করিল। সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যভরা মুখ, মহারাজের বিশাল বক্ষে লুক্কায়িত হইল। তড়িতার গলায় নাগকেশর মালার মনঃপ্রাণহারী সুগন্ধ মহারাজের নাসিকারন্ধ্র পূর্ণ করিল। তড়িতার স্পর্শ—মহারাজের শরীরে তড়িৎ ছুটাইল। তড়িতার কাতর কণ্ঠ,প্রেমভাষা বিজড়িত কাতর সম্বোধন—প্রেমালস আকুলিত কাতর আলিঙ্গন, অত বড় মগধেশ্বর মহারাজ মহানন্দকে ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় লঘু করিয়া দিল। মায়া রাজ্যের আর একটা নূতন স্বপ্নময় উজ্জ্বল দৃশ্য মহারাজের সেই জ্বালাময় হৃদয়ে উজ্জ্বলতা আনিয়া দিল। সে উজ্জ্বলতার মধ্যে—মুরলা ডুবিল—রাজ্যচিন্তা ডুবিল। কঙ্কণ অপহরণের তীব্র জ্বালাময় স্মৃতি ডুবিল। রাজ্যের শুভ, আকাঙ্ক্ষা ও অমঙ্গল আশঙ্কা ডুবিল। মহারাজ তড়িতাময় হইয়া উঠিলেন।

তড়িতার বাহুপাশ উন্মুক্ত করিয়া মগধেশ্বর প্রেম-বিজড়িত কণ্ঠে ডাকিলেন—"তড়িতা"। তড়িতা বলিল—"কেন রাজ্যেশ্বর ?"

মহারাজ বলিলেন—"তুমি কে তড়িতা ? তুমি বড় মায়াবিনী। তোমার এ সুন্দর মুখ দেখিলে আমি সব ভুলি। কেন তুমি আমার এ সর্ব্বনাশ করিলে ?"

তড়িতা মরালগ্রীবা উন্নত করিয়া বলিল—'সর্ব্বনাশ

কি মহারাজ! ভাল বাসিলে কি সর্ব্বনাশ করা হয়! আমি পথের ধূলি, পথে পড়িয়াছিলাম। আপনিই ত স্বেচ্ছায় আমায় পদাশ্রয় দিয়াছেন।'

রাজার মনে সেই প্রভাতে দৃষ্ট রাজ্যের পাটরাণী মুরলার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য জাগিয়া উঠিল। রাজা ভাবিলেন—মুরলার ভাষা নাই—মুরলার উন্মাদিনী শক্তি নাই, তাহার হৃদয়ে কি হইতেছে—মুরলার তাহাত বুঝিবার ক্ষমতা নাই। তাহার কথায় আকুলতা নাই, প্রেম সম্বোধন নাই—স্পৃহা নাই। তাহার স্পর্শে আসঙ্গলিপ্সা নাই—উন্মাদিনী শক্তি নাই। তাহার কথায় কোকিল ঝঙ্কার নাই, পাপিয়ার অলসিত প্রেমপূর্ণ কাতর কণ্ঠস্বর নাই। তড়িতাকে না দেখিলে—মুরলা রাজরাণী হইবার উপযুক্ত থাকিত। এখন আর নয়।"

আবার সেই কঙ্কণ চুরির ঘটনা, মুরলার চিন্তার সহিত মহারাজের মনে জাগিয়া উঠিল। হৃদয়ে যে একটু সুখ আসিয়াছিল, তাহা শরতের মেঘের মত উড়িয়া গেল। রাজা আবার কাতর হইয়া চিন্তামগ্ন হইলেন।

তড়িতা বুঝিল—আজ মগধেশ্বরের মনে পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য নাই। কে যেন কি একটা দারুণ চিন্তায় তাহার চিত্ত সমাচ্ছন্ন। সে আরও কাতর কণ্ঠে বলিল—"কি হইয়াছে মহারাজ! আজ মুখ এত মলিন কেন?"

মগধেশ্বর তড়িতার কণ্ঠ দেশ, বিশাল বাহু দ্বারা বেষ্টিত করিয়া বলিলেন—"তড়িতা—আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

'সে কি মহারাজ! কে আপনার সর্ব্বনাশ করিল?'

'হয়—দেবতা—নয় মুরলা!'

'মুরলা—আপনার পাটরাণী—?'

'হাঁ—সেই পাপীয়সী—'

'কেন—মহারাজ! মগধেশ্বরের পাটরাণী ইচ্ছা করিয়া এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিতে পারেন, যাহাতে মহারাজকে অত বিচলিত করিতে পারে?'

মহারাজ মহানন্দ কঙ্কণ চুরির সমস্ত ঘটনা তড়িতাকে খুলিয়া বলিলেন। সে সবই শুনিল। শুনিয়া স্থির ভাব ধারণ করিল—তাহার মনেও যেন কত চিন্তা! সে চিন্তা যেন মহারাজের প্রতি সহানুভূতিসংজাত। তড়িতা বলিল—'বৃথা সন্দেহ মহারাজ! এ সামান্য ঘটনায় এত অনিষ্ট সম্ভবপর নহে। গণনা অনেক স্থলে ফলে না।' মহারাজ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন 'সত্য তড়িতা—কিন্তু আমার গুরুদেব যে সর্ব্বজ্ঞ। তিনি সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিয়াই আমায় সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। বিঘ্নের প্রতিকারের উপায়ও করিয়া দিয়াছিলেন এবং আমিও মুরলাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম। দেববাক্যে আমার অবিশ্বাস নাই।'

তড়িতা বলিল—'ইহাতে পাটরাণীর দোষ কি? তিনি ত ইচ্ছা করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করেন নাই, কে কোথায় বা করিয়া থাকে?'

মহারাজ—চিন্তাকুল চিত্তে বলিলেন—"সত্য তড়িতা! দোষ মুরলার ইচ্ছাকৃত না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে যে রাজ্যের বিশেষ অনিষ্ট, আমারও অনিষ্ট। গুরুবাক্য যে বৃথা হইবে, তাহারও ত সম্ভাবনা নাই।"

তড়িতা হাসিয়া বলিল—'এত বড় রাজ্যেশ্বর যিনি, এরূপ একটা সামান্য ঘটনায় তাঁহার বিচলিত হওয়া উচিত নহে। যদি আপনার গুরুবাক্যে অনিষ্টসম্ভব বুঝেন, তবে তাঁহার দ্বারাই শান্তি স্বস্ত্যয়ন করাইয়া লউন না কেন? বিঘ্নের ত প্রতিকার হইতে পারে।"

মহারাজ—যেন অকূল সমুদ্রে কূল পাইলেন। তিনি অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ চিত্তে বলিলেন—'গুরুদেবকে আসিতে লিখিয়াছি। তিনি না আসিলে ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা হইবে না।'

তড়িতা—আগ্রহের সহিত প্রশ্ন করিল—'চোর ধরা পড়িয়াছে কি?'

রাজা উত্তর করিলেন—'না—তড়িতা, তাহা হইলে এত ভাবিব কেন?'

'চেষ্টা হইতেছে কি?'

'যথেষ্ট—কিন্তু আজ ত দুই দিন। কিছু ফল হয় নাই।'

'আশ্চর্য্যের কথা। যে অন্তঃপুরে পিপীলিকার প্রবেশ—পথরুদ্ধ—তাহারা মধ্য হইতে চুরি! তাও আবার পাটরাণীর গাত্র হইতে!!'

'আমিও তাই ভাবিতেছি। চোর ধরিতেই হইবে।'

তড়িতা সোৎসুকে বলিল—'মহারাজ! যদি চোর ধরা পড়ে।'

রাজা যেন গভীর অন্ধকারের মধ্যে একটু আলোক পাইয়া বলিলেন—'চোর ধরা পড়ে, তাহার প্রাণদণ্ড করিব,

যদি প্রাণদণ্ড অপেক্ষা আরও কিছু ভীষণ দণ্ড থাকে, তাহারই ব্যবস্থা করিব।'

'চোর যদি ঘটনাবশে স্ত্রীলোক হয়—মহারাজ!'

'তাহার কেশ মুণ্ডন করিয়া—রাজ পথে ভ্রমণ করাইব, তার পর প্রাণদণ্ড।'

তড়িতা যেন এ কথায় শিহরিয়া উঠিল, তাহার শরীরের মধ্য দিয়া যেন তড়িৎ প্রবাহ ছুটিল। তৎক্ষণাৎ সে এ ভীষণ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিল।

রাজারও আর পুরাতন কথা ভাল লাগিতেছিল না। তিনি বলিলেন—"পানীয় আছে দাও, বড় তৃষ্ণা।'

তড়িতা স্বর্ণভৃঙ্গার হইতে কর্পূরবাসিত স্নিগ্ধপানীয় পাত্রে ঢালিয়া মহারাজের হাতে দিল। পানীয় মধ্যে একটা মাদক পদার্থের সমাবেশ থাকায় শীঘ্র তাহা রাজার মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করিল; হৃদয়কে চিন্তা শূন্য করিল। অত কষ্টেও আবার যেন রাজার মনে এতটা ফ্‌র্ত্তির সঞ্চার হইল।

রাজা বলিলেন—'তড়িতা আবার পানীয় দাও। বড় মিষ্ট! যেন প্রাণের জ্বালা গেল!'

তড়িতা আবার সেই ভৃঙ্গার হইতে পানীয় ঢালিয়া রাজাকে দিল। পূর্ণ আগ্রহে মগধেশ্বর সেই পানীয় পান করিলেন। সুকোমল শয্যায়, মণিখচিত আস্তরণের উপর সেই বিশাল রাজবপু উপাধান আশ্রয়ে লম্বমান হইল। তড়িতা—মহারাজের গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল।

স্পর্শ! স্পর্শ! সুকোমল স্পর্শে মহারাজের শরীরের মোহ আসিল। আহা! তড়িতার স্পর্শ অতি কোমল! পুষ্প গুচ্ছের স্পর্শও তাহার কাছে অতি তুচ্ছ। তড়িতার নিশ্বাসে সুগন্ধ, তড়িতার দেহে সুগন্ধ—তড়িতার রূপের দাহিকা শক্তি আছে। এই দাহিকা শক্তির মুখে মগধেশ্বর পতঙ্গবৎ হইলেন।

মহারাজ মহানন্দ তড়িতাকে বাহুবেষ্টিত করিয়া বলিলেন "প্রিয়ে! তোমার সেই গানটা গাও। এই ঘরের দ্বার জানালা খুলিয়া দাও। বাহির হইতে মুক্তবাতাস আসুক—তোমার চূর্ণ অলক তাহাতে দুলিয়া উঠুক। তোমার কণ্ঠবিলম্বিত পুষ্প মঞ্জরীর সুবাস চুরী করিয়া মলয় আমার গাত্রে ছড়াইয়া দিক্। বীণায় সুর চড়াও, তড়িতা তোমার সেই 'নীল যমুনা' গাও।'

তড়িতা—বীণা লইয়া আসিল। গৃহ মধ্যস্থ সুগন্ধী প্রদীপ আরও উজ্জ্বল করিয়া দিল। কক্ষের বাতায়নগুলি খুলিয়া দিল। বাসন্তী পূর্ণিমা! জ্যোৎস্নার রজতস্রোতে সেই নীলকান্তমণি-খচিত রাজকক্ষ যেন লোচনানন্দকর দেবকক্ষের সৌন্দর্য্যের দৃশ্য বিকাশ করিল। এক স্বর্ণপাত্রে একছড়া মালা গাঁথা ছিল। তড়িতা সেই যত্নগ্রথিত পুষ্পমালা রাজার গলায় পরাইয়া দিয়া নিজের কবরী এলাইয়া দিল। বাম হস্তে বীণা ধরিয়া দক্ষিণ হস্তের চম্পকবৎ অঙ্গুলি দিয়া তাহার তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া সুর প্রবাহের সৃষ্টি করিল। চাঁদিনী রাতে—মলয়ার বাজনে, কোকিলের কুহুরবের আলাময় প্রতিধ্বনির মধ্যে, পুষ্পমাল্য সুগন্ধিত হর্ম্ম্যের গন্ধময় বায়ুস্তরে সে নিজের কোমল কণ্ঠ হইতে—এমন আবেগময়ী, মোহময়ী, ভাবময়ী, সুর উত্থিত করিল—যে তাহাতে রাজার প্রাণ বিগলিত হইল। তড়িতা গাহিতে লাগিল—

> ধীর সমীর চুম্বিত অঙ্গ।
> নীল যমুনা সুনীল সলিলে তরঙ্গ ভঙ্গ।
> নীল গগন তল, রাকাশশী ঢল ঢল,
> অমিয় রাশি ধারা, ভুবন টল টল;
> কাতরা নাগরী, পাইতে নাগর সঙ্গ।
> ভ্রমর গুঞ্জন, অতি ঘন ঘন
> সরমে কুসুম ফিরায় বদন,
> না ভোলে ভোমরা, কুসুম কাতরা
> চুম্বনালিঙ্গনে কতই রঙ্গ।
> তমাল ডালে বসে, সুখে ডাকে পাপিয়া,
> কুহরে কোকিল থাকিয়া থাকিয়া
> মেঘে ঢাকে চাঁদ রহিয়া রহিয়া
> ধায়-ফুলবাস মলয় সঙ্গ।
> উলসিত সকলে, চিত বিভোরা—
> আমি বিরহিণী, বিরহকাতরা
> বলে দে গো আমারে, সজনী তোরা
> কোথা মিলিবে পিয়ার সঙ্গ।

উন্মুক্ত বাতায়ন পথে সুর ঘুরিয়া, ফিরিয়া শূন্যে গিয়া মিশাইল। বিলাসকাননের চারিদিকে জন মানব শূন্য বিস্তীর্ণ প্রান্তর। আর সেই প্রান্তরের কোলে চারিদিক বেষ্টন করিয়া ক্ষুদ্র পাহাড়। তড়িতার কোমল কণ্ঠস্বর যেন

ততদূর পৌঁছিতে না পারিয়া আপনা আপনি শূন্যে লয় পাইল। তবে নিম্নস্থ প্রহরীরা সেই চাঁদিনী রাত্রে একটা করুণ সুর লহরীকে কোন অপ্সরার কণ্ঠ-সঙ্গীত বলিয়া যে ভ্রম না করিয়াছিল, তাহা নয়।

আর মগধেশ্বর। তিনি উপাধানে মাথা রাখিয়া সেই মোহময় সুরের সঙ্গে এক নূতন মোহরাজ্যে গিয়া পড়িয়াছেন। সেখানে কেবল উল্লাস, আলোক! কেবল সুর কেবল সুগন্ধ। সে রাজ্য যেন ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। সেখানে জ্বালা নাই, চিন্তা নাই, কাতরতা নাই, কেবল সুখ, অনন্ত সুখ। পাছে চক্ষুরুন্মীলন করিলে এ সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, তাই মগধেশ্বর সে রাত্রে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন না।

(৫)

আমাদের একবার রাজবাড়ীতে যাইতে হইবে। রাজার পাটরাণী অভাগিনা মুরলা কি করিতেছেন দেখিতে হইবে।

মুরলা যখন শুনিল, মহারাজা মন্ত্রণাকক্ষ হইতে সরাসর বিলাস কাননে চলিয়া গিয়াছেন, তখন তাহার প্রাণ বড়ই আকুল হইল। বিলাস কাননের উপর সে কেন এত বিরক্ত তাহা নিজেই বলিতে পারে না। তবে এটুকু মনে আসে, সেখানে গেলে রাজা তাহার পর হন, স্নেহ ভুলিয়া যান, হাসি ভুলিয়া যান, আদর সম্ভাষণ ভুলিয়া যান, আদরের আলাপন ভুলিয়া যান। তাই সে বিলাসকাননের নামে অত অস্থির হইয়া উঠে।

রাজা বলেন—"রাজকার্য্যের জন্য, গোপনীয় মন্ত্রণার জন্য, নির্জ্জনে বিশ্রামের জন্য, তিনি বিলাস কাননে যান। কিন্তু মুরলা বুঝেন, রাজকার্য্য নয়—সেখানে এমন একটা কিছু আছে, যাহা রাজাকে জোর করিয়া, আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। এই প্রাসাদ ত অনেক দিনের পুরাতন। মগধের আরও দুই চারি জন রাজা ত ইহাতে বাস করিয়া গিয়াছেন। অন্য সময়ে এই বিলাসকাননে মুরলাও ত রাজার সঙ্গে গিয়াছে। কিন্তু দুই তিন মাস হইতে রাজা কাহাকেও সেখানে যাইতে দেন না কেন? মুরলা একদিন গোপনে এক দাসীকে পাঠাইয়াছিল। সে অনেক চেষ্টায়, তোরণে প্রবেশ করিতে পায় নাই। প্রহরী তাহাকে বলিয়াছিল— "এখানে মক্ষিকার প্রবেশ নিষেধ।"

মুরলার দাসী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"এখানে আর কে আছে বলিতে পার? মহারাণী তোমায় মতির মালা বক্‌শিস্ দিবেন।" প্রহরী সেই দাসীকে ভয় দেখাইয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। সেই অবধি মুরলা আর কোন সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করে নাই।

মগধেশ্বর যে দিন অপরাহ্ণে কক্ষ ত্যাগ করিয়া মুরলার কক্ষ ত্যাগ করেন, সেদিন মুরলা কিছুই খায় নাই। সে কেবল মনে মনে ভগবানকে ডাকিয়াছে—আর বলিয়াছে,'হে ভগবান। হে বিপদবারণ বিষ্ণু, আমার স্বামীর যেন কোন অমঙ্গল না হয়। কঙ্কণ যেন আমি ফিরিয়া পাই।' জানি না ভগবান তাহার কাতর প্রাণের প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন কি না?

ব্যাপারটা বড় রহস্যময়। মুরলা অনেক ভাবিয়াও সে রহস্যের নিরাকরণ করিতে পারে নাই। রাত্রে যখন সে পালঙ্কে শুইয়াছিল তখন হাতে কঙ্কণ ছিল। সাধারণ চোরের এ কাজ নয়। গায়ে ত আরও হীরা মতি ছিল। চোর তাহা হইলে সে গুলি রাখিয়া কঙ্কণ লইবে কেন? আর এক কথা, হাত হইতে চেষ্টা করিয়া কঙ্কণ খুলিবার কোন উপায় নাই, সামান্য বল প্রয়োগে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যাইত। কঙ্কণের সন্ধিস্থলে একটী ক্ষুদ্র কৌশলময় স্থান ছিল, সেটী টিপিলেই কঙ্কণ আপনি খুলিয়া আসে। যে করিয়াছে সে এই উপায়ে কাজ সারিয়াছে। আর চুরিটা বাহিরের লোকের দ্বারাও হয় নাই।"

(ক্রমশঃ—)

বিরহী।

[মেঘমুখে দয়িতার প্রতি বিরহী যক্ষের উক্তি]

শ্যামা লতিকায় চারু অঙ্গ ভায়,
চকিত-হরিণী-লোচনে আঁখি,
বিধু দরশনে পড়ে মুখ মনে
শিখির কলাপে অলক আঁকি;
তটিনী অঙ্গে মৃদু তরঙ্গে
ভ্রূভঙ্গ তোমার প্রকাশ পায়,
কিন্তু লো কোপনে। কি আছে ভুবনে
প্রতি-অঙ্গ-তুলা মিলিবে যায়?

বিধি কি কঠিন প্রাণী !
করিয়া অঙ্কিত প্রণয় কুপিত
তোমার মুরতিখানি।
পদতলে তার ছবিটি আমার
যখনি আঁকিতে যাই,
ঝরে ঝরঝর নয়ন-নিঝর
কিছু না দেখিতে পাই !
জীবন শোষিনী এ দুখ কাহিনী
সজনি ! কহিব কারে,
বিধি বুঝি আর মিলন দোঁহার
ছবিতে সহিতে নারে !

স্বপন মাঝারে লভিয়া তোমারে
নিবিড় বাহুর ডোরে,
বাঁধিতে আকুলি দুটি কর তুলি
আকাশে ঘুমের ঘোরে।
হেরি সে দশায় বন দেবতায়
বিষাদে উঠয়ে কাঁদি,
মুকুতা আকার নয়ন-আসার
কিসলয় রাখে বাঁধি।

টুটি দেবদারু কিসলয় চারু
নির্য্যাসবাস লুটি'
হ'তে হিমাচল পবন শীতল
আসিছে দখিণে ছুটি'।
বুঝি সে তোমার তনু সুকুমার
পরশি লাগিছে গায়,
উঠি চমকিয়া যাই যে ছুটিয়া
আলিঙ্গন দিতে তায়।

নীরব রজনী কেমনে সজনি !
যাপিব পলক মত,
বিষাদ বিরস নীরব দিবস
তাপ হবে অপগত।

চটুল নয়নে ! ঘুমে জাগরণে
এমনি ভাবিয়া আন
তোমার বিহনে গভীর বেদনে
অশরণ হয় প্রাণ !

স্মরি' ভাবী সুখ মিলনের মুখ
বিরহ জীবন কাটিয়া যায়,
করি সে ভাবনা তুমিও দিয়োনা
পশিতে বেদনা মরমে হায় !
অতি সুখ কার কিম্বা দুখভার
নিয়ত কাহার হৃদয় দলে ?
চক্রনেমি পারা ঘুরিতেছে তারা
কখন উপরে কখন তলে।

ভুজগ-শয়ন হইতে যখন
জাগিবেন হরি মুরলীধর,
এ বিরহময় অভিশাপ লয়
হইবে তখন হরষকর।
[illegible]যোনা হতাশ, এই চারিমাস
[illegible]যাপি' কোন মতে,—মিলনে মাতি'
[illegible]ত সাধ দোঁহে করিনু বিরহে
পূরায়ে সকলি হ'য়ে গলাগলি
যাপিব শারদ চাঁদিনী রাতি।

তোঁমারি ধেয়ান করিয়া পরাণ
রাখিয়াছে আজো বঁধুয়া চোর,
অসিত নয়নে ! লোকেরি বচনে
আনিয়োনা চিতে ভ্রমের ঘোর।
বৃথা লোকে কহে সুচির বিরহে
মরমের রাগ মুছিয়া যায়,
ভোগের বিহনে রস নিতি জমে
প্রেমরাশি রূপে বিকাশ পায়।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

২৫।১নং কটল্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও ২০৮।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস কর্তৃক প্রকাশিত।



প্রদীপ।

প্রদীপ

পঞ্চম ভাগ। }   চৈত্র, ১৩০৮।   { ৪র্থ সংখ্যা।

প্রদীপ।

এ নহে বিলাসদৃপ্ত ধনীর আগারে,
বিচিত্র স্ফটিক পাত্রে দীপ্ত দীপমালা।
শত বিদ্যুতের দ্যুতি শত আলো জ্বালা,
প্রমোদ উৎসব গৃহে চারু তারা হারে
জ্বলে না ইহার জ্যোতি, ঝলসি নয়ন ;—
বিলাস-লালসা-পুষ্ট ভোগ হুতাশন।
অন্ধকার গৃহ-কোণে স্নিগ্ধোজ্জ্বল শিখা
এযে দরিদ্রের দীপ সংসার তামসে ;
নিত্য নিশি জাগি রহে মৌন নির্নিমেষে,
প্রজ্বলিত প্রদীপের পুণ্য বহ্নিশিখা।
দারিদ্র্যের দগ্ধ ভালে রাজত্বের টীপ্
অন্ধকার বঙ্গগৃহে সুমঙ্গল দীপ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

কাশীনাথ।

প্রথম পর্ব্ব।

—*:*—

প্রথম অধ্যায়।

একটু পরিচয়।

দয়াবীর, দানবীর, শক্তিবীর, কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর এবং অর্থবীর কাশীনাথ সেনের একটু পরিচয়ে আখ্যায়িকার গৌরচন্দ্রিকা করিয়া লই। তাঁহার ঘটনাময় জীবনের দুই একটী ঘটনাই আমাদের এই আখ্যায়িকার অবলম্বন। কর্ম্মবীর কাশীনাথের সমগ্র জীবনচরিত লিখিতে হইলে, আমাদিগকে বিংশশতাব্দীর বাণভট্ট হইতে হইবে ; সে অবসর আমাদের নাই। অবসর থাকিলেও সাহস নাই, সাহস থাকিলেও প্রবৃত্তি নাই। যোগ্যতার কথা কহিব না, "যোগ্যতা নাই" বলিয়া পাঠকের কাছে খাট হইতে যাইব কেন ? জানিয়া শুনিয়া পতঙ্গের মত প্রদীপে পড়িতে যাওয়া পাগলের কার্য্য। কাশীনাথ-জীবনের একটা ঘটনা যে সহৃদয় পাঠকসমাজকে দেখাইতে যায়, কাশীনাথের সমগ্র জীবনের বেলায় অযোগ্যতার ভাণ করা ত তাহার পক্ষে সরলতার কার্য্য নহে। জীবনের একটা ঘটনা যে দেখাইতে পারে, অভিজ্ঞতা থাকিলে, সে সমস্ত ঘটনা দেখাইতে না পারিবে কেন ? যখন কাশীনাথের জীবনের একটা অঙ্কে বা অঙ্কের একটা গর্ভাঙ্কে হস্তক্ষেপ করিবার পক্ষে আমি আপনাকে যোগ্য বলিয়া মনে করিতেছি, তখন তাঁহার সমগ্র জীবনের আখ্যানে নিজের অযোগ্যতা খ্যাপন করিয়া সুবোধ পাঠকের কাছে হাস্যাস্পদ হইতে যাইব কেন ? তাই বলিতেছি, যোগ্যতার কথা তুলিব না, অনবসর ও অপ্রবৃত্তির দোহাই দিয়াই গৌরচন্দ্রিকা করিয়া বসিব। আর একটী কথা ; বর্ণনীয় বিষয়ের গুণে আখ্যায়কের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইয়া থাকে। বাল্মীকি যদি ভগবান রামচন্দ্রের লীলা-বর্ণনে প্রবৃত্ত না হইতেন, তাহা হইলে তিনি রামায়ণের কবি হইতে পারিতেন না। বেদব্যাস যদি শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মহাভারত অপাঠ্য মহাভারে পরিণত হইত। মহর্ষি নারদ যদি হরিগুণ না গাহিয়া কেবল ঢেঁকির গুণ গাহিয়া বেড়াইতেন, তাহা হইলে নিজেও ঢেঁকি অবতার হইয়া থাকিতেন। মিল্‌টন যদি ভগবানের নাম গন্ধ না করিয়া কেবল শয়তানের কথায় কাব্য পূর্ণ করিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার মহাকাব্য নরকের পাঠ্য হইয়া থাকিত। মাইকেল মধুসূদন যদি মেঘনাদবধে কেবল রাবণ ও ইন্দ্রজিৎকে আঁকিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, যদি রাম লক্ষ্মণের লীলা না দেখাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার মেঘনাদ ষাঁড়ের নাদ হইয়া মাঠে পড়িয়া থাকিত।

নায়ক নায়িকার গুণে কাব্য নাটকের গুণগরিমা। কালিদাসও যদি রঘুবংশ ফেলিয়া ঘুঘুবংশের বর্ণনা করিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার কীর্ত্তিভবনে কেবল ঘুঘু চরিত। ভবভূতি যদি বীরচরিতে রামলীলা ফেলিয়া কেবল রাক্ষসলীলায় হাত দেখাইতেন, তাহা হইলে বীরচরিত পিশাচচরিতে পরিণত হইত। কাব্য বল, নাটক বল, কথা বল, সমস্তই নায়ক নায়িকার লীলা। নায়ক নায়িকার লীলায় বৈচিত্র্য না থাকিলে, কাব্যাদিতে বৈচিত্র্য হয় না। কেবল ভেরাণ্ডা-তলার ভেকের কথা কহিতে গেলে, বৃহস্পতিকেও ভেরেণ্ডা ভাজিয়া লণ্ডভণ্ড হইতে হয়। আমার আখ্যায়িকার নায়ক কাশীনাথ মহাত্মা লোক ছিলেন। তিনি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে লীলা সাঙ্গ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বংশলোপ হইয়াছে, তাঁহার সৌধ প্রাসাদের চিহ্নমাত্র নাই, সৌধ প্রাসাদের যত উপাদানে অন্য লোকের সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাঁহার ধনে অন্য লোকে ধনবান্ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার যশঃসৌরভে এখনও দেশ আমোদিত হইতেছে। তাঁহার পুণ্য তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে, তাঁহার যশ

ইহলোকে রহিয়াছে। তিনি অদৃশ্য হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার যশ এখনও অদৃশ্য হয় নাই, কোন কালে অদৃশ্য হইবে না।

যে গুপ্তগ্রাম কাশীনাথের আবির্ভাবে অলঙ্কৃত হইয়াছিল, সে গ্রাম হুগলি জেলায়; ভারতের রাজধানী কলিকাতার প্রায় ষোল কোশ উত্তর অবস্থিত। কাশীনাথ সেন গুপ্ত বৈদ্যবংশাবতংস ছিলেন; কিন্তু বংশ-পরিচিত চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত না হইয়া, তিনি কলিকাতার একটী বড় সওদাগরী আপিশের সামান্য কেরাণিপদে বসিয়া যৌবনেই সেই হাউসের মুচ্ছুদ্দি হইয়াছিলেন। এখনকার মুচ্ছুদ্দি-পদে আর তখনকার মুচ্ছুদ্দি পদে প্রভেদ অনেক। হাউসের খরিদ বিক্রয়ে তখন মুচ্ছুদ্দির একাধিপত্য ছিল, লাভালাভেও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল; পদে তখন যথেষ্ট স্বাধীনতাও ছিল। কলিকাতার বনিয়াদি বাঙ্গালি বড় মানুষদিগের ভিতর অনেকেরই পূর্ব্বপুরুষ হাউসের মুচ্ছুদ্দি হইয়া বিপুল ধনে ধনপতি হইয়া গিয়াছেন। ক্রয়-বিক্রয়ে মুচ্ছুদ্দি মহাশয় যে দস্তুরী পাইতেন, তাহাতেই তাঁহার ধনকোষ পরিপূর্ণ হইত। সওদাগর সাহেবদিগকে তখন ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য সম্পূর্ণরূপেই মুচ্ছুদ্দির উপর নির্ভর করিতে হইত। বাজারের ব্যাপারী পসারীরা মুচ্ছুদ্দিকে চিনিত, সওদাগর সাহেবদিগের সহিত কাহারও ততটা সম্বন্ধ থাকিত না। তখনকার মুচ্ছুদ্দি ধনে মানে সৌভাগ্যশালী ছিলেন। এখনকার সওদাগর সাহেবেরা এখনকার দেশ কাল পাত্র চিনিয়াছেন, ব্যবসা বাণিজ্যের—খরিদ বিক্রয়ের অনেক কাজই আপনারা করিয়া থাকেন; এখনকার মুচ্ছুদ্দিরা সাহেবদিগের বেতনভুক ভৃত্য। তখনকার মুচ্ছুদ্দিরা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেন, সাহেবদিগের সমকক্ষ ছিলেন।

কাশীনাথও স্বাধীন মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। মুহুরি, সরকার, বাজার-সরকার, ওজনসরকার, গুদামসরকার, সরমেট প্রভৃতি অনেক কর্ম্মচারী তাঁহার অধীনে কার্য্য করিতেন। ইঁহাদিগের বাহাল বরতরফে সাহেবদিগের কোন সম্বন্ধ ছিল না। কাশীনাথই সকলের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। দয়াবীর কাশীনাথ আশ্রিতবাৎসল্যেও অদ্বিতীয় ছিলেন, কিন্তু তিনি অতুদারমতের মর্য্যাদা বুঝিতেন না। আত্মীয় পর, স্বদেশী বিদেশী সকলকে তিনি সমান স্নেহে দেখিতে শিখেন নাই; "বসুধৈব কুটুম্বকম্" নীতির রহস্য তিনি ভাল বুঝিতে পারিতেন না। সমগ্র জগতের ভাবনা তিনি ভাবিতে পারিতেন না। সমগ্র ভারতের হিত-চিন্তায় তিনি ব্যস্ত হইতেন না। সমগ্র বঙ্গ দেশটাকেও তিনি নিজের দেশ বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না। অধিক কথা কি, সমস্ত হুগলি-জেলাটাকেও নিজের জেলা বলিয়া অধিক যত্ন করিতে পারিতেন না।

তখনকার পরিচিত প্রথায় কাশীনাথ কিঞ্চিৎ ইংরেজি শিখিয়াছিলেন। "স্কুল মাষ্টার" নামে একখানি সাহিত্যসংগ্রহ এবং "মরেস গ্রামার" নামে একখানি ব্যাকরণ তাঁহার ইংরেজি শিক্ষার পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছিল; ঐ দুই গ্রন্থেই বিদ্যাপথ একরূপ পর্য্যবসিতও হইয়াছিল। কিন্তু হাউসে যে সকল দ্রব্যের বেচা কেনা হইত, তৎসমস্তেরই ইংরেজি নাম কাশীনাথের কণ্ঠস্থ ছিল। এ পক্ষে একখানি ইংরেজি বাঙ্গলা "ভকাবুলারি" বা "বাক্যাবলী" তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। যে জিনিসের নামটা কাশীনাথ ভুলিয়া যাইতেন বা যাহার নাম তিনি আদৌ জানিতেন না, এমন জিনিসের কথা সাহেবদিগকে বুঝাইতে হইলে, কাশীনাথ অবজেক্ট-লেসনের শরণ লইতেন, জিনিস দেখাইয়া সাহেবকে বলিতেন, "দিস থিঙ ওয়াণ্ট" বা "দিস থিঙ নট ষ্টক।" তখনকার সাহেবরাও ইহাতে অবস্থা ব্যবস্থা বুঝিতেন; এইরূপ জ্ঞানেই তুষ্ট হইতেন।

"লাড ঈশ্বর গাড ঈশ্বর
গৌয়্যান চাবা।
এলিফেণ্ট হস্তীরে কহি
কোকম্বর শসা।"

এইরূপ ছড়ায় তখনকার ইংরেজি শিক্ষা হইত, বাক্যাবলীতে এইরূপ ছড়াও থাকিত। তখন সাহেবের কাছে রথযাত্রার ছুটির কথা বলিলে, রথের রহস্য সাহেবকে বুঝাইয়া দিতে হইত।

"চার্চ্চ চার্চ্চ উডেন চার্চ্চ
আলমাইটি নো হাথ,
থোজেও মেন ক্রাই ক্রাই
জয় জগন্নাথ জগন্নাথ।"

মুহুরি মুচ্ছুদ্দির মুখে রথযাত্রার এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়াই, তখনকার সাহেবেরা আনন্দিত হইতেন।

কাশীনাথও এইরূপ ইংরেজি বিদ্যা লইয়া মাসে পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করিতেন; আপিশে নিজের তাঁবে শতাবধি লোকের প্রতিপালন করিতেন; কলিকাতার বাসায় বারমাস পঞ্চাশ ষাইট জন ভদ্র লোককে অন্ন দিতেন; আর স্বগ্রামে নিজের বাটীতে দোল দুর্গোৎসব শ্রাদ্ধ শান্তি প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপে টাকার থলিয়া খুলিয়া ছড়াইতেন। আপিশে যাঁহারা কাশীনাথের অধীনে কাজ করিতেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই কাশীনাথের স্বগ্রাম-বাসী ছিলেন। বৈদ্যবংশজ কাশীনাথের বৈদ্যপক্ষপাতটা কিছু অধিক ছিল। ভিন্নগ্রামের বৈদ্যবংশজদিগের প্রতিও কাশীনাথের অনুরাগ ছিল। আত্মীয় কুটুম্বদিগের সাহায্য করিতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন।

কাশীনাথ স্পষ্ট বলিতেন, "যাহাদিগের সাহায্য করিতেছি, তাহারা আমার অবশ্য-প্রতিপাল্য। আপিশে চাকরী দিতে পারিয়াছি, ইহা আমারই সৌভাগ্য; অন্যথা ত আমাকেই নিজের অর্থে ইহাদিগের পরিবার প্রতিপালন করিতে হইত।"

গ্রামের ব্রাহ্মণসন্তানদিগকেও কাশীনাথ কাজকর্ম্ম দিতেন। যে কাজে ব্রাহ্মণসন্তানের অমর্য্যাদা সম্ভাবনা, সেরূপ কাজ তিনি তাঁহাদিগকে দিতেন না। আর গুরু-পুরোহিত-বংশের কোন ব্যক্তিকেই আপিশে নিযুক্ত করিতেন না। কাশীনাথ বলিতেন, "দেবতাকে খাটাইতে নাই, দেবতাকে পূজায় তুষ্ট করিতে হয়।" তিনি উপযুক্ত মাসিক বৃত্তি দিয়া গুরু-পুরোহিত-বংশের সাহায্য করিতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সাপ্তাহিক যাতায়াত।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে রেল ছিল না। কাশীনাথকে ভাগীরথীর স্রোতে নৌকায় করিয়া কলিকাতায় আসা যাওয়া করিতে হইত। কলিকাতায় মস্ত বাসা ছিল, চাকর বাকর ছিল পাঁচ ছয় জন। আপিশের কাজে যে কয়জন বেহারা পেয়াদা নিযুক্ত ছিল, তাহারাও মুচ্ছুদ্দি বাবুর বাসায় থাকিত। স্বগ্রামস্থ স্বজাতীয় মুহুরি সরকার প্রভৃতি সকলেই কাশীনাথ সেনের বাসাতেই কালযাপন করিতেন। পাচক ছিল তিন চারি জন। বাসায় প্রত্যহ যজ্ঞ হইত। আহারাদি বিষয়ে কিন্তু তারতম্য ছিল না। এখনকার অনেক বাবুর সংসারে দেখিবে, তিন রকম চাউলের ভাত; বাবু ও তাঁহার গৃহিণীর দাদখানি, আর সকলের বালাম, চাকর বাকরদিগের মোটা বুকড়ী। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও কুত্রাপি এরূপ তণ্ডুল-বিচার দেখা যাইত না। কাশীনাথ বাবুর বাসায় কিন্তু কোন বিচারই ছিল না, সকল বিষয়েই সাম্য ছিল। অতিরিক্তের মধ্যে কাশীনাথ একবাটী নারিকেলের জল আর যৎকিঞ্চিৎ আদা ছোলা খাইতেন, এটায় আর প্রবৃত্তি কাহারই ছিল না। আর অন্নের সঙ্গে কাশীনাথ একটা কাঁচা লঙ্কা খাইতে ভাল বাসিতেন, এটাতেও কেহ বড় দৃষ্টি দিতেন না।

বাসা-খরচে সীমা পরিসীমা ছিল না। স্বগ্রামের, শ্বশুরগ্রামের বা মাতুলগ্রামের যে ব্যক্তি কলিকাতায় আসিতেন, কাশীনাথের বাসায় তাঁহার দ্বার অবারিত ছিল। তাঁহারাও যত দিন ইচ্ছা বাসায় থাকিয়া আপনা-

দের কাজ কর্ম্ম সারিয়া লইতেন। যাত্রার সময়ে প্রায় কাহাকেও রিক্ত-হস্তে যাইতে হইবে না। রাহাখরচ বলিয়া দুই দশ টাকা কাশীনাথ সকলেরই হস্তে গুঁজিয়া দিতেন। অনেকে কেবল এ জন্যও মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন। ৺ পূজার দিন কতক পূর্ব্বে কাশীনাথের বাসায় লোকারণ্য হইত। যে সকল ব্রাহ্মণ কলিকাতায় বার্ষিক সাধিতে আসিতেন, তাঁহাদের অনেকেই কাশীনাথের প্রতি কৃপা করিতেন।

বাসায় এত খরচ-পত্র, এত চাকর বাকর, তথাপি কাশীনাথ সহধর্ম্মিণীকে কখনও কলিকাতায় আনিতেন না। স্ত্রীকে প্রবাসে আনা তখনকার হিন্দুর পক্ষে যেন একটা পাপ বলিয়াই গণ্য ছিল। এখন বিশ পঁচিশ টাকার কেরাণী বাবুও কলিকাতায় সপরিবারে থাকেন। তখনকার দিনে কাশীনাথের মত লোকেও কলিকাতায় সপরিবারে থাকিতেন না। রেল ছিল না, নৌযাত্রায়ও সকলের পক্ষে সর্ব্বদা সুবিধা হইত না। তথাপি তখনকার লোকে কলিকাতায় পরিবার আনিতেন না। যে দুই একজন কলিকাতায় সপরিবারে বাসা করিয়া থাকিতেন, গ্রামে তাঁহারা নিন্দা-ভাজন ছিলেন। বস্তুতও স্বার্থপরতাটা তাঁহাদের হৃদয়ে কিছু বলবতী হইয়া আধিপত্য করিত।

এ পক্ষে কাশীনাথ নিয়মের ব্যতিক্রম করিতেন না, যুবতী সহধর্ম্মিণী-কেও কলিকাতায় আনিতেন না। কিন্তু এক বিষয়ে তিনি বিলক্ষণ ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন। রেল ছিল না, ষ্টীমার ছিল না, ডাকের গাড়ী ছিল না, পাল্‌কীর টপ্পা বসাইবার সুবিধা হইত না, তথাপি কাশীনাথ প্রতি-শনিবার কলিকাতা হইতে বাড়ী যাইতেন, প্রতিসোমবার বাড়ী হইতে কলিকাতায় আসিতেন। তাঁহার নৌকা ষোল ক্রোশ পথে এইরূপে যাতায়াত করিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নিজের নৌকা।

কাশীনাথ ভাল মিস্ত্রী দিয়া, অধিক টাকা খরচ করিয়া, একখানি ভাউলে-পানসী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সে ভাউলে ছিপ ছোটের মত ছুটিত। বসিয়া থাকিলে ভাউলেখানিতে আটজন চড়নদারের চলিত, শুইয়া থাকিলে চারি জনের বেশ চলিত। কাশীনাথের নৌকায় আটজন দাঁড়ী দাড় টানিত, একজন মাঝী হাল ধরিত, নয়জনই কাশী-নাথের বেতনভুক ভৃত্য ছিল। রাজু নজু দুই ভাই, গ্রামের মাঝিকুলে কুলতিলক ছিল। ইহাদের মত মাঝী তখনকার দিনেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। দুই ভাইয়ের এক ভাইকে কাশীনাথের নৌকায় হাল ধরিতেই হইত। আটটী দাঁড়ী ছিল, আটটা অসুর অবতার। মাঝীর মধ্যেও রাজু নজু বলবান্ বলিয়াই বিখ্যাত ছিল।

তখনও মেলেরিয়া জ্বর দেশটাকে জনশূন্য করে নাই, জনগুলাকেও নির্জ্জীব করিয়া দেয় নাই। দস্যু-ভয় তখনও ছিল, অথচ অস্ত্র-আইন বাহাল হয় নাই। কাশীনাথের দাঁড়ী মাঝীরা সকলেই লাঠী ধরিতে পারিত, সড়কী চালাইতে পারিত, তরোয়াল ধরিতেও কুণ্ঠিত ছিল না। নৌকায় নানারূপ অস্ত্র শস্ত্র থাকিত। কাশীনাথ নিজেও কৃষ্ণের জীব ছিলেন না, একটা পাঁঠা একলা খাইতে পারিতেন, নিজেও লাঠী তরোয়াল ধরিতে জানিতেন। বন্দুক পিস্তল এবং যথেষ্ট গুলি-বারুদ নৌকায় না রাখিয়া কাশীনাথ আসা যাওয়া করিতেন না। স্বগ্রামের যে সকল ভদ্র-সন্তান কাশীনাথের আপিসে কাজ করিতেন, আর তাঁহার বাসায় থাকিতেন, তাঁহাদের ভিতর হইতে কাশীনাথ প্রায়ই দুই তিনটিকে পর্য্যায়-ক্রমে সঙ্গে লইতেন। এইরূপ পর্য্যায়ের ব্যবস্থা থাকায়, সকলেই মধ্যে মধ্যে বাড়ী যাওয়ার সুবিধা পাইতেন। আশ্রিত-বৎসল কাশীনাথ আশ্রিত ছাড়িয়া প্রায়ই অনাশ্রিতকে সঙ্গে লইতেন না। তবে যদি গ্রামের কেহ কখনও কলিকাতায় হঠাৎ অসুস্থ হইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইত, তবে তাহাকে কাশীনাথ আগ্রহসহকারে নিজের নৌকায় লইয়া যাইতেন।

নৌকা শনিবার প্রত্যূষেই কলিকাতায় আসিয়া বাগবাজারের ঘাটে অপেক্ষা করিত। কলিকাতায় তখনও পাল্‌কীরই আধিপত্য ছিল বটে, কিন্তু গাড়ীরও প্রতিপত্তি বাড়িয়াছিল। বড় হাউসের বড় মুচ্ছুদ্দি কাশী-নাথকে কার্য্যব্যপদেশে সর্ব্বদাই এখানে ওখানে বেড়াইতে হইত, মহা-জনদিগের সঙ্গে দেখা শুনা করিতে হইত। কাশীনাথ বাবুর সুতরাং এক-খানি গাড়ী এবং দুইটি ঘোড়া ছিল। আর পাল্‌কী অপেক্ষা গাড়ীতেই বলবান কাশীনাথ সুবিধাবোধ করিতেন।

মুচ্ছুদ্দি বাবু ইচ্ছামত আপিস হইতে চলিয়া আসিতে পারিতেন, সাহেবদিগের অনুমতি লইতে হইত না, জরুরী কাজ কর্ম্ম থাকিলে কাশীনাথ নিজেই অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতেন।

বাড়ী হইতে বা আপিস হইতে সহযাত্রী দুই তিন জনকে সঙ্গে লইয়া কাশীনাথ গাড়ি করিয়াই বাগবাজারের ঘাটে উপস্থিত হইতেন। জোয়ারের পূর্ব্বে নৌকায় উঠিয়া, জোয়ার মুখেই নৌকা ছাড়িয়া দিতেন। কটালের কয় দিন বান ডাকিয়া না গেলে তিনি নৌকায় উঠিতেন না। বাগবাজারের ঘাট ছাড়িয়া ভাউলে দক্ষিণের ছোটের মত তীরবেগে ছুটিত। আটটা দাঁড়ী আটটা অসুর, দাঁড়েও অদ্বিতীয়া মাঝী রাজু নজু ঝিঁকায় পাকা। ষোল ক্রোশ পথ অন্য নোকার পক্ষে এক দিনে অনতিক্রম্য হইলেও, কাশী নাথের নৌকার পক্ষে—স্বল্প সময়েই অতি-ক্রম্য ছিল। পূজার পর একটানা গাঙে আমরাই দেখিয়াছি, হাটুরে নৌকাও চারি পাঁচ ঘণ্টায় ষোল ক্রোশ আসিয়াছে; দক্ষিণে বাতাসে পালভরে পানসী পাঁচ ঘণ্টায় গিয়াছে। দাঁড় ভয়ঙ্কর জোর থাকিলে, বৈদ্যবাটীর ও দিকে জোয়ারের জোরকেও ওজর করিতে হয়। দাঁড়ের জোরে কিন্তু ভাঁটাও জোর করিয়া জোয়ার হয়। কাশীনাথ শনিবারেই বাড়ী পৌঁছিতেন; আবার রবিবার রাত্রিশেষে বাড়ী ছাড়িয়া সোমবার কলিকাতায় পৌঁছিতেন। দুই এক ঘণ্টার গহুরি হইলে, মুচ্ছুদ্দি কাশী-নাথকে কাহারও কাছে লাঞ্ছনা গঞ্জনা পাইতে হইত না; মনিবের কোপানলে পড়িবার ভয়ে কাশীনাথকে কখনও ভীত হইতে হইত না।

নিজের মনোমত নৌকায় কাশীনাথ কোনরূপ অসুখের পথ রাখেন নাই। কোন কার্য্যে বা কোন প্রয়োজনে তাঁহাকে নৌকা প্রায় কুত্রাপি লাগাইতে হইত না। নিতান্ত ঝড় তুফানের ধুম না হইলে, নৌকা অবাধে চলিত। খাদ্যাদি যাত্রার সময়েই সংগৃহীত হইয়া থাকিত। নৌকায় চারিজন চড়নদারের প্রায়ই অভাব হইত না; তাসেও কাশীনাথের বিরাগ ছিল না।

বাড়ীর চারিজন পাকের দুইজনকে নৌকায় আসা যাওয়া করিতে হইত। দাঁড়ি মাঝি নয় জনের উপর পাক দুই জনকে না দেখিলে কাশীনাথ নিশ্চিন্ত হইতেন না। তাস খেলার সময়ে পাকেরা ঘন ঘন তামাক সাজিয়া দিত। দাঁড়ি মাঝিদিগের কিছুতেই হাত কামাই না হয়, এরূপ ব্যবস্থা কাশীনাথ করিয়া রাখিতেন।

কাশীনাথ গাহিতে বাজাইতে জানিতেন। সহচরদিগের ভিতর কেহ কেহ একান্ত অদক্ষ ছিলেন না। সংগীতে তখনকার লোকের বড় অনুরাগ ছিল। অনেকেরই সুতরাং দক্ষতাও ছিল। নৌকায় একটা বাঁয়া পড়িয়া থাকিত। তাহারই সঙ্গতে গান চলিত। খেলা ধূলা ও গান বাজ-নায় সময়টা দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইত। যাতায়াতে সুতরাং কাশী-নাথকে প্রায়ই বিরক্ত হইতে হইত না। ঝড় তুফানের জন্য কদাচ কখনও বিড়ম্বনাভোগ ঘটিত। কিন্তু সে কাদাচিৎক কষ্ট-ভোগ সাপ্তাহিক সুখভোগের কাছে পরাস্ত হইয়া থাকিত।

যানের মধ্যে নৌযান শ্রেষ্ঠ, নৌযাত্রায় চারি পোয়া আনন্দ, চারি পোয়া উৎসাহ। সোমবার কলিকাতায় আসিবার সময়ে সুখের একটু খর্ব্বতা হইত সত্য; কিন্তু ছয় দিন পরেই আবার শনিবার, এই স্মৃতি কাশীনাথের সাপ্তাহিক বিরহদুঃখকে মাথা তুলিতে দিত না। আর শনিবাসরীয় যাত্রায় যে প্রগাঢ় সুখবোধ এবং প্রবল উৎসাহ হইত,

তাহার তুলনা ছিল না। তাহার মূল্য বুঝিতেন কাশীনাথ, আর বুঝিতেন কাশীনাথের অন্নপূর্ণা।

এইরূপেই সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া যাইত, সপ্তাহে সপ্তাহে কাশীনাথ এইরূপই যাতায়াত করিতেন। পূজার সময়ে কাশীনাথ ষষ্ঠীর দিন বাড়ী যাইতেন, নবমী রাত্রে যাত্রা করিয়া দশমীর দিন কলিকাতায় পৌঁছিতেন। দশমী সাহেবদিগেরও "লকি ডে", সেদিন সওদাগরী আপিশে কিছু না কিছু সওদা করিতেই হয়। দশমীর সৌভাগ্য দিবসে সুতরাং মুচ্ছুদ্দি কাশীনাথকে অন্ততঃ একজন মুহুরি ও একজন সরকার লইয়া আপিশে উপস্থিত হইতেই হইত। দশমীতে লকি ডের পালন করিয়াই, কাশীনাথ আবার যাত্রা করিতেন, কোজাগর পূর্ণিমার পর দিন পুনরায় কলিকাতায় আসিতেন। কাশীনাথ যখনই যাতায়াত করিতেন, পাক দুই জনকে তখনই সঙ্গে থাকিতে হইত।

বার মাসে কাশীনাথকে বাহান্ন হপ্তায় বাহান্ন বার আসিতে যাইতে হইত। পথটা তাহার খুবই পরিচিত হইয়া গিয়াছিল। কোন গ্রামে কিরূপ লোকের বসবাস, কোন গ্রামের কোন ব্যক্তি বর্দ্ধিষ্ণু, কোন বড় মানুষের সংসার কিরূপ, কে থাকার জমিদার কেমন, কোন গ্রামের বাজারে কিরূপ জিনিসপত্র পাওয়া যায়, ইত্যাদি নানা বিষয়ে কাশীনাথ নানা উপায়ে অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন। দুই পারের যে যে স্থানে তখন ভয় ডর ছিল, সে সে স্থানের উপর কাশীনাথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে উদাসীন হইতেন না, নিজে সাবধান হইয়া নৌকার সকলকে সাবধান করিতেন। নৌকায় সন্ধ্যার সময় হইতেই তিন চারিটা লণ্ঠন জ্বলিত। মধ্যে মধ্যে বন্দুকেরও আওয়াজ হইত। উভয় তীরের যত লোক জানিত কাশীনাথ যাইতেছেন, তিনি সকলেরই পরিচিত হইয়াছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দস্যুভয়।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও দস্যুভয় প্রবল ছিল, স্থলে স্থলদস্যু, জলে জলদস্যু, দেশের লোককে তখনও সশঙ্ক থাকিতে হইত। গামছা মোড়া ঠক, ডাকাত আর কতক পরিমাণে ঠেঙ্গাড়ের ভয় তখনও একেবারে দূর হয় নাই। ঠকদিগের আড্ডা ছিল পশ্চিমাঞ্চল, বুন্দেলখণ্ডের নানা স্থানেই ঠকের বসতি ছিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ও জমিদারদিগের ভিতর অনেকে ঠকদিগকে প্রশ্রয় দিতেন, কেহ কেহ লোভে প্রশ্রয় দিতেন, কেহ কেহ ভয়ে আশ্রয় দিতে বাধ্য হইতেন। ঠকদিগের ত অসাধ্য কার্য্য ছিল না। নানা দল নানাদিকে বিচরণ করিত, বঙ্গের এ দিকেও দুই এক দলের গতিবিধি ছিল। ডাকাতের উৎপাত প্রায় সর্ব্বত্রই ছিল। কোন কোন স্থানের ভদ্রলোকদিগের ভিতরও কোন কোন ব্যক্তি দস্যুদিগের সাহায্য করিতেন। অনেক ধনবানের বাড়ীতে দস্যুরাই শান্তি রক্ষা করিত, প্রভুভবনে কিন্তু তাহারা কোনকালে ডাকাতী করিত না, অন্য কাহাকেও পায় ডাকাতী করিতে দিত না। স্থানান্তরের দস্যুরা গ্রামের পাক সর্দ্দারদিগের সহিত ষড়যন্ত্র চক্রান্ত না করিয়া কোন গ্রামের ডাকাতী করিত না। কোন কোন গ্রামের সর্দ্দার চৌকিদার নিমকের মান রাখিত, নিজ গ্রামের কাহারও বাড়ী ডাকাত পড়িতে দিত না। কোন কোন গ্রামের চৌকিদারদিগের নিমকভক্তিটি দুর্ব্বল ছিল, কেবল প্রভুভবনের বিঘ্ন বিপত্তি দূর করিয়াই তাহারা নিশ্চিন্ত হইত। কোন কোন নিতান্ত নরাধম কিন্তু কখনও কখনও প্রভুভবনেও ডাকাতী হইতে দিত। কখনও কখনও প্রবল দস্যুদল গ্রামের শান্তিরক্ষক পাকদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া শৌর্য্যপ্রকাশে অগ্রসর হইত। অনেক সময়ে দস্যুরা বাহাদুরী দেখাইবার জন্যও চৌকিদাররক্ষিত ধনিভবনে ডাকাতী করিতে আসিত। অতিলোভে উন্মত্ত হইয়াও কোন কোন দল বিপত্তি বিভ্রাটে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অসাধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইত; সুযোগ্য সাহসী বিশ্বস্ত চৌকীদারদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিতে প্রস্তুত হইত। এরূপ স্থলে ঘোরতর যুদ্ধ প্রায়ই হইত, দুই একটা দস্যুকে সময়ে সময়ে প্রাণও দিতে হইত। কখনও কখনও বাড়ীর বা গ্রামের চৌকিদারকেও দস্যুহস্তে হত হইতে হইত। দস্যুপক্ষের কেহ হত হইলে, অপর দস্যুরা তাহার মুণ্ডটা কাটিয়া লইয়া যাইত। গুরুতররূপে আহত হইলেও দস্যুপক্ষের লোককে দস্যুহস্তে প্রাণ দিতে হইত। দস্যুরা তাহারও মাথাটা কাটিয়া লইয়া যাইত। মুণ্ডহীন দেহ দেখিয়া পুলীশ ব্যক্তিনিরূপণ করিতে পারিত না। দস্যুরা আত্মরক্ষার জন্যই এইরূপ দস্যুহত্যা করিত। এরূপ অবস্থায় ভ্রাতার হস্তে ভ্রাতাকে মুণ্ডদান করিতে হইত, পুত্রহস্তে পিতাকে মুণ্ড দিতে হইত, দস্যুপিতাও স্বহস্তে পুত্রের মুণ্ড কাটিয়া লইতে কুণ্ঠিত হইত না। সকল দেশেই দস্যুনীতি একরূপ, ইংরাজ, ইটালি, সার্দ্দিনীয়া প্রভৃতি রাজ্যের দস্যুরা এখনও স্বদলস্থ লোকের মাথা কাটিয়া লইয়া যায়।

যাহারা পথে ঘাটে পথিকদিগকে ঠেঙ্গাইয়া মারিত, তাহারা ঠেঙ্গাড়ে বলিয়া পরিচিত। দস্যুসমাজে ইহারা অতি হেয় জঘন্য বলিয়াই বিদিত ছিল। প্রকৃত দস্যুরা ডাকাতী কাজকে যুদ্ধ বলিয়া মনে করিত। সৈনিকেরা যেরূপ শত্রুপক্ষের কেল্লা দুর্গ, আক্রমণপূর্ব্বক, দখল করে দস্যুরাও সেইরূপ গৃহস্থভবন আক্রমণপূর্ব্বক দখল করিয়া, তবে যুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত। দুর্গ দখল করিবার সময় সৈন্যকে যেরূপ যুদ্ধ করিতে হয়, দস্যুদিগকেও সেইরূপ গৃহস্থপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। বস্তুতও ডাকাতী একপ্রকার নকল যুদ্ধ—ক্ষুদ্র যুদ্ধ। প্রকৃত দস্যুরা শস্ত্রব্যবহারে সুদক্ষ ছিল, শৌর্য্য সাহসের অবতার ছিল ভীরু কাপুরুষদিগকে তাহারা একান্ত অশ্রদ্ধা করিত। বৃথা-দস্যুরা পান্থকে একাকী পাইলেই মারিয়া ফেলিত, অগ্রে প্রাণ লইয়া পরে পথিকের ধন লইত। অনেক সময়ে কিছুই পাইত না, কেবল নরহত্যা করাই সার হইত। এরূপ কার্য্য কাপুরুষের পক্ষেই শোভা পায়। যাহারা শস্ত্রশস্ত্রে একান্ত অজ্ঞ, যাহারা সাহসে অতি হীন, সেইরূপ নরাধমেরাই বৃথাদস্যু হইয়া পান্থবধ করিতে প্রবৃত্ত হইত। সুতরাং প্রকৃত বীরদস্যুসমাজে ইহাদিগকে অতীব হেয় হইয়া থাকিতে হইত; কোন ঠেঙ্গাড়ে দস্যুই কখনও প্রকৃত দস্যুর সহিত মিলিতে পাইত না। ডাকাত সমাজে আর ঠেঙ্গাড়ে সমাজে আহার ব্যবহার চলিত না, বৈবাহিক আদান প্রদানও নিষিদ্ধ ছিল। দস্যুপতি বিশ্বনাথের জন্য অনেক ঠেঙ্গাড়ে কাপুরুষকে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার প্রতাপে অনেক স্থানের লোকে ঠেঙ্গাড়ের হাতে অব্যাহতি পাইয়াছিল। পথিকেরা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিত। নদীয়া জেলায় ঠেঙ্গাড়ের উৎপাত তাঁহার জন্যই একেবারে তিরোহিত হইয়াছিল, পরেও সে উৎপাত আর প্রবল হইতে পায় নাই।

জলদস্যুরা বোম্বেটে বলিয়া পরিচিত ছিল। যে নদী নদে নৌকা চলিত, সেই নদী নদেই বোম্বেটের উৎপাত ছিল। আমাদের ভাগীরথী-বক্ষেও বোম্বেটের ভয় এক সময়ে চরমে উঠিয়াছিল। তীরস্থ কোন কোন গ্রামের ভদ্র সম্ভ্রান্ত লোকেও বোম্বেটের রাজা হইয়া প্রভূত ধনের উপার্জ্জন করিত। ভাগীরথীর জলপথ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। এক এক ভাগে এক একজন জলদস্যুপতির আধিপত্য ছিল। পূর্ব্বে চারি দিকে বোম্বেটের ছিপ ছোট ঘুরিত। লম্বা লম্বা সরু সরু নৌকা ছিপ নামে অভিহিত হইত। ছিপ ভয়ঙ্কর বেগে পরিচালিত হইত, ছোটকেও ছিপের কাছে পরাস্ত হইতে হইত। দস্যুরা আপনাদের ছিপ ছোট আপনারাই চালাইত। কোন কোন ছিপে বত্রিশ জন, কোন কোন ছিপে চল্লিশ জন দস্যু বসিয়া ক্ষিপ্রহস্তে বটে ফেলিত, আর ছিপ নক্ষত্রবেগে ছুটিত উজান ভাটা মানিত না, প্রতিকূল স্রোতেও তরতর করিয়া চলিত; ক্ষুদ্র দাঁড়কেই বটে বলে। এখনকার খিলা নৌকাতেও বটে দেখিতে পাওয়া যায়। দাঁড় নৌকায় বাঁধা থাকে, বটে বাঁধা থাকে না। বটে

নাবিকদিগের হাতে থাকে ; নাবিকেরা হাতে পায়ে বটে চালাইয়া থাকে। ভাগীরথীর দক্ষিণাংশে তমোলুক কাঁথী হিজলী প্রভৃতির গাঙে ছোটের চলন। ছোটের তলা জাহাজের জালিবোটের মত মৎস্যভাবাপন্ন। ভয়ঙ্কর ছোটে বলিয়াই নাম "ছোট"। ছোট ডুবু ডুবু হয় বটে, কিন্তু ডুবিতে জানে না। দ্রুত গমনাগমনের পক্ষে ছোটও অদ্বিতীয়। জলে ডাকাতী করি নাই, কিন্তু ছোটে আমরাও চড়িয়াছি।

স্থলদস্যুদিগের সহিত জলদস্যুদিগের বিবাদ বিসংবাদ প্রায় হইত না। জল দস্যুরা জলেই কাজ করিত, ইহারাও সড়কী বর্শা তরোয়াল লইয়া যুদ্ধ করিত। আরোহিতরী বাণিজ্যতরী দ্বিবিধ তরীই জলদস্যুদিগের ভোগ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। দস্যুরা যে তরীর সর্ব্বনাশ করিত, প্রায়ই বহুদূর হইতে তাহার অনুধাবন করিত, কখনও কখনও হঠাৎ লক্ষ শীকারের উপরও পড়িতে কুণ্ঠিত হইত না। কখনও কখনও নৌকায় নৌকায় জল যুদ্ধ হইত, কিন্তু যে তরী সশস্ত্র শস্ত্রবিৎ পাইক রক্ষক রক্ষিত হইত, যাহাতে সাহসী আরোহীরা বন্দুক পিস্তল লইয়া সাবধান থাকিতেন, সেরূপ নৌকার দিকে জলদস্যুরা বড় একটা ঘেঁষিত না। কাশীনাথের নৌকাকেও এই জন্যই কখনও বোম্বেটের হাতে পড়িতে হয় নাই। তিনি দস্যুদিগেরও পরিচিত ছিলেন, কাশীনাথের মুক্ত হস্ত দস্যুদিগের পক্ষেও রুদ্ধ হইত না, তখনকার ধনীদিগের কাছে দস্যুরাও অনুগ্রহ-লাভ করিত। জলে স্থলে দস্যুর আধিপত্য ছিল, ধনে প্রাণে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, ধনীদিগকে অগত্যা দস্যুতুষ্টির ব্যবস্থা করিতে হইত। সকল দেশেই এই নিয়ম। ইংলণ্ডের রবিণহুড এবং স্কটলণ্ডের রবরয়কেও ত অনেক ধনপতি তুষ্ট রাখিতে বাধ্য হইতেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হক সাহেব।

রাজাকে ঠক ডাকাইত বোম্বেটের আধিপত্য হইতে মুক্ত করিবার জন্য রাজা ইংরেজকে যে, একান্ত বিব্রত হইতে হইয়াছিল ; বাঙ্গর ব্রাকীয়ার, এলিয়ট, স্মিথ প্রভৃতি সাহেবেরা যে, জলে স্থলে দস্যু দমন করিয়া কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন ; এখনও যে, ঐ সকল মহাপুরুষের যশ চারি দিকে ঘোষিত হইয়া থাকে ; তাহা অনেকেরই বিদিত আছে। যখনকার কথা আমি কহিতেছি, তখন আমাদের এ দিকে দস্যু-দমনের সুব্যবস্থাই বাহাল ছিল। হুগলি সহরের উত্তরে সহরেরই সীমান্তে ভাগরথী-তীরে দস্যু-দমন বিভাগের একটা বড় আড্ডা ছিল। এলিয়টের যশঃ সৌরভে তখনও দশদিক আমোদিত হইয়া ছিল। কিন্তু স্মিথ সাহেবের নূতন কীর্ত্তি এলিয়টের পুরাতন কীর্ত্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিল।

ঠকের ভয়েই গবর্ণমেণ্ট প্রথমে স্বতন্ত্র দস্যুদমন বিভাগের সৃষ্টি করেন। দাক্ষিণাত্যের কর্ণেল স্লীমান ঠক বংশের ধ্বংস করেন। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঠক ডাকাইতের শাসন ও ধ্বংসের জন্য এখনও স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। ঠক-ডাকাত-বিভাগে এখনও প্রধান রাজপুরুষের প্রাধান্য আছে। প্রধান পুরুষ সর্ব্বাধ্যক্ষ সাহেবের দবদবা রবরবা এখনও শোনা যাইতেছে। কিন্তু তিনি মধ্য প্রদেশ ও মধ্য ভারত লইয়াই অধিক ব্যস্ত। আমাদের এদিকে ঠক দস্যুর ভার এখন সাধারণ পুলীসের হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে ; হুগলির সে স্বতন্ত্র আপিশ এখন নাই।

ঠক-দস্যু-দমনের কর্ত্তাই তখন "হক সাহেব" নামে অভিহিত হইতেন। কেহ কেহ বলিত ঠক সাহেব। 'ঠক সাহেব" বলিলে সাহেবের নামে দোষ পড়ে, এই জন্যই বুদ্ধিমান লোকে তাঁহার নাম দিয়াছিলেন, "হক সাহেব।" হক অর্থাৎ ন্যায় ধর্ম্মের রক্ষা করিতেন ; যাহার ধন তাহারই রাখিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতেন বলিয়াই ঠকী-ডাকাতী-বিভাগের কর্ত্তা "হক সাহেব" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

হুগলি জেলার পাঁচপাড়া প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। পাঁচপাড়ায় তখন বৈদ্যদিগেরই প্রাধান্য ছিল। ঐ গ্রামের মহাকুলীন রায়বংশে বৈদ্য চন্দ্রশেখর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঠকী ডাকাতী বিভাগের এসিষ্টাণ্ট কমিশনর অর্থাৎ প্রধানকর্ত্তার সহকারী হইয়া, তিনি "হক বাবু" বলিয়া প্রথিত হন। চন্দ্রশেখর নিজের শৌর্য্য সাহস এবং যোগ্যতায় হক সাহেবদিগকে তুষ্ট করিয়া গবর্ণমেণ্টকে তুষ্ট করিয়াছিলেন। দুষ্টের দমনে এবং শিষ্টের পালনে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। হুগলি বর্দ্ধমান প্রভৃতি কয়েকটী জেলার দস্যুবংশ চন্দ্রশেখরের জন্যই নির্ব্বংশ হইয়াছিল। সত্য, অনেককে কোনরূপ উপস্থিত প্রত্যক্ষ অপরাধে অপরাধী না হইয়াও দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছিল ; শুদ্ধ সন্দেহের পর ধরিয়াই চন্দ্রশেখর অনেককে কারাগারে বা দ্বীপান্তরে পাঠাইয়াছিলেন, ইহাও সত্য ; কিন্তু চন্দ্রশেখর যাহাদিগের হস্ত হইতে গ্রাম ও সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহারা যে দস্যুবৃত্তি করিত, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। চন্দ্রশেখরের কল্যাণেই দস্যুপ্রধান হুগলি ও বর্দ্ধমান জেলা দস্যুহীন হইয়াছিল, বাঁকুড়া মেদিনীপুর পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতাপ বিস্তৃত হইয়াছিল।

চন্দ্রশেখরের ভয়ে দস্যুবংশ লোকবলে এবং শক্তিবলে একান্ত হীন হইয়াছিল বটে কিন্তু বংশের উচ্ছেদ এখনও হয় নাই, তখনও জলে স্থলে মধ্যে মধ্যে দস্যুবৃত্তি চলিত। বিখ্যাত দস্যুবীর বিশ্বনাথ বৈদ্যনাথ রাধানাথ রঘুনাথ প্রভৃতির আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু হুগলি জেলার বলাগড় অঞ্চলের বলবান্ দস্যুপতি কেনারাম গোপ পরশুহস্তে তখনও পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্রিয়বৃন্দকে—পলাশের ক্ষত্রিয়াদিবংশধর পাশ্চাত্য পহরীদিগকে —ভয় দেখাইয়া বেড়াইতেছিল ; কেনার ভয়ঙ্কর টাঙ্গী তখনও প্রবল পুলীশকে মধ্যে মধ্যে প্রকম্পিত করিতেছিল। বিশ্বনাথ বৈদ্যনাথ প্রভৃতির মত ফার্ষ্টক্লাসের দস্যু তখন ছিল না সত্য, দস্যুসমাজের নেপোলীয়ন নে, মুরট প্রভৃতির তখন আর দর্শন পাওয়া যাইত না সত্য, দ্বিতীয় শ্রেণীর দস্যু কিন্তু তখনও বঙ্গে বিরাজ করিতেছিল, কেনারাম, কেনারামের সহযোগী সহকারীদিগের প্রতাপরবি তখনও একেবারে অস্তমিত হয় নাই। ডাকাতী এখানে সেখানে কখনও কখনও তখনও হইতেছিল, জলে—গঙ্গাবক্ষে— তখনও মধ্যে মধ্যে বোম্বেটের নৌকা দেখা যাইত। শুক্লপক্ষে সূর্য্য অস্তমিত হইতে না হইতে চন্দ্র দেখা দেন। কৃষ্ণপক্ষের আকাশে নক্ষত্র গ্রহগণ কিঞ্চিৎ আলোক দিয়া থাকে। দস্যুভয় অনেক কমিয়াছিল, কিন্তু একেবারে ঘুচিয়া যায় নাই ; এই জন্যই আমাদের কাশীনাথ বাবুকেও নৌপথে সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হইয়াছিল, নৌকার জন্যই এত কারণে দুইজন স্বতন্ত্র পাক রাখিতে হইয়াছিল ; বাছিয়া বাছিয়া অস্ত্রদক্ষ নয়জন নাবিককেই এইজন্য নৌচালনে নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। বাড়ীর ও নৌকার জন্য কাশীনাথ যে চারিজন পাক রাখিয়াছিলেন, তাহারা চন্দ্রশেখরের পরিচিত ছিল ; তাহাদিগের যোগ্যতাও তাঁহার বিদিত ছিল। কাশীনাথও চন্দ্রশেখরের সুপারিসেই চারিজনকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গৌরহাটীই গরুটী।

পাঠক, একবার কলিকাতা হইতে জলপথে আমার সহিত হুগলি পর্য্যন্ত চল। কলিকাতা হইতে হুগলি যাইবার সময়ে তোমাকে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে অনেক নগর গ্রাম দেখিতে হইবে। শালিকে, বেলুড়, বালী, উত্তরপাড়া, কোতরঙ, ভদ্রকালী, কোন্নগর, রিষড়া, মাহেশ, বল্লভপুর, শ্রীরামপুর, চাতরা, শেওড়াফুলী, বৈদ্যবাটী, চাপদানী, ভদ্রেশ্বর, গরুটী, ফরাসডাঙ্গা, চুঁচুড়া, এই কয়টী প্রসিদ্ধ স্থানকে বামে রাখিয়া, তোমাকে হুগলি সহরে পৌঁছিতে হইতে হইবে। হুগলি ছাড়িয়া